আল্লার পথের
সৈনিক
নাজিব কিলানী

আল্লার পথের সৈনিক

মূল
নাজিব কিলানী
অনুবাদ
মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ

বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা

অনুবাদকের কথা

সমকালীন প্রখ্যাত মিসরীয় ঔপন্যাসিক ডাঃ নাজিব কিলানীর রিহলাতুন ইলাল্লার বাংলা অনুবাদ 'আল্লার পথের সৈনিক' নামে প্রকাশিত হচ্ছে। ১৯৮১ সালে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে অধ্যয়ন কালে বইখানি ও তার লেখকের সাথে আমি সর্বপ্রথম পরিচিত হই। আমার পাঠ্য-বিষয়সমূহের একটি ছিল 'আল-আদাবুল ইসলামী'—ইসলামী সাহিত্য। পড়াতেন ডাঃ আবদুল বাসিত বদর। ক্লাশে অধ্যাপনাকালে তিনি বারবার ডাঃ নাজিব কিলানীর নামটি উচ্চারণ করতেন। তাই তাঁর সম্পর্কে জানার একটা কৌতুহল আমার মধ্যে জাগে। কিছুদিনের মধ্যেই আমি তাঁর কয়েকখানি বই পড়ে ফেলি। তাঁর বইগুলি আমাকে যথেষ্ট আনন্দ দেয় এবং তা থেকে আধুনিক আরবী উপন্যাসের একটি নতুন দিকের সন্ধান পাই। ১৯৮২ সালের প্রথম দিকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আরবী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের উদ্যোগে 'ইসলামী সাহিত্য' বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে ডাঃ নাজিব কিলানীও উপস্থিত ছিলেন। সেখানে তাঁর সাথে সাক্ষাত হয়।

১৯৮২ সালের শেষ দিকে দেশে ফিরে এসে কোন এক সময়ে মাসিক 'পৃথিবী' ও মাসিক 'কলম' সম্পাদক জনাব আবদুল মান্নান তালিব সাহেবের সাথে আমা-দের বর্তমান বইখানি সম্পর্কে আলোচনা করলাম। বইখানি অনুবাদের জন্য তিনি বেশ উৎসাহ দেখালেন এবং সে কাজটি আমাকে করার জন্যে বারবার তাগাদা দিতে লাগলেন। নিজের অপারগতা সত্বেও তাঁর পীড়াপীড়িতে একদিন বই-খানির অনুবাদে হাত দিই। প্রথম দু'অধ্যায় অনুবাদ করে তাঁর হাতে দিলে তিনি সাথে সাথে তা 'কলমের' পাতায় ছাপিয়ে দেন। তারপর চলতে থাকে অনুবাদ ও কলমের পাতায় ধারাবাহিক ছাপানোর কাজ। অবশেষে তারই প্রচেষ্টা ও পাঠকদের অপরিসীম আগ্রহ পত্রিকার পৃষ্ঠায় ছাপানো অনুবাদগুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশের ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

আবদুল মান্নান তালিব ভাই অনুবাদের জন্যে আমাকে কেবল উৎসাহ দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং বইখানির সবটুকু তিনি পাঠ করে সম্পাদনাও করেছেন।

তারপর যে দু'ব্যক্তির অক্লান্ত পরিশ্রম ও সহযোগিতায় বইখানি আত্মপ্রকাশ করেছে, তাঁরা হলেন মাসিক কলম-এর সহকারী সম্পাদক জনাব মতিউর রহমান মল্লিক ও বাংলা সাহিত্য পরিষদের ব্যবস্থাপক জনাব আসাদ বিন হাফিজ। পেপার কাটিং দিয়ে পাণ্ডুলিপি তৈরী করেছেন মতিউর রহমান মল্লিক এবং প্রুফ দেখা থেকে শুরু করে প্রেসের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও প্রকাশনার সমুদয় কাজ তদারক করেছেন আসাদ বিন হাফিজ। তাঁদের আন্তরিক প্রচেষ্টার অভাব হলে এত শীঘ্র বইখানি বাজারে বের হতো না। তাঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

যে আশা ও উদ্দেশ্য নিয়ে আমি বইখানি অনুবাদ করেছি, তা কিছুটা পূর্ণ হলে আমার শ্রম সার্থক বলে মনে করব। আমীন!

মুহাম্মদ আব্দুল মাবুদ
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

"তোমরা কি মনে করেছো

অতি সহজেই তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি পাবে ?

অথচ, এখনো তোমাদের ওপর তোমাদের পূর্ববর্তী'দের মতো (বিপদ আপদ) আপতিত হয়নি।

তাদের ওপর আপতিত হয়েছিল বহু কষ্ট, বালা-মুসিবত,

অত্যাচার-নির্যাতনে জর্জরিত হয়েছিল তারা,

এমনকি শেষ পর্যন্ত রসূলগণ ও তাদের সাথী-সহযোগিরা আর্তনাদ

করে বলে উঠেছিল—কবে আসবে আল্লার সাহায্য ?

তাদের সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছিল ; আল্লার সাহায্য অতি নিকটে।"

[আল বাকারাহ ঃ ২১৪]

"লোকেরা কি মনে করে নিয়েছে—'আমরা ঈমান এনেছি'—

শুধু একথাটুকু বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে এবং

তাদের আর কোনো পরীক্ষা করা হবে না ?

অথচ এর পূর্বে অতিক্রান্ত সমস্ত লোককেই পরীক্ষা করেছি আমরা।

আল্লাহকে অবশ্যি জেনে নিতে হবে কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যুক।"

[আল আনকাবুত ঃ ৩]

১

উতওয়া আল-মালওয়ানী নিজেকে মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর অন্য কোনো জীব মনে করে। দুনিয়ার সব কিছুই তার ডান হাতের অনুগত। অর্থ-সম্পদ, লোক-লস্কর, বড় পদবী, ব্যাপক ক্ষমতা এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রহরী কুকুর-এ সবের অধিকারী সে। কুকুরগুলিকে সে ভালবাসে। নিজেকে সে গর্বিত ও সম্মানিত মনে করে, যখন সে দেখে 'লাকী' ও 'তাওয়াসাকা' আর তার বাচ্চাগুলি তার চার পাশে নর্তন-কুর্দন করছে, তার পোশাকের ঘ্রাণ নিচ্ছে এবং তার জুতা চুম্বন করার উপক্রম করছে। কুকুরগুলি তার চারপাশে জটলা পাকালে, গৌরব ও সৌভাগ্য গর্বে তার অন্তর পূর্ণ হয়ে যায়। সে চিন্তা করে, পশুরা পর্যন্ত যখন তার আনুগত্য করে, বড় জেলখানার সৈনিকরাই বা করবে না কেন! হ্যাঁ বড় জেলখানাই। উতওয়া বা বাকবাকাশী উতওয়া—এ জেলখানার পরিচালক। এ জেলখানায় আনীত ব্যক্তিরা সাধারণ মানুষ নয়। তারা রাজনৈতিক বন্দী। রাজনীতি, যুদ্ধ, জাতির অধিকার, সাধারণ স্বাধিকার, আল্লার আইন ও বিধান সম্পর্কে তারা অনেক কিছুই জানে। পরিহাস করতে সব সময় ভাল লাগে উতওয়ার। তারা যা বলে সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করার জন্যে সে নিজেকে সামান্যতম কষ্টও দেয় না। তাদের আকিদা—বিশ্বাসের ব্যাপারে সে কোন বিতর্কে লিপ্ত হবার চেষ্টাও করে না। তাদের বক্তব্য প্রথম থেকেই সে প্রত্যাখ্যান করে আসছে। তার থেকে বেশী ক্ষমতাশালী ব্যক্তির হাতেই আনুগত্যের উপকরণ কেন্দ্রীভূত থাকুক, এ শিক্ষাই সে তার জীবনে লাভ করেছে। আদিষ্ট হলেই সে তা পালন করবে। আদেশ কার্যকরী করার মধ্যে তার কাজের পরিধি সীমিত থাকবে। উপরের কর্মকর্তাদের আর এসব বন্দীদের মৌল বিশ্বাস, সংস্কৃতি, চিন্তা ও দর্শন সম্পর্কে ব্যংগ ও যা মনপুত নয়, এমন কিছু তারও পছন্দ নয়। এ অন্ধ আনুগত্যই তাকে অঢেল কল্যাণ দান করেছে, অনেক উন্নতি ও পদমর্যাদায় অভিসিক্ত করেছে। অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার তাকে বিশ্বস্ত ব্যক্তিতে পরিণত করেছে।

আর তাকে করেছে ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। সব মানুষের মুখে তার নাম। যদিও তার এ খ্যাতি জেলখানা ও দেশের বেষ্টনী অতিক্রম করে বহির্বিশ্বে 'জল্লাদ' হিসেবে ছড়িয়ে পড়েছে। এ বিশেষণে সে লজ্জাও অনুভব করে না বা কোন প্রকার অপমানও বোধ করে না অথবা একটু মানসিক অস্বস্তিও উপলব্ধি করে না। এটাই তার গৌরব ও অহংকারের উৎস। পত্র-পত্রিকা বা বিভিন্ন গোপন প্রচারপত্র যা সমালোচনা করে থাকে সেগুলিই তার গর্ব ও গৌরবের অন্যতম উৎস। রাষ্ট্রের উচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তি-বর্গের নৈকট্য ও ঘনিষ্ঠতা অর্জনের মাধ্যম হিসেবে এটাকে গ্রহণ করে সে ঐ ব্যক্তিদের একজনে পরিণত হয়েছে। তাদের পরিণামের সাথে তার নিজের পরিণাম সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে। সে এমন ভয়ংকর কাজ করতে উদ্যোগী হয়েছে, যা তাকে অনন্তকালের জন্য অসৎ ও নিকৃষ্ট বস্তুর পর্যায়ভুক্ত বলে চিহ্নিত করে দিয়েছে। সে কোন দিন কোন সময় লজ্জা, অনুশোচনা অথবা প্রত্যাবর্তনের চিন্তা করেনি। এ রাস্তা তার অতি পরিচিত। কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও ভয় ভীতি ছাড়াই এ পথে সে চলতে শুরু করেছে। সে এমন ব্যক্তিদের একজন যারা ভবিষ্যৎ ও অতীত সম্পর্কে কোন চিন্তা-ভাবনা করে না। বর্তমানের যে মুহূর্তকে সে অতিক্রম করছে, কেবলমাত্র তাই-ই সে স্বীকার করে। কেননা বর্তমানকে কেন্দ্র করেই তার সকল চিন্তা ঘুরপাক খায়। হ্যাঁ, সে গভীরভাবে বিশ্বাস করে, বর্তমানের যে সময়টা সে অতিক্রম করছে, সেটাই হলো জীবন। এ মুহূর্তটাতে তার হৃদয়ে বিরাজ করবে শুধুমাত্র আনন্দ ও প্রফুল্লতা। এর বেশী সে আর কি চাইতে পারে।

আর এ কুকুরগুলো তার চারপাশে নর্তন-কুর্দন করতে থাকে। বিনিময় ও ভীতির সাথে অফিসাররা তাকে সালাম জানায়। সৈনিকরা তাকে দেখা মাত্র নিজ নিজ স্থানে নির্লিপ্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। বিউগলের বিশেষ শব্দ চারদিকে ধ্বনিত হয়ে ওঠে এবং অতি পরিচিত শব্দ—'জেলখানার সব কিছুই ঠিক আছে'—চারদিক থেকে ভেসে ভেসে আসে। আর প্রতিটি বস্তু নির্বাক-নিস্পন্দ পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে। তুমি যদি এসব দৃশ্যের দিকে তাকাও তা হলে মনে হবে তুমি যেন কোন মোমের যাদু ঘরে আছ। কিছু-ক্ষণ পরেই জেলখানার সবার মধ্যে কর্মতৎপরতা ও প্রাণচাঞ্চল্য শুরু হয়ে যায়। তুলনাবিহীন এক ভীতির পরিবেশ বিরাজ করতে থাকে। সৈনিকদের—'ওরে কুত্তার বাচ্চা, কুইক মার্চ'—ধ্বনি দুর থেকে ভেসে আসে। তারপর অপ-মানিত মুণ্ডিত মস্তক বন্দীদের সারি দৌড়াতে থাকে। আর চাবুকের কঠিন আঘাত তাদের দেহ, মুখ ও মাথায় শপাশপ পড়তে থাকে। দ্রুত চলমান বন্দীদের পদধ্বনি, বেত্রাঘাতের শব্দ, আত্মসমর্পিত ও সাজাভোগরত বন্দীদের প্যারেড এবং পাহারারত হিংস্র কুকুরের আওয়াজ এসব কিছুই যেন তুমি শুনতে পাবে না। আর সূর্য যেন আকাশের বুক থেকে আব্বাসিয়া মরু-

ভূমির ওপর জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড নিক্ষেপ করছে, যা ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিক জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে ফেলছে।

সাধারণ অনুসন্ধান বিভাগের কর্মকর্তারা নিজ নিজ সুসজ্জিত কক্ষে বসে আছে। তাদের মাথার ওপরে বৈদ্যুতিক পাখা, নীচে সবুজ গালিচা, সামনে নানা প্রকার ঠাণ্ডা পানিয় অথবা তুর্কি কফি—'সুককার মজবুতের' কাপ শোভা পাচ্ছে। দামী বিদেশী সিগারেটের প্যাকেট তাদের সামনে সাজানো রয়েছে। সিগারেটের ধোয়ার কুণ্ডলী পাখার বাতাসে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। হুইস্কীর বোতল, কিছু গ্লাস,........অতি সুন্দর অভিজাত দ্রুত ফায়ারিং করার রিভলবার রয়েছে তাদের সামনে। সে সুন্দর মনোরম কক্ষে আনন্দের উচ্ছ্বাসে অন্তর থেকে হাসির ফোয়ারা বেরিয়ে আসছে। বাইরে রক্তাক্ত আংগিনায় বেত্রাঘাতের শব্দ, দ্রুত পদধ্বনি, উড়ন্ত ধুলো-বালি, সৈনিকদের মুহুর্মুহু চিৎকার, সারিবদ্ধ বন্দীদের প্রতি বর্ষিত তাদের অকথ্য গালাগালি, কুকুরগুলির ঘেউ ঘেউ এবং মানুষের তাজা গোশত ভক্ষণ আর এর ফলে যে করুণ আহাজারী ও অস্পষ্ট বিষাদময় চিৎকার ছড়িয়ে পড়ে—তাদের সে আনন্দের বালাখানায় বসে তুমি তার কিছুই টের পাবে না।

এই নিরিবিলি, স্বতন্ত্র, অভিনব বিশ্ব, এটাই হলো উতওয়া মালওয়ানীর জগত। এটাই তার রাজত্ব। সে একে চিনেছে ও ভালবেসেছে। বরং সর্বান্তঃকরণে তার প্রতি আসক্ত হয়েছে। সে এক সৌভাগ্যবান বাদশাহ। তার অটুট বিশ্বাস প্রতিটি বস্তু তার ডান হাতের অনুগত, তার ইশারার প্রতীক্ষায় সবাই করজোড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এ সম্মান ও প্রতিপত্তির চেয়ে বড় জগতে আর কিছু আছে কি? এ জিন্দানখানায় তার দুটি আংগুলের মাঝখানে রয়েছে মানুষের জীবন। কোন প্রকার জবাবদিহির সম্মুখীন না হয়েই বা বিচার না করেই যে কোন কয়েদীকে মৃত্যুর আদেশ দিতে সে সক্ষম। আর তা সংগে সংগে কার্যকরও হয়ে থাকে। এর চাইতে বড় আর কোন ক্ষমতা আছে? মৃত্যুর ন্যায় সে জীবনও দান করতে পারে। জেলখানার অভ্যন্তরে 'উতওয়া আল মালওয়ানী' সব রকম বর্বরতা ও অহমিকার জন্যে বিশেষ ভাবে পরিচিত। তা সত্বেও শহরের এক আধুনিক এলাকায় অবস্থিত নিজ গৃহে অথবা তার বন্ধু সেনা অফিসার ও তাদের পরিবার পরিজনদের মাঝে সে বিনয়ী ও ভদ্র। তাদের প্রায় সকলেই বলে থাকে সে অত্যন্ত নম্র, মিষ্ট ভাষী ও বন্ধু বৎসল। অবশ্য তার কিছু অস্বাভাবিক কার্যকলাপের কথাও কেউ কেউ জোর দিয়ে বলে থাকে। যেমন একবার সে শুনতে পায়, একটি ভুতুরে স্থানে কিছু ছায়ামানবের আবির্ভাব হয়। এরপর সে গভীর রাতে সেখানে গিয়ে দীর্ঘ সময় একাকী ঘোরাফিরা করতে থাকে। আর একবার সে জলন্ত সিগারেট নিজের বুকে ঠেসে ধরে আগুনে পুড়ে গেলে কেমন ব্যথা লাগে তা অনুভব করার জন্যে। অথচ আগুন মানব দেহ জ্বালিয়ে

দেয় তা সে জানে। আর একবারের ঘটনা। সে তার এক বন্ধুর সাথে বাজী রাখে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ রিভলবারে গুলি ভরে তা নিজ দেহ বা মস্তক লক্ষ্য করে ছুড়বে। সে নিজে তো কোন কৌশলে বেঁচে যায়, কিন্তু তার বন্ধু বেচারা মৃত্যুর নিকটে পৌঁছে গিয়েছিল। এ ধরনের আরো বহু অভিনব ঘটনার কথা লোক মুখে প্রচলিত আছে।

উতওয়ার দৈহিক গঠন নাতি-দীর্ঘ, মধ্যমাকৃতির। শরীর কিছুটা স্থূলকায়। কেশ ও দেহের রং গাঢ় লাল ও হলুদের মাঝামাঝি। মুখে একটা পুরাতন ক্ষত চিহ্ন রয়েছে। বলা হয় ১৯৪৮ সালে সে ফিলিস্তিনের আযাদী যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছিল। এ যুদ্ধে আঘাত লেগে তার চেহারায় ক্ষতের সৃষ্টি হয়। তার চাহনিতে একটা অবোধ্য উজ্জ্বল দুশ্চরিত্রতার ছাপ রয়েছে। তার চোখ দু'টিতে কখনো ভীতি ওঠে, আবার কখনো তাতে তোমার নিকট প্রীতি, সহানুভূতি ও সততার ঢেউ উপচে পড়ছে বলে মনে হবে। আবার কখনো কখনো তার বন্ধুদের আসরে বিশেষত তাদের রাত্রিকালীন গল্পের আসরে তার আচরণে কিছু বোকামী ও নির্বুদ্ধিতা ফুটে ওঠে। এটাকে তার বন্ধুরা হাসি ও তামাশার বিষয় হিসাবে ধরে নেয়। বিশেষভাবে পানের আসরেই এমনটি হয়ে থাকে। এতে সে মোটেই রাগ করে না বা কোন প্রকার ঝগড়া বা বচসায় লিপ্ত হয় না। সে নিজেও তাদের এ হাসি ও কৌতুকে অংশ গ্রহণ করে থাকে। এতে তার সরলতা ও সাদাসিদে ভাবটি ফুটে ওঠে।

অধস্তন সৈনিক অথবা কুকুরগুলির প্রতি নির্দেশ দান তার ক্ষমতার আয়ত্বাধীন। যেন তারা বন্দীদের শাস্তি, তাদের রক্ত প্রবাহিত করা ও তাদের রক্তাক্ত মুখ থেকে ক্ষমা ও সাহায্যের ধ্বনি ফুটিয়ে তোলার কর্মে রত থাকে। কিন্তু অধিকাংশ সময় সে এমনটি করে না। নিজেই কোড়া নিয়ে শাস্তিদান ও বেত্রাঘাতের অনুশীলন করতে থাকে। অথবা কোন বন্দীকে কোন কাঠের শূলে ঝুলিয়ে বেধে দেয়। তাদের ভাষায় এটা 'বাসর শয্যা'। এরপর বিভিন্ন ধরনের শাস্তির পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে অশ্রু, রক্ত ও মর্মবিদারী আহাজারির এক মর্মান্তিক পরিবেশের সৃষ্টি করে। এমনটি হয়ে থাকে এক নজীরবিহীন ব্যাথা বেদনা ও দুঃখের কারণে। এ ভাবে সে তার কাজ শেষ করে অফিসে গিয়ে কফি পানে মত্ত হয় এবং অতি ধীরে সিগারেটের ধোয়া ছাড়তে থাকে এরপর ক্যাসেটের বোতাম টিপে উম্মে কুলসুমের 'ইয়া শামসাল...আসীল অথবা ইয়া জামাল ইয়া মিসালাল অতানিয়্যাহ......' গানটি শুনতে থাকে। এরপর অতি অবজ্ঞাভরে দৈনিক পত্রিকাগুলির ওপর চোখ বুলাতে থাকে। ছবি ছাড়া পত্রিকার আর কোন বিষয়ের দিকে তার চোখ যায় না। রাজনীতি সম্পর্কে পত্রিকায় যা কিছু লেখা হয় তার প্রতিও সে তেমন গুরুত্ব দেয় না। সে তো তার বন্ধুদের থেকে রাজনীতির যে জ্ঞান লাভ করে থাকে

অথবা বিভিন্ন সরকারী বা বেসরকারী সমাবেশ ও অনুষ্ঠানে তার নেতাদের মুখ থেকে যা শুনে থাকে—ততটুকু রাজনৈতিক জ্ঞানের ওপরই নির্ভর করে।

উতওয়ার বয়স পঁয়ত্রিশ বছর পূর্ণ হলেও সে কিন্তু এখনো বিয়ে করেনি। তার এক বন্ধু পত্নীর অশেষ চেষ্টা-সাধনায় অবশেষে বিয়ের ব্যাপারে সে নতি স্বীকার করেছে। তার বন্ধুদের সবাই বিবাহিত এবং একমাত্র সেই-ই তাদের মধ্যে অবিবাহিত—বন্ধুদের এ কথা বলার পরই সে বিয়ের ব্যাপারে তাদের সাথে একমত হয়। কেননা বিয়েটাকে সে অত্যন্ত ঘৃণ্য ও অর্থহীন মনে করত। সে মনে করত বিয়ে তার জীবনে বিভিন্ন সমস্যা, বোঝা ও কিছু বন্ধন ছাড়া আর নতুন কিছুই দান করবে না। সে বার বার বলতো, বর্ত-মান অবস্থায় সে পূর্ণ প্রশান্তি অনুভব করে থাকে। সে চায় না, এসব অন্য কিছুর সাহায্যে নষ্ট হোক। বিয়েটা যদি মানুষের হৃদয়, দেহ ও প্রকৃতির আভ্যন্তরীন দাবীতে সাড়া দেয়া হয়, তাহলে সে এখনো এ ধরনের কোন দাবী অনুভব করে না। তাছাড়া তার দৃষ্টিতে বিয়ের উদ্দেশ্য একজোড়া নারী-পুরুষের দৈহিক মিলনের মধ্যেই সীমিত। তার কাছে এর হাজারো সমাধান রয়েছে। আর বিয়ে ছাড়াও এর সমাধান হয়ে থাকে।

তবে সে 'নাবিলা'কে দেখার পর কোন প্রকার ভাবনা চিন্তা ছাড়াই কিছু একটা অনুভব করলো, তার চক্ষু ও চেহারা একীভূত করে তার প্রতি মন-যোগী হলো। আর এমনটি সে অনুভব করলো তার স্পন্দিত অন্তরের সাহায্যে। নাবিলার গায়ের রং সাদা, গায়ের চামড়া মোলায়েম। চোখ দুটি মানুষের অন্তরে দাগ কাটে। চেহারা যে কারো ওপর সহজে প্রভাব ফেলে। কণ্ঠস্বর সুমধুর। দৈহিক গঠনে এক প্রকার আকর্ষণ, নারীত্ব, প্রাণচাঞ্চল্য ও সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়ার একটা ভাব ফুটে ওঠে। উতওয়া তার জিব দিয়ে নিজের গোঁফ ও ঠোঁট দুটি চেটে নেয় এবং চোখের পলকে মিটকী মেরে বিড় বিড় করে বলে ওঠে—এর সব কিছু কতই না সুন্দর!

নাবিলা হেসে ওঠে। তার মুক্তার মত সাদা দাঁতগুলি দুটি গোলাপী ঠোঁটের মাঝখানে ঝকমক করে ওঠে। তার কালো মাথাটি পেছনের দিকে কিছুটা ঝুকে যায়। তার গলা, জীবন ও প্রাণচাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ বুকের উপরি অংশ প্রকাশ হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় সে বলে,

—এখনো তো আমাদের পরস্পরের পরিচয় হয়নি।

—গ্রন্থ শিরোনামেই পরিচিত হয়।

—অঁ্যা! তাহলে তুমি আমার মত বই পড়তে ভালবাস?

—পড়াশুনা? আমি কেবল নির্ধারিত বই ছাড়া আর কিছুই পড়িনি।

—সরকারী ও সামাজিক পদ ও মর্যাদায় অধিষ্ঠিত তোমার মত ব্যক্তি পড়া-শুনা করে না, এটা অসম্ভব, আমি বিশ্বাসই করি না।

উতওয়া তার দিকে এগিয়ে যায় এবং অতি বিনম্র ভাবে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, আমার পড়ার সময় নেই। আমি জীবন থেকেই শিক্ষা লাভ করি।

—পড়াই তো জীবন, আগামীতে আমরা অনেক কিছুই পড়বো।

নাবিলার চেহারায়, চোখের সৌন্দর্যে ও তার মুখের কথার মাধুর্যে উতওয়া আত্মভোলা হয়ে যায়। সে আর কথা বাড়ালো না। কল্পনার জগতে অনেক দূর বিচরণ করলো। কল্পনায় একটি নগ্নদেহ, পূর্ণপানপাত্র, নিষ্প্রভ বাতি, কোমল রেশমী শয্যা ও উৎকৃষ্ট খাদ্যে পরিপূর্ণ একটি ডাইনিং টেবিলের চিত্র দেখতে পেল। তারপর নাবিলার একটি হাত নিজের মুঠোর মধ্যে নিয়ে অনুচ্চ-স্বরে বললো, আজীবন একই সাথে আমরা পড়তে থাকব।

—আমি তো প্রায় এ কথাই বলেছি।

—এসো,আমরা তো ঐক্যমতে পৌঁচেছি।

২

বাকবাকাশী উতওয়াকে যে জিনিসটি ভীষণভাবে পীড়া দেয়, তা হলো তার কোন আবেদন প্রত্যাখ্যান করা। সৈনিক জীবন তাকে শিখিয়েছে, আদেশ হলে সংগে সংগে তা প্রতিপালিত হবে। বার বার আদেশের কোন প্রয়োজন হবে না। এমন কি সে নিজেও সেনাবাহিনীর উর্ধতন কোন কর্মকর্তার নির্দেশ অমান্য করতে কখনো অভ্যস্ত নয়। নাবিলার সাথে তার বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে গেছে। তার বিশ্বাস এক্ষেত্রে সে এক বিরাট যুদ্ধে জয়লাভ করেছে। কিন্তু যে বিষয়টি তাকে ভীষণভাবে ব্যথা দেয়, তা হলো তার আগাম কিছু খেল তামাশার প্রস্তাবে সাড়া না দেয়া। সে চায় এ মুহূর্তেই তাকে শিকার করতে। তাকে নিজের দিকে টেনে নিতে। কিন্তু তাতে সে রাজী হয় না। একবার তাকে চুম্বন করার চেষ্টা করলে হাত দিয়ে সে বাধা দেয়। সে তাকে শয্যার দিকে টেনে নিতে চাইলে জোর করে সে নিজেকে তার বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে নেয়। এ সময় উতওয়া ছিল একটি ক্ষুধার্ত নেকড়ের ন্যায়। হিংস্র জন্তুর মত চিৎকার করে বলে ওঠে, এরূপ আচরণের কোন অর্থ আছে কি?

—আমাকে জিজ্ঞেস করছ? তোমার নিজের কাছেই জিজ্ঞেস কর না?

—তুমি তো আমার বিয়ের প্রস্তাবিত কনে। তোমার ওপর সব রকমের অধিকার আমার আছে।

—বিয়ের প্রস্তাবিত কনে, সে কথা সত্যি, তাই বলে আমি তো তোমার স্ত্রী নই।

—শব্দের মার-প্যাচের খেলা আমি মোটেই পছন্দ করিনে। এটা বা ওটা উভয় ক্ষেত্রে তুমি আমার কাছে সমান।

—দু'টি অবস্থার মধ্যে বিরাট ব্যবধান।

ক্ষিপ্ত কুকুরের ন্যায় গর্জে ওঠে উতওয়া—আমি কোন প্রতিবাদ সহ্য করতে পারি না।

—এতে আমরা একে অপরকে বুঝতে পারব।

—আমরা সমঝোতার জন্য মিলিত হইনি—তোমার বোকামীর জন্য আমাদের অতি চমৎকার সময়টুকু মাটি হয়ে যাচ্ছে।

নাবিলার চেহারায় একটি বিরক্তির ভাব ফুটে উঠল। সে বের হবার চিন্তা করতে থাকে। পরক্ষণেই সে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে—তুমি গান পছন্দ কর?

অত্যন্ত কঠোর ভাবে সে উত্তর দিল—গান বা ছাতামুণ্ডুর কিছুই আমার পছন্দ নয়।

—তুমি তো একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক।

নাবিলা একটু মুচকি হাসল। তাকে খুশি করবার জন্য তার কাছে এগিয়ে গেল। কিন্তু রাগে সে তার হাত ঠেলে ফেলে দিয়ে বললো—আমাদের দু'জনের মাঝের সম্পর্ক গান, পড়াশুনা বা অন্য কোন প্রকার সম্পর্ক নয়। এ জাতীয় কোন কিছু থেকে তা সম্পূর্ণ মুক্ত। এসব কল্পনার জগত ছেড়ে দাও। আমি একজন কর্মী ব্যক্তি।

তার বিপ্লবী হাবভাব দেখে নাবিলা হেসে উঠে বললো—নাযার কুবানী সত্যি কথাই বলেছেন।

ব্যংগভরে সে বলে উঠলো—নাযার আবার কে?

—কবি।

পা দিয়ে মাটিতে জোরে একটা আঘাত করে উতওয়া বললো—গান, কবিতা—ধ্বংসের জন্যই যথেষ্ট।

নাবিলা অন্ধকার জানালার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো। কক্ষের চতুর্দিকে চোখ বুলিয়ে সে বললো—নাযার বলেছে, 'ঘুমন্ত, শৃঙ্খলিত এবং অলস প্রাচ্যজগতের বিরুদ্ধে আমার বিপ্লব / আমার বিপ্লব সে সব জাতির বিরুদ্ধে / যারা তোমাকে শয্যার ওপর অলীমার পাত্রী হিসেবে দেখে থাকে।'

উতওয়া নাবিলার দিকে এগিয়ে গেল। তার শক্ত বাহু দিয়ে তার হাত নিজের গলার সাথে পেচিয়ে নিল এবং ঘনঘন তপ্ত নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বললো

—তুমি যা বলো তার ছাইভস্ম কিছুই আমি বুঝিনে। বিপ্লব শব্দটি তুমি মুখেই আনবে না। অন্যথায় তারা কোন দিন তোমাকে শূলে চড়াবে। যা তাদের ভাষায় 'বাসর' বলে পরিচিত। অথবা তারা তোমার মস্তক ছিন্ন করে ফেলবে।

নাবিলা যখন দেখলো সে তাকে চুম্বন করার উপক্রম করছে তখন অত্যন্ত মৃদু ভাবে তার হাত সরিয়ে দিয়ে নিজেকে তার বন্ধন থেকে মুক্ত করে বললো—

নাউজুবিল্লাহ। তুমি? তুমি কি বিপ্লবী নও?

—হ্যাঁ, আমি তো বিপ্লবী।

নাবিলা একটু গর্বের স্বরে বললো—এ জন্যেই তো আমি তোমাকে ভালবাসি।

উতওয়া তার স্বর একটু চড়িয়ে বললো—আমাদের বিপ্লব পুরুষদের বিপ্লব। যাতে কল্যাণ দেখি কেবলমাত্র তাতেই আমরা সময় ব্যয় করি, কিন্তু তোমার চিন্তা ও কার্যকলাপ কেবল প্রতিক্রিয়াশীল মস্তিস্ক প্রসূত।

নাবিলা হেসে উঠে বললো—এ ধরনের কথাতো জনসভায় বলা হয়।

—তার অর্থ?

—অর্থ হলো, শরীয়তের বিধান অনুযায়ী বিয়ে করা ছাড়া তুমি আমাকে স্পর্শ করতে পার না। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আইন অনুযায়ী আমকে বিয়ে করতে হবে।

ক্ষণিকের জন্য সে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। কেমন যেন একটা আশংকায় তার মাথা কেঁপে উঠলো। পেছনে সরে এসে সিগারেটের বাক্সটি উঠিয়ে নিলো। তার থেকে একটি সিগারেট নিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকাতে পাকাতে বললো—আমি শরা, শরীয়ত অথবা সুন্নাতের কথা শুনতে চাইনে। এসব শব্দ আমি খুবই ঘৃণা করি।

নাবিলা অবাক হয়ে মুখ হা করে বসে পড়লো। তারপর বললো— হায়! হায়! তুমি মুসলমান। তোমার আব্বা একজন বিশিষ্ট দ্বীনী আলেম। কেমন করে তুমি এ কথা মুখে আনলে?

উতওয়া নিকটেই একটি নরম গদি অাঁটা চেয়ারে গিয়ে বসলো। একটি পেয়ালায় কিছু পানিয় ঢেলে এক নিঃশ্বাসে পান করলো। তারপর একটু ঢেকুর তুলে বললো—এসব বাক্য বা শব্দ যাই হোক না কেন, এর অর্থ কিন্তু আমার কাছে একই। বিদ্রোহ অথবা প্রতিবিপ্লব। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সব কিছুর উর্ধে।

নাবিলা হেসে উঠলো। তার দুটি পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করতে লাগলো। তারপর আস্তে আস্তে বললো—তুমি কি আমাকে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের লোক বলে মনে করেছো?

—উতওয়ার দু'চোখে রাগের চিহ্ন ফুটে ওঠে। রাগত স্বরে সে বলে উঠলো—রাজনৈতিক আলাপ আলোচনা আমাদের এড়িয়ে চলা উচিত।

—উতওয়া! আমাদের আক্‌দ পর্যন্ত তোমার ইচ্ছার বাস্তবায়ন বিলম্ব করলে তুমি কি রাগ করবে?

অত্যন্ত দুঃখের সাথে সে বললো—আক্‌দ তো এক টুকরো কাগজ ছাড়া আর কিছুই না।

—কিন্তু এটা এমন একটা ফটক যেখান দিয়ে সম্ভ্রান্ত লোকেরা প্রবেশ করে থাকেন এবং একাজটুকুই—হারাম ও হালালের মধ্যে পার্থক্য সূচিত করে থাকে।

উতওয়া পেয়াল্লায় দ্বিতীয়বার মদ ঢেলে পান করতে উদ্যোগী হল। নাবিলা দ্রুত তার দিকে এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরে ফেলল এবং তাকে পান থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করতে থাকল। তখন উতওয়া বললো—আমাকে আমার অবস্থায় ছেড়ে দাও। আমি যা কামনা করি সেটাই হালাল।

—উতওয়া! আমি খোদা নই।

উতওয়া দীর্ঘক্ষণ তার দিকে চেয়ে রইল। তারপর মাথা নেড়ে বললো—

মনে হচ্ছে, আমরা ঐক্যমতে পৌঁছুতে পারব না।

নাবিলা তার কথার কোন উত্তর না দিয়ে তার ব্যাগটি হাতে নিল। তারপর বের হতে হতে বললো—আমি যা বলছি তা মেনে না নেয়া পর্যন্ত দ্বিতীয়বার এখানে আসব না।

নাবিলা তাকে একা রেখে চলে গেল। সে সিগারেটের বাকী অংশটুকু হলুদ রংয়ের কাঁচের ছাইদানীতে নিক্ষেপ করলো। লাল পর্দায় ঘেরা কক্ষের চতুর্দিকে সে তার উদভ্রান্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে থাকলো। এক সময় যে চেয়ার-টায় নাবিলা বসেছিল সেখানে গিয়ে তার দৃষ্টি স্থির হলো। বলে উঠলো, 'হুঁ সে তার বই ভুলে রেখে গেছে।' বইটির দিকে এগিয়ে গিয়ে হাতে তুলে নিল। বইখানি ফরাসী ভাষায় লিখিত। শিরোনাম পড়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলো। অথচ সে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে চার বছর ফরাসী ভাষা পড়েছিল। সে বইখানা লাল ও কালো রংয়ের গালিচার ওপর নিক্ষেপ করে পা দিয়ে ডলতে থাকলো। তারপর তার উপর থু থু নিক্ষেপ করে বিড় বিড় করে বলতে লাগলো—জগতে এখনো বহু নির্বোধ রয়েছে। হ্যাঁ, নির্বোধই! কারণ তারা বাস্তবের চেয়ে বইয়ের পৃষ্ঠার মাঝেই বেঁচে থাকে। ঐ ছাগলগুলিকে আমি বিদ্রোহীদের কারাগারে কোড়া দিয়ে তাড়িয়ে থাকি। পাঠাভ্যাসের ন্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ অপরাধের জন্যে আমি তাদের দেহকে ক্ষত বিক্ষত করে দেই। হ্যাঁ, আমি তাদেরকে বই দেয়া নিষিদ্ধ করে যথার্থ কাজই করে থাকি। কিন্তু এই পাগল মেয়েটিকে কি ভাবে পড়া থেকে বিরত রাখতে পারি? তার ওপর এবং যে সাহিত্য বিভাগ থেকে সে ডিগ্রী নিয়েছে সে বিভাগের ওপর এবং তার শিক্ষকতা পেশার ওপর অভিসম্পাত!

উতওয়া কলিং বেল বাজালো। একটি নির্বাক চাকর কক্ষে প্রবেশ করলো। প্রকৃতপক্ষে সে চাকর নয়, বরং সে একজন সংবাদ বাহক সৈনিক। উতওয়া তাকে বিশেষ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। সে পদ্ধতির মূলকথা হলো 'আমি কিছুই দেখিনে, কিছুই শুনতে পাইনে।' সাঈদের এক অজ্ঞাত পল্লী থেকে আগত

সৈনিক 'উয়াইস' এ দর্শনই শক্তভাবে মেনে চলে। সে তার মনিবের গৃহে থাকে, ধোপা ও চাকরের কাজও করে থাকে। উতওয়া চিৎকার করে উঠলো—

ওরে গাধা! ড্রাইভারকে গাড়ী প্রস্তুত করতে বল।

নীরবে 'উয়াইস' মাথা নাড়লো। তার পর দ্রুত সে চলে গেলো যেমনি তার প্রভূ তাকে অভ্যস্ত করে তুলেছে। উতওয়া তার গাড়ী নিয়ে সামরিক কারাগারের দিকে যাত্রা করলো। গাড়ী ও পথিকের ভীড় এবং শোরগোলে রাস্তা পরিপূর্ণ ছিল। প্রতিটি বস্তু যেন একই গতিতে ভেসে যাচ্ছে। আর এটাই যেন স্বাভাবিক। উতওয়া অত্যন্ত অবহেলার দৃষ্টিতে জানালার কাঁচের ভিতর দিয়ে রাস্তার দিকে তাকালো। ঠোঁট বাঁকা করে বললো, যাদেরকে দেখছি এরা কারা? এরা সমাজের আবর্জনা। এদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার কিছু গুরুত্ব আছে। এরা ভবঘুরে, রাস্তায় রাস্তায় হাসাহাসি, হই হল্লা করে অথবা নীরবে রাস্তা দিয়ে যায়। এরা কি জানে, উতওয়া আল-মালওয়ানী কে? উতওয়া সেই ব্যক্তি যার পদতলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শ্রেষ্ঠ ধনাঢ্য ব্যক্তি, প্রথম শ্রেণীর পাশারা এবং মন্ত্রীবর্গ সামরিক কারাগারে নত হয়ে পড়ে। তারা কাকুতি-মিনতি সহকারে তার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করে। বিশেষভাবে উচ্চ ক্ষমতার দিক দিয়ে এবং সাধারণ ভাবে দেশের নিরাপত্তার দিক দিয়ে উতওয়া কে, তা কি তারা জানে? সে কে, তা যদি তারা জানতো তাহলে সত্যিকারভাবে তারা জোরে চিৎকার দিয়ে অথবা তালি বাজিয়ে রাস্তা ছেড়ে দিয়ে দু'ধারে গড়িয়ে পড়তো। অথবা সম্মান প্রদর্শনের জন্যে মাথা নত করে কুর্নিশ করতো। খোলা জানালা দিয়ে মেয়েরা উঁকি দিয়ে দেখতো। শিশু কিশোররা বীরত্বমূলক গান গেয়ে গেয়ে তাকে স্বাগত জানাতো। গ্রাম ও বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত জনগণের ভীড়ে রাস্তাঘাট পরিপূর্ণ হয়ে যেত। আর তারা এ মহান ব্যক্তিটিকে প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাতো। রাগে ক্ষোভে উতওয়া বিড় বিড় করতে থাকে—'মানুষগুলো সব নির্বোধ, জন্তু জানোয়ার!' অকস্মাৎ রাস্তা অতিক্রমকারী একটি মেয়ে তার গাড়ীর সামনে পড়লো। কিন্তু সে পালায়নরতা হরিণীর ন্যায় দ্রুত সরে গেল। এরই মধ্যে চালক পা দিয়ে ব্রেক চেপে ধরেছে, ক্ষীণ একটা ঝাকুনি দিয়ে গাড়ী থেমে গেল। উতওয়া চিৎকার করে চালককে নির্দেশ দিলো—হারামজাদা! ওকে পিষে ফেল।

—জনাব, এমন হুকুম করবেন না। এমনটি করা হারাম।

– তোমার জীবন ও পরিবার ধ্বংস হোক।

এরপর উতওয়া নিজের হাত উঠিয়ে চালক সৈনিকের কাঁধের উপর রাখলো। চালক মুখে কোন কথা না বলে গাড়ী চালাতে থাকল। অশ্রুধারায় তার গণ্ডদ্বয় সিক্ত হয়ে পড়লো। উতওয়া নাবিলার চিন্তা করছে। নাবিলার চিন্তা তাকে যেভাবে বেষ্টন করে ফেলেছে তা ফিলিস্তিনে আরব ইহুদীদের যুদ্ধের

প্রথম দিনগুলিতে ‘ফালুজা’ নামক স্থানে শত্রুদের বেষ্টনীর দুশ্চিন্তা থেকেও বেশী কষ্টদায়ক। সে ভাবছে, নাবিলার শক্তির উৎস সম্পর্কে। সে তো একটি নারী ছাড়া কিছুই নয়। কত নারীইতো অর্থের বিনিময়ে নিজেকে বিক্রি করে ফেলেছে,পদমর্যাদা ও ক্ষমতা তাদেরকে প্রলোভিত করেছে। অথবা লোক লস্করের মাধ্যমে ভয় দেখিয়ে তাদেরকে বশীভূত করা হয়েছে। কিন্তু এ মেয়েটি? যার বয়স এখনো চব্বিশ বছর অতিক্রম করেনি, তাকে তো ভিন্ন জগতের বলে মনে হচ্ছে। উতওয়া তার সামনে অক্ষম হতভম্ব হয়ে যায় এবং নিজের মধ্যে কিছুটা ক্রোধও অনুভব করে থাকে। সে তাকে পা দিয়ে পিষে ফেলার চিন্তা করেছে। কিন্তু তাতে তার মন সায় দেয় না। তার দৈহিক শাস্তির কথাও ভেবেছে। কিন্তু নাবিলা যে অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত বংশীয় ও ভদ্র। একবার সে জোরপূর্বক তাকে আঁকড়ে ধরার পরিকল্পনা করলো। কিন্তু তার হাত সঞ্চালিত হলো না। যেন তা অবশ হয়ে গিয়েছিল। সে তাকে স্মৃতি থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করলো। কিন্তু তার অন্তর তাকে স্মরণ করতে এমন ভাবে বাধ্য করলো যেন সে এক্ষেত্রে ও তার ক্ষমতা প্রতিপত্তি থেকে নিষ্কৃতি লাভে অক্ষম হলো। নিজের অন্তরে সে বিশ্বাস করে, সে-ই সবার থেকে বলীয়ান, সকলের চাইতে শক্তিমান। তাহলে একটি নারী তার কামনাকে পর্যুদস্ত করে তার ওপর শর্ত আরোপ করতে সক্ষম হয় এবং কিভাবেই বা শুধুমাত্র কথা অথবা প্রতিকূল ভূমিকার দ্বারাই সে তার নিজের উদ্দেশ্যকে তার ওপর বাস্তবায়িত করছে? সে তার এসব ক্রিয়াকলাপের অর্থ ভেবে পায় না। যে দিন তার সাথে পরিচয় হয়েছিল সে দিনটির ওপর অভিসম্পাত দেয়। তুমি কি মনে করো, সে তাকে যাদু করেছে? সে তো না যাদুতে এবং না কোন প্রকার ভূত প্রেতে বিশ্বাস করে। নাবিলার মধ্যে যা কিছু দেখেছে, তাতে সে এখন নিজেই তার পুরাতন আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তা দর্শনে সন্দেহ পোষণ করতে শুরু করেছে। আর সবচেয়ে বড় মুসিবত হলো, এ মেয়েটি হালাল-হারাম, শরীয়ত এবং আল্লার বিধান সম্পর্কেও এ যুগে আলোচনা করে থাকে। ওরে বিকারগ্রস্থ মেয়ে, সামান্য একটি রিপোর্টের দ্বারাই তোকে মারাত্মক দোষে দুষিত করার ক্ষমতা আমার আছে। আমার সেক্রেটারী শুধু বলবে, তুমি রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিরোধী কার্য-কলাপে জড়িত। অথবা বিদেশী গোয়েন্দাদের সাথে তোমার যোগাযোগ রয়েছে। অথবা তুমি ইহুদীবাদ বা আমেরিকার পক্ষে কাজ করছ। সংগে সংগে তারা তোমাকে এক নিকৃষ্ট অন্ধকার জিন্দান খানায় নিক্ষেপ করবে, যেখানে পানি, বাতাস বা কোন কোমল শয্যা নেই। সেখানে নির্জনে একাকী, যন্ত্রণা ও ভীতির মধ্যে তোমার দিন অতিবাহিত হবে। অতি স্বল্প সময় অতিবাহিত না হতেই চিরতরে তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পাবে। তুমি কি ভীষণ বোকা। তুমি কি জান না, আমি কে? ভালো কথা, খুব শীঘ্রই আমি তোমাকে বিদ্রোহীদের কারাগারে নিয়ে আসবো। তখন বুঝতে পারবে আমি কে?

আমি শপথ করছি, তোমাকে সেখানে আনবোই। সামান্য একটু রসিকতা। তুমি দেখতে পাবে, আমার চারপাশে কুকুর, সৈনিক, বন্দী ও অফিসারদে-রকে। অতি সত্বরই তুমি দেখতে পাবে আমার যাদুর লাঠিটি যার ইঙ্গিতে নিমেষেই আমি কারাগারকে ওলটপালট করে ভয়াবহ কসাইখানায় পরিণত করি। সেটা বিংশ শতকের সর্বোৎকৃষ্ট কসাইখানা। সেখানে তুমি দেখতে পাবে আল্লার পথের সৈনিকদেরকে, আর অতীতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের মুকুটকে যারা নাড়িয়ে দিয়েছিল সে সব প্রথম শ্রেণীর বীরসন্তানদেরকে। তাদেরকে মারাত্মক ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় টানা হেচড়া করে নিয়ে যাওয়া হবে। তাদের শরীর থাকবে রক্তাক্ত ও চোখ অশ্রু সিক্ত। তারা অপমান ও লাঞ্চনার চরমে গিয়ে উপনীত হবে। এসব যখন দেখবে তখন বুঝবে উতওয়া আলমালওয়ানীকে? মানব জাতির মধ্যে তার স্থানই বা কি? আমাদের কার্যাবলীর ইতিহাস যখন তারা লিখবে, সে ইতিহাসে আমার মর্যাদাই বা কি হবে, তাও জানতে পারবে।

সামনের দরজাটির ওপর 'কেন্দ্রীয় অঞ্চল সামরিক কারাগার'—এ সাইনবোর্ড লেখা। বিরাট বপুধারী কালো দ্বার-রক্ষীটি তার দরজা খুলে দিল। যেই মাত্র দরজা খুলেছে অমনি একজন সৈনিক চোঙা মুখে দিয়ে এবং অন্য এক-জন মুখ গোল করে চিৎকার করে বলে উঠলো, 'সমগ্র কারাগার ঠিক আছে।'

আবার নীরবতা ও স্তব্ধতা বিরাজ করতে থাকে। কারাগারের আংগিনা একটি মোমের যাদুঘরে পরিণত হয়। ট্যাকসি চলার শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না। ট্যাকসিটি ধীরে ধীরে বিদ্রোহী কারাগারের পরিচালনা দফতরের সামনে গিয়ে থামে। গাড়ী থেকে 'উতওয়া' অবতরণ করেই একটু মোড় নেয়। তারপর অত্যন্ত কর্মঠ ও ক্ষিপ্রভাবে একটু জোর গলায় অফি-সারদের সাথে কুশল বিনিময় করে। কুশল বিনিময়ের পালা শেষ করে উতওয়া প্রায় খোদার মত হয়ে যায় এবং সামনে পা বাড়ায়। সাধারণ অনু-সন্ধান বিভাগের কর্মকর্তারা তাকে অভিবাদন, চিরাচরিত ভ্রাতৃসুলভ হাসি এবং কপটতাপূর্ণ বাক্য ও হাসি দ্বারা স্বাগত জানায়। সে তাদের সাথে করমর্দন করে এবং একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে তার অফিসে গিয়ে বসে। একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে কিছুক্ষণ নীরব থাকে। তারপর বলে—আচ্ছা 'মুনাইয়া বন্দরাহ' থেকে আগত আযহারী ছেলেটি স্বীকার করেছে?

একজন ছোট ধরণের অফিসার উত্তর দিল—জনাব পাশা, আপনি এখনো তার শহরের নাম স্মরণ রেখেছেন?

—হ্যাঁ। আর ওর নাম 'মাহমুদ' সাকার।'

—মাশাল্লাহ। জনাব পাশা! প্রভু সর্বদাই আপনাকে আলৌকিক মেধার সাহায্যে পূর্ণতা দান করুন।

উতওয়া পুনরায় প্রশ্ন করলো—স্বীকার করেছে?

—না। তার মাথা পাথরের মত কঠিন।

—তাকে আমার নিকট নিয়ে এসো। আমি তার মাথা গুড়ো করে ফেলবো।

—তাকে শেষ করে দেওয়ার নতুন নির্দেশ এসেছে?

— নির্দেশ? আমার জন্য নির্দেশ? আমি যা করবো তাতে সবাই একমত। কোন প্রকার বিলম্ব ছাড়াই এখনই তাকে আমার কাছে হাজির করো।

অফিসারটি চলে গেলো। আর তার সাথে গেলো অফিসের বাইরে অপেক্ষমান কতিপয় সৈনিক।

৩

চার নম্বর সামরিক কারাগারে একটি সেলের ঠাণ্ডা মেঝের ওপর 'মাহমুদ সাকার' হামাগুরি দেয়ার চেষ্টা করছিল। একটু নড়াচড়ার চেষ্টা করলেই শরীরের প্রতিটি অংগ-প্রত্যংগে ভীষণ ব্যথা অনুভব করছিল। তার চেহারা, মুণ্ডিত মস্তক ও চামড়ার প্রতিটি স্থানে চাবুকের হলুদ ও লাল চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে আছে। এছাড়া আরো কিছু ক্ষত আছে যা থেকে অনবরত পুঁজ ঝরছে। একই স্থানে বার বার আঘাত, উতওয়ার কুকুরগুলির দংশন অথবা জ্বলন্ত সিগারেট ঠেসে ধরার কারণেই এসব ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। সে অনুভব করছে, তার শরীরের তাপ অত্যধিক। পিপাসায় গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, একটু পানি পান করার কতই না আশা করেছে! কিন্তু সেলটি একেবারে শূন্য। সে নগ্ন অবস্থায় ঘুমায় কেননা তার উতপ্ত ফোলা শরীর কোন কিছুর স্পর্শই সহ্য করতে পারে না। কখনো তার চোখের পাতা সামান্য খুলে যায়। তার মনে হয়, সে হিংস্র জন্তু-জানোয়ারে ভরা একটি উত্তপ্ত বিজন ভূমিতে পথ হারিয়ে ফেলেছে। হিংস্র নেকড়েরা এখনই তাকে টেনে-ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে। দূরে সে মরীচিকা দেখতে পাচ্ছে। জিভ দিয়ে যে মুখ চেটে নেয়। ......পানি......দয়া...... । না, কেউই সাড়া দেয় না।

এ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি কেন? মাহমুদের কাছে ব্যাপারটি সামান্য। এর জন্য এমন নির্মম প্রাণঘাতী প্রত্যুত্তর প্রয়োজন ছিল না। ব্যাপারটি তো শুধু এই ছিল, সে একটি জীবন ব্যবস্থা ও শাসন পদ্ধতির দিকে দাওয়াত দিয়ে থাকে। তার দৃঢ় বিশ্বাস, এরই মাধ্যমে সত্যিকার ন্যায়বিচার, শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সত্যের দিকে আহ্বান জানানো অবশ্য কর্তব্য—এ দৃঢ় বিশ্বাসের কারণেই সে মানুষকে এ দিকে দাওয়াত দিয়ে থাকে। বিশেষত আল্লাহর আদেশের ব্যাপারে। আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে সে এমনটিই শিখেছে। যখন সে ইতিহাস পাঠ করে চিন্তা-ভাবনা করছে আর উপর্যুপরি তুলনা করতে গিয়ে চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়েছে, তখন তার সুদৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছে, আল্লার দেয়া বিধানই একমাত্র বিধান। মানব রচিত জীবন পদ্ধতির চেয়ে ঐশী পদ্ধতি পূর্ণ নিরপেক্ষ ও পরিপূর্ণ। সৃষ্ট জীবের কল্যাণ ও সৌভাগ্য কি সে সম্পর্কে স্রষ্টাই সর্বাধিক

জ্ঞাত। মাহমুদের দৃষ্টিতে এ বিশ্বাস থেকে সামান্য নড়চড় হওয়া বক্রতা, ধ্বংস ও সত্যকে অস্বীকার করার নামান্তর। এই বোধই মাহমুদের কাছে চূড়ান্ত।

কিন্তু এক সন্ধ্যায় একদল উন্মত্ত ও সশস্ত্র লোক বাঁশি ফুকিয়ে তার বাড়ীটি ঘেরাও করে ফেলল এবং রাতের অন্ধকারে তার বৃদ্ধ দ্বীনি আলেম পিতার ওপর চড়াও হল। পিতা মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন আর কেবল মাত্র আল্লার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকলেন। সশস্ত্র লোকগুলি তার মা ও বোনদের ওড়না টেনে দূরে ছুঁড়ে মারলো। গৃহের ছোট বড় সকলকে তারা ভীতি-বিহ্বল করে তুলল। সারা রাত ধরে এ প্রলয়কাণ্ড চললো। ভোরের অস্পষ্ট আলোয় শিশুরা জেগে চিৎকার শুরু করলো। মহিলারা কেঁদে কেটে সারা হল। ছোট্ট গ্রামের নারী-পুরুষরা বাড়ীটির চারপাশে সমবেত হয়ে এ ঘটনার নির্বাক সাক্ষী হয়ে রইলো। সশস্ত্র ব্যক্তিরা কাউকে ধাওয়া করতে থাকলো, কাউকে পিটাতে থাকলো। তাছাড়া অকথ্য ভাষায় গালি বর্ষণ করতে থাকলো। ক্ষুদ্র গ্রামটির ওপর এক প্রকার ভীতি ও শঙ্কা তার দু'টি কালো পাখায় ভর করে সারা রাত যেন ভীষণ ভাবে কোদাকুদি করতে থাকল। গ্রামবাসীরা এই প্রথমবারের মত এমন দৃশ্য দেখলো। তাও দেখলো সর্বাধিক সমভ্রান্ত, ঐতিহাসিক দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ, সৎকর্ম, দয়া ও ভালবাসার দিক দিয়ে সর্বোত্তম একটি গৃহে। ষাট বছরের শুভ্র শ্মশ্রু বিশিষ্ট এক বৃদ্ধ অনুচ্চ স্বরে বলে উঠলো, 'এটা শয়তানের জামানা, আমরা শেষ জামানায় এসে গেছি……'। আর মাহমুদের পিতা? তিনি দেখলেন, তার শিক্ষক-ছেলেটিকে তারা নগ্ন পায়ে টানা হেচড়া করে নিয়ে যাচ্ছে। কেবল ঘুমের পোশাক ছাড়া তার গায়ে আর কিছুই নেই। গভীর দুঃখে তিনি একটু মাথা দোলালেন আর তার গাল বেয়ে বিষাদের অশ্রু গড়িয়ে পড়লো। অচেতন ভাবে তিনি বলে উঠলেন—'অত্যাচার—কিয়ামতের আলামত, আমার অসহায় পুত্র! আল্লাহ তোমার সহায় কোন—।' মাহমুদ হতভম্বের মত তাদের সাথে চলছিল। তারা এমনটি কেন করছে! মাহমুদ তাদের সাথে বুঝাপড়ার চেষ্টা করলো কিন্তু, কেউ তাকে উত্তর দিল না। তাদের কারণ জিজ্ঞেস করায়, 'ওরে কুত্তা, চুপ কর' —এ কথা বলে একজন অফিসার মাহমুদের গালে কষে মারলো এক চড়। মাহমুদ তাদের জিজ্ঞেস করলো—আমাকে গ্রেফতার করার কোন সরকারী নির্দেশ আপনাদের কাছে আছে কি?

ব্যংগভরে একজন অফিসার উত্তর দিল—জাহান্নামে যা। সরকার আবার কি?

— জনাব! এটা তো আইন···

—তোর সরকার আর তোর আইনের বাপের নিকুচি করি।

এধরনের বাক্য মাহমুদ এই প্রথম বারের মত শুনলো। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্বেও তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো—আমরা তো জংলী নই। আমরা বিংশ শতকের সভ্য মানুষ।

অফিসারটি আবার সজোরে মাহমুদের গালে কষে চড় মেরে দিল। তারপর তার জামার কলার ধরে টানতে টানতে ধাক্কা দিয়ে পুলিশের গাড়িতে ঠেলে দিয়ে বললো—তোর রুমাল বের করে দু'চোখ বেঁধে নে। এটাই নির্দেশ, দার্শনিক সাজিশ না।

— আমার কাছে রুমাল নেই।

—তাহলে তোর পাজামা খুলে নে।

—এটা কি যুক্তিসংগত কথা হলো?

গোয়েন্দা বিভাগের একজন পুলিশ দৌড়ে এসে তার জামার পকেট থেকে একখানা ময়লা দুর্গন্ধময় রুমাল বের করে বললো—মাননীয় বেগ সাহেব? এই নিন, আমার কাছে রুমাল আছে।

ওরা মাহমুদের চোখ দু'টি শক্তভাবে বেঁধে দিল। সে আর কিছুই দেখতে পেলো না। তার চারপাশের জগৎ সম্পূর্ণ অন্ধকার। গাড়ীর ঘড় ঘড় আওয়াজই কেবল সেই প্রচণ্ড নিরবতা ভংগ করছিল। গ্রামে মহিলাদের চিৎকার, মোরগ ও মুয়াযযিনের কণ্ঠস্বর ক্রমে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এলো। একটা অজানিত শংকা ভয়ংকর হিংস্র জন্তুর ন্যায় দাঁত বের করে যেন গ্রাস করতে লাগলো তাকে। অথবা বিষাক্ত সাপ-বিচ্ছুতে পরিপূর্ণ একটি গুহার ন্যায় মনে হতে লাগলো তার। তার মন বলছিল, ব্যাপারটি নিশ্চয়ই মারাত্মক হবে। কিন্তু এমন মারাত্মক হবার কারণ কি?

—জনাব বেগ সাহেব! অনুগ্রহ পূর্বক একটু মার্জিত আচরণ করুন। আমার অপরাধ কি, তা আমি জানতে চাই।

—সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত একটি গোপন সশস্ত্র সংগঠনের সাথে সম্পর্ক। কি, নিশ্চিন্ত হলে?

অফিসারের কণ্ঠস্বর যেদিক থেকে ভেসে আসছিল, মাহমুদ সে দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো—মিথ্যে, এ কথা কে বলেছে?

—প্রশ্ন করার কোন অধিকার তোমার নেই। খুব শীঘ্রই আমরা তোমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করবো এবং তুমি নিজেই টের পাবে।

—আমার কাজ আমার গোপনে কিভাবে হতে পারে, আমিতো মানুষকে আল্লার দিকে আহ্বান জানিয়ে থাকি রাস্তাঘাটে, মসজিদে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সর্বত্রই। যার মর্মকথা সম্পর্কে সরকার জ্ঞাত আর এ কাজও করে থাকি এমন একটি সংগঠনের সাথে, সরকার যার কর্মতৎপরতার অনুমতি দিয়েছে।

চোখ বাধা যুবকের দিকে অফিসারটি তাকিয়ে বললো—আর রাষ্ট্রপ্রধানকে হত্যার ষড়যন্ত্র—তারও কি আইন অনুমতি দিয়েছে?

—আমার সাথে সম্পৃক্ত ছাড়া আর কোন বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করবেন না। আমি এধরনের কাজের চিন্তা-ভাবনা, ষড়যন্ত্র বা অন্য যে কোন প্রকার চেষ্টার সাথে জড়িত নই।

অফিসারটি বললো—তুমি কি মনে করছো, তোমার এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করতে থাকবো?

মাহমুদ কিছুটা উত্তেজিত এবং আত্মপ্রত্যয়ের সাথে দাঁতে দাঁত চেপে উত্তর দিলো—আমাকে কেউ দোষী প্রমাণ করতে পারবে না।

অফিসারটি ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললো—তুমিতো নিজেই তোমার দোষ স্বীকার করছো।

—কিভাবে?

কিছুক্ষণ পূর্বেই তুমি কি স্বীকার করনি, তুমি মানুষকে দাওয়াত দিয়ে থাক?

—এটা কোন অপরাধ নয়।

—তুমি জানতে পারবে, আসলে, তোমরা সর্বদাই ঝগড়া ও তর্কে পটু। সরকারের এরূপ অর্থহীন প্রলাপ শোনার মত সময় নেই। কোথায় তোমাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তা কি তুমি জান?

মাহমুদ সংগে সংগে উত্তর দিলো—না।

—বন্ধু! সামরিক কারাগারে। সামরিক কারাগার কাকে বলে, জান?

—আমি তো কোন সৈনিক নই। আমাকে সেখানে কেন নিয়ে যাচ্ছেন?

—কোনটি ঠিক ও কোনটি ঠিক নয়, সে সম্পর্কে কর্তৃপক্ষই বেশী ভালো জানেন।

—কিন্তু, জনাব! দেশে তো আইন-কানুন আছে।

—উত্তম কথা, অতি শীঘ্রই তোমার মাথা থেকে এসব আজে-বাজে কথা দূর হয়ে যাবে, যখন উতওয়া বেগ ও বাশ্গাবিশ ইয়াসিন তোমার সাথে মিলিত হবেন। এ দু'জনের নাম শুনেছো?

ভীতিমিশ্রিত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার মধ্য দিয়ে সময়গুলি অতিক্রম করছিল মাহমুদ। জেলখানার সামগ্রিক পরিবেশ জাহান্নামের মত। আঘাত, অশ্লীল গালাগালি, রক্তের স্রোত, অত্যাচারিতের আহাজারি এবং মজলুমদের মুক্তি কামনার 'ইয়া রব' ধ্বনি ছাড়া সেখানে আর কিছুই শুনা যায় না। এটাই হচ্ছে সেখানকার একমাত্র সান্তনা বাক্য, যদিও তা শোরগোল, চিৎকার অনুসন্ধানকারীদের ধারাবাহিক প্রশ্নের মাঝে বিলীন হয়ে যায়। অনুসন্ধানকারীদের জিদ হচ্ছে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি তাদের যে অভিযোগ, সে অভিযোগ তারা স্বীকার করুক—যদিও বাস্তবের সঙ্গে এর কোন মিল নেই। এ ভীতিপ্রদ উপত্যকার অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তারা যেন এক অদ্ভুত নাটক রচনায় লিপ্ত। তারা সংলাপ দৃশ্য এবং বিভিন্ন চরিত্রের ভূমিকা নির্ধারণ করে থাকে। তাদের নির্ধারিত ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য অভিনেতা, অভিনেত্রী সংগ্রহ করে থাকে। তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া বাক্য তারা উচ্চারণ করে যদিও তা বাস্তব বা সত্যের সাথে বিন্দুমাত্র সঙ্গতিপূর্ণ নয়। মাহমুদ নিজেকে একটি

সশস্ত্র দলের নেতা রূপে দেখতে পেলো। তারা এ কথাই তাকে বললো। মাহমুদ তাদের রচিত এ অভিযোগ স্বীকার করতে প্রস্তুত হলো, যাতে এ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি, দীর্ঘ বিনিদ্রা, প্রাণসংহারকারী তৃষ্ণা এবং অসহ্য ক্ষুধার হাত থেকে নিজেকে কিছুটা রেহাই দিতে পারে। এতটুকু চিন্তা করে মাহমুদ যেন সামান্য একটু তৃপ্তি অনুভব করলো। এমন একটু সময় তার প্রয়োজন যাতে সে সামান্য স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারে এবং যে অপ্রত্যাশিত মুসিবতে সে জড়িত হয়েছে, সে সম্পর্কে কিছু চিন্তা ভাবনার সুযোগ লাভ করতে পারে।

—হ্যা, আমি এ গোষ্ঠীর নেতা।

তদন্তকারী অফিসাররা তার এ কথা শুনে একটু মুচকি হাসলো। উতওয়া আল-মালওয়ানী তার দিকে একটু এগিয়ে এসে সহানুভূতির ভান করে বললো—তাহলে এমন অযৌক্তিক ভাবে অস্বীকার করছিলে কেন? প্রথম থেকে স্বীকার করে শাস্তির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করাই কি ভালো ছিল না?

—দুঃখিত জনাব আফেন্দী! কিছুটা হতাশার সুরে অনুচ্চ কণ্ঠে মাহমুদ বললো।

—কিন্তু এখন সমস্যা হলো, তুমি যে তাদের নেতা, এ কথা তোমার বন্ধুরা স্বীকার করছে না।

—ভালো কথা, তাদের একটু আমার সামনে উপস্থিত করুন, আমি তাদের বুঝাবো।

—এটা একটা বুদ্ধিমত্তা।

চারজন যুবক উপস্থিত হলো। মাহমুদ তাদের জানালো যে, সে তাদের নেতা বলে স্বীকার করেছে। তারা যেন আকাশ থেকে পড়লো। অবাক হয়ে তার দিকে চেয়ে বললো—এটা তো সম্পূর্ণ মিথ্যা। মাহমুদ অত্যন্ত যন্ত্রণাকাতর অবস্থায় একটু মাথা দুলিয়ে তাদের জানালো, আসল ঘটনা সম্পর্কে সে সম্যক অবগত। তাদের উচিত হবে তার কথা শোনা। তারা তার উলঙ্গ, রক্তাক্ত শরীর, ক্ষত-বিক্ষত ফোলা মুখমণ্ডল ও তার আশেপাশে চাবুকধারী ব্যক্তিদের প্রতি দৃষ্টি পাত করলো। তেমনিভাবে তারা লক্ষ্য করলো আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা হিংস্র ও ক্রোধান্বিত কুকুরগুলির প্রতি। তারা আরো দেখলো, উতওয়ার অস্বাভাবিক ভয়ংকর চাহনি, যা পাশেই অবস্থিত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের মতই দেখাচ্ছিলি। তারা মাহমুদের কথা সমর্থন করলো। উতওয়া সংগে সংগে খুশীতে কিছুটা লাফ দিয়ে উঠলো এবং নিকটেই অবস্থিত একটি চেয়ারে গিয়ে বসলো। তারপর সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করতে করতে বললো—এখন তাহলে অস্ত্র কোথায়?

মাহমুদের জ্ঞান লোপ পাবার উপক্রম হলো। তারা কোন অস্ত্রের কথা বলছে? মাহমুদ জীবনে অস্ত্র স্পর্শ করেনি। তার গ্রামের বাড়ীতে কোনদিন অস্ত্র

প্রবেশ করেনি। পুলিশ তো বাড়ীতে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করেছে। বালিশ, লেপতোষক ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে, তেল, পনির, ঘির মটকাগুলি ভেঙ্গে ফেলেছে এবং বাক্স, সিন্দুক ও গোপন কোষাগার চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেলেছে। পবিত্র কুরআন, হাদীস ও সিরাতুর রসুল সহ সকল বই-পুস্তক ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলেছে। তাছাড়া বাড়ীর সংযুক্ত স্থানে মাটি খুঁড়েও দেখেছে—তাহলে এখন এই অভিনব প্রশ্ন কেন?

কিছুটা শংকাগ্রস্থভাবে বিড় বিড় করে মাহমুদ বললো— কোন অস্ত্র?

উতওয়া দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে জোর গলায় বললো—আমি তোমাকে বুঝতে পেরেছি আর এ মুহূর্তে তোমার মাথায় যা ঘুরপাকখাচ্ছে তাও আমার জানা।

—আমি আপনাকে শপথ করে বলতে পারি, এ বিষয়ে আমি কিছুই জানি না।

—মাহমুদ! তাহলে তুমি আমাকে বুঝিয়ে দাও, অস্ত্র ছাড়া কিভাবে তুমি একটি সশস্ত্র দলের নেতা হলে?

মাহমুদের দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। এমতাবস্থায় সে বললো—আমি তাদের নেতৃত্বের কথা স্বীকার করিনি। তবে আপনারা স্বীকার করতে বলছেন, তাই করছি।

—অর্থাৎ! ওরে কুত্তা! আমরা তোকে বানোয়াট অভিযোগে অভিযুক্ত করছি?

—জনাব! আমাদের কাছে কোন অস্ত্র নেই।

উতওয়া তার চারদিকে চোখ বুলিয়ে বললো—তোকে স্বীকার করানোর পদ্ধতি আমার জানা আছে।

একথা বলে সে একটু মাথা দুলিয়ে ইঙ্গিত করতেই মাহমুদের খুনঝড়া দেহে ক্রমাগত চাবুকের আঘাত পড়তে শুরু করলো। দলের অন্যান্য সঙ্গীদের ওর থেকে দূরে হটিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। এ শাস্তি চলতেই থাকলো। 'উহ'! 'ইয়া রব'—এ দু'টি বাক্য ছাড়া আর কোন কথাই সে উচ্চারণ করতে পারছিল না। একটা হ্যাংলা ধরণের পুলিশ অনবরত খুক, খুক করে কাশতে কাশতে চাবুকের আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করছিল মাহমুদকে। আর বলছিল! জনাব বলুন——না—না বলবেন না—আমি আপনার স্বীকারোক্তি চাই—না—আপনার মত লোকের বেঁচে থাকা সঙ্গত নয়——। মাহমুদের অনতি দূরে আর একটি যুবককে দেখা গেলো। চাবুকের আঘাত ও তার চারদিকের কুকুরগুলি তার দেহ ক্ষত-বিক্ষত করছে। তদন্তকারী অফিসার কাগজ-কলম হাতে তার পাশে দাঁড়িয়ে। হতভাগ্য যুবকটির ওপর এই বর্বরোচিত অত্যাচারের মাঝখানে তদন্তকারী অফিসারকে মাহমুদ বলতে শুনলো—তারা যখন তোমাকে বললো, 'মুনশিয়ার' ঘটনাটি একটি অভিনয় সদৃশ। এটা গোয়েন্দা বিভাগের রচনা—তখন তুমি কি বলেছিলে?

—আমি কিছুই বলি নি। আমাকে প্রহার করা থেকে তাদের একটু বিরত রাখুন—যাতে আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি।

—অসম্ভব। এ অবস্থায়ই তোমাকে উত্তর দিতে হবে।

—জনাব! এটা একটা বিরাট জুলুম।

—ওরে জানোয়ার! মর, গোষ্ঠীসুদ্ধ মর।.........হ্যাঁ, তুমিও কি মনে করো, মুনশিয়ার ঘটনা একটি অভিনয়?

—আমি সে সম্পর্কে কিছুই অবগত নই।

—এটি বাস্তব না বানোয়াট ঘটনা, তা না বলা পর্যন্ত তোমার মুক্তি নেই।

—জনাব! এটা একটি সত্য ঘটনা। আমাকে অনুগ্রহ করুন। আমি নির্দোষ। আমি ইখওয়ানের কর্মী নই। আমি মজলুম। অত্যাচারিত।

এরপর মাহমুদ আর কিছু দেখতে পায় নি। সে চেতনা হারিয়ে ফেলেছিল। কতক্ষণ এ ভাবে কেটেছিল সে তা জানে না। যতটুকু সে জানে তা হলো, বড় একটি চৌবাচ্চায় তাকে নিক্ষেপ করার পর সে জ্ঞান ফিরে পেলো। এটা ছিল তার জন্যে একটা সুবর্ণ সুযোগ। সে পেট ভরে পানি পান করে এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করলো। এরপর সে তার পাশেই একজন সৈনিককে একটি ইনজেকশনের সিরিঞ্জ হাতে দেখতে পেলো। এটাকে সে তার শরীরে পুশ করতে করতে বললো—এটা অত্যন্ত শক্তিবর্ধক ইনজেকশন। তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে।

মাহমুদ তার আশে পাশে চোখ বুলালো। সে দেখতে পেলো, উতওয়া বেগ তার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তার পাশেই একজন ডাক্তার। তার গায়ে সেনাবাহিনীর মেজর পদের তকমা লাগানো—পকেটে হাত ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে। চোখে তার সাদা চশমা। তার ভেতর দিয়ে একটা জ্যোতি মেজরের শুভ্র ও অনুত্তাপ মুখমণ্ডলের ওপর বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এ চোখে যেন কোন সময় তন্দ্রা আসে না।...তাদের আশে পাশে যারা ছিল তাদের পায়ের পাতা ও নলিতে শাস্তি অব্যাহত ছিল। চিৎকার......বেত্রাঘাত...ক্রন্দনরোল...। মাহমুদ আকাশের দিকে তাকালো। অন্ধকার বিদীর্ণ করে আকাশের তারকারাজি বিক্ষিপ্ত মুক্তার ন্যায় জ্বল জ্বল করছিল।

সে কান্নাজড়িত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো—'তুমি কোথায়?'

মাহমুদের মনে হলো সে যেন একটি ধ্বনি শুনতে পেলো, কে যেন স্পষ্টভাবে তাকে ডেকে বলছে—'আমি তোমার সাথে আছি।' কান্নায় তার কণ্ঠ রোধ হয়ে আসছিল। সে উচ্চস্বরে বলছিল—আমাকে তোমার কাছে উঠিয়ে নাও—আমি মৃত্যুকে ভয় করি না—আমাকে তোমার কাছে উঠিয়ে নাও, তুমিইতো আমার একমাত্র প্রিয়তম বন্ধু——ইয়া রহমান, ইয়া রাহীম—আমি যে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েছিলাম, সেটা ছিল তোমার করুণা, প্রভূহে! সেটাকে কেন চিরস্থায়ী করে দিলে না? জীবনে তো এমন কিছু নেই যার জন্য বেঁচে থাকা উচিত।

অনুচ্চ কণ্ঠে ডাক্তার বললো—সে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় প্রলাপ বকছে।

উতওয়া বললো—আমি এখনই তার সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনছি। একথা বলে

সে চাবুকধারীদের ইঙ্গিত করলো। কিন্তু ডাক্তার হাতের ইশারায় নিষেধ করে বললো—এখনই সে মারা যাবে। আপনারা তার থেকে কিছুই লাভবান হবেন না।

—তার জীবন একটি বকরীর জীবনেরও সমান নয়। সরকার বিরোধীদের থেকে দেশকে মুক্ত করার স্পষ্ট নির্দেশ আমার কাছে আছে।

—কিন্তু উতওয়া বেগ! তার জীবন অপেক্ষা তার স্বীকারোক্তি অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

—ডাক্তার সাহেব! আপনি কি পরামর্শ দিতে চান?

—আজ তাকে সেলে আটক করে রাখুন। আগামীকাল তার তদন্ত শেষ করুন। এরপর তারা তাকে শূন্য সেলের দিকে টানতে টানতে নিয়ে গেল। সেখানে আছে শুধু শীতল মেঝে, অন্ধকার, একাকীত্ব, প্রলাপ বকাবকি, নানা প্রকার দুশ্চিন্তা ও স্মৃতিচারণ। সেই সংকীর্ণ জগতের প্রতিটি কোণে অত্যাচারিতের হৃদয় একটু দয়া—একটু সহানুভূতি অনুসন্ধান করে ফেরে।——এই দিনই উতওয়া তার ভাবী বধূ 'নাবিলার' সাথে দেখা করতে গিয়েছিল একটি আকাংখিত রঙ্গীন রাতের কামনা নিয়েই। কিন্তু নাবিলাই তাতে বাধ সাধলো এবং তার ওপর কতগুলি শর্তও আরোপ করলো, যে গুলিকে উতওয়া অত্যন্ত কষ্টদায়ক এবং তার ইচ্ছা ও ব্যক্তিত্বের পরিপন্থী বলে মনে করলো। গাড়ীতে উঠেই উতওয়া ক্রোধে ফেটে পড়তে চাইলো। এঅবস্থায়ই সে সামরিক কারাগারে প্রবেশ করলো এবং প্রথম যে বিষয়ে চিন্তা করলো, তা হলো বন্দী মাহমুদ সাকার। উতওয়ার দৃষ্টিতে মাহমুদ অত্যন্ত জেদী। সে জেদকে অত্যন্ত ঘৃণা করে, তার আকার—আকৃতি যাই হোক না কেন। মাহমুদের মাথা চূর্ণ করতে পারলেই সম্ভবত সে একটু শান্তি লাভ করতে পারবে। অন্তত সে তার একটি অভিযানে জেদকে জব্দ করতে পেরেছে বলে মনে করবে। যদিও সর্বশ্রেষ্ঠ অভিযান—নাবিলা বাকী রয়েছে।

৪

উতওয়া মাহমুদের জন্য অপেক্ষা করছে। তার মানসলোকে ভেসে উঠেছে নাবিলার ছবি, অহমিকা, আত্মপ্রত্যয় আর সুমিষ্ট কথামালা। একটি দোষ ছাড়া আর কোন দোষ নাবিলার মধ্যে নেই, যা উতওয়াকে ভীষণভাবে ব্যথিত করে তোলে। সে দোষটা হচ্ছে, নাবিলা আদৌ আদেশের অনুগত নয়। তবু

শান্তনা এই যে, নাবিলা অজ্ঞ। তার মর্যাদা সম্পর্কে সে অবহিত নয়। এতে আর কি আসে যায়? পরে তো জেনে যাবে।

দু'জন সৈনিক মাহমুদকে বহন করে নিয়ে এলো এবং অতি অবজ্ঞাভরে তার দেহ বালুর উপর ধপ করে ফেলে দিলো। উতওয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মাহমুদের দিকে তাকালো, তারপর গুরু গম্ভীর স্বরে ডাকলো—মাহমুদ!

অতি কষ্টে মাহমুদ চোখ মেললো। উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টিতে এমন ভাবে তাকাতে লাগলো যেন সাতার কাটছে সে। কোন কিছুর প্রতিই মনোযোগ নেই তার। জীবন ও মৃত্যু সবই তার কাছে সমান। সে সব কিছুই আল্লাহর কাছে সপে দিয়েছে। তার মনে হচ্ছে চারপাশের সৈনিক ও অফিসাররা যেন কিশোরের দল, তাকে নিয়ে কেবল খেলছে। অথবা মাতাল হয়ে একটা অভিনয় মঞ্চে ঘুরপাক খাছে। নব দম্পতির বাসর শয্যা নামক রঙ্গমঞ্চটির কথা তার মনে হলো। মনে হলো সেখানে অনেকগুলি রশি যেন উপর থেকে ঝুলে পড়েছে এবং তা উতওয়ার মাথা, মুখের দুপাশ ও দুচোখ ছুয়ে যাচ্ছে। সমস্ত আকাশই এখন তার কাছে অনেকগুলি ঝুলন্ত রশি ছাড়া আর কিছুই নয়। সে যেন একটি রক্ত রঞ্জিত পাপ পংকিল কালো হাত দেখতে পাচ্ছে, সে হাতে রয়েছে অসংখ্য ধারাল নখর। একত্রিত করে ধরে এ রশিগুলি হাতটি শয়তানী কায়দায় সঞ্চালিত হচ্ছে। আর সেই সাথে রশি, অভিনেতা এবং তাদের কল্পিত নব দম্পতিও সঞ্চালিত হচ্ছে। তার পর মঞ্চ থেকে এক ধরণের আওয়াজ হতে থাকে। যেন কোন কিছু নড়াচড়া করছে, সেখানে অনেকগুলি কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে। মাহমুদ একটু খানি মুচকি হেসে কিছু বলার চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না। উতওয়া আবার চিৎকার করে বললো—মাহমুদ, কথা বল শয়তান!

মাহমুদ তবুও মুখ খুলতে সক্ষম হলো না। বরং চোখ বন্ধ করে পড়ে রইলো। গতরাতে ঘুমের মধ্যে মাকে দেখেছে মাহমুদ। একটি পরিস্কার ঝক-ঝকে চামচ দিয়ে মাহমুদকে খাইয়ে দিচ্ছেন তিনি। তার হাতে রয়েছে মধু ও মাখন মেশানো হালুয়া ভর্তি একখানা সাদা বর্তন। মাহমুদ পরিতৃপ্ত হয়েছে। 'আমি কসম করে বলছি, আমার পেট ভরে গেছে, সামান্য পরি-মাণ খাবার ইচ্ছাও এখন অনুভব করছি না। হ্যাঁ, আমার প্রিয়তমা আমাল এসে গেছে। পরিচিত ও মার্জিত সাদা পোশাক পড়েছে সে। তার মুখ ও হাত ছাড়া আর কোন অঙ্গই দেখতে পাচ্ছি না আমি। তার মুখমণ্ডল যেন ফেরেস্তার মত। তার আঁখি দু'টি প্রীতি ও ভালবাসা বর্ষণ করছে। ফলে আমার শুষ্ক হৃদয়ও কোমল হয়ে পড়েছে। তার নরম হাত আমার মুণ্ডিত মস্তকের ওপর রাখলেই আমি একটু হেসে দিলাম আর সে কেঁদে দিল। আমি যেন আমার শরীরের প্রতিটি শিরা উপশিরায় প্রাণ

স্পন্দন অনুভব করলাম। তাকে বললাম কে তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে।
সে বললো—ভালোবাসা।

—কিভাবে এখন তুমি বের হবে?

সে বললো—যে ভাবে প্রবেশ করেছি।

'আমাল' সারারাতই আমার পাশে কাটিয়েছে। যেন ফেরেশতারা আমাদের গান শুনিয়েছে। অত্যন্ত মিষ্টি মধুর সে গান যেন শুভ্র মেঘমালা সমবেত সংগীতের সুরধ্বনি বয়ে নিয়ে এসেছিল। আমি তাকে বললাম—আমাল! নবী (স) আমাকে দেখতে এসেছিলেন।

আমালের চেহারা খুশীতে ঝলমল করে উঠেছিল—ইস! যদি আমি তোমার সাথে থাকতাম তাহলে কতই না ভাল হতো!

ক্ষনিকের জন্যে আমরা যেন আমাদের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেললাম, তারপর আমার সম্বিত ফিরে পেলাম।

আমি বললাম—ইয়া রসুলুল্লাহ! আমরা তো শয়তানের যুগে বাস করছি।

তিনি আমাকে বললেন—প্রতিটি কাল ও স্থানেই শয়তান রয়েছে।

আমি বললাম—ইয়া রসুলুল্লাহ! বিভিন্ন পথ ও বিভিন্ন চিন্তা এমন ভাবে মিশে গেছে যে আমরা সত্য মিথ্যা নির্ণয়ে অক্ষম হয়ে পড়েছি।

উত্তরে তিনি বললেন 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে এসেছি, যদি তা শক্ত ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকো তাহলে আমার পরে আর কখনো তোমরা বিপথে যাবে না। জিনিস দু'টি হলো, আল্লার কিতাব এবং আমার সুন্নাত। আর সঠিক পথ তো তোমার জানা আছে, মাহমুদ!

আমি তার মুখ দিয়ে 'মাহমুদ' শব্দটি উচ্চারণ করতে শুনলাম। আমার শরীর শিউরে উঠল। আমাল! রসুল নিজেই নামটি উচ্চারণ করেছেন। আমার রসুল আমাকে চেনেন। আমার দৃষ্টিতে এখন পৃথিবীর সকল অত্যাচারী অতি তুচ্ছ। আণবিক বোমাও এখন শিশুদের খেলনার মত। রসুল (স) কে আমি বললাম—আমার প্রিয় বন্ধু! আমাকে আপনার সঙ্গে নিন।

তিনি এমন একটি মুচকি হাসি দিলেন যা ধরাপৃষ্ঠে আর কখনো দেখিনি। উত্তর দিলেন—এখন নয়।

আমি দেখলাম, আলী ইবনে আবু তালেব আমাদের দিকে এগিয়ে এসে বলছেন—আফসোস! পথের অতি সামান্য, দীর্ঘ ভ্রমণ অথচ বিপদ সঙ্কুল পথ। আমাল! আমি কিন্তু বুঝতে পারলাম এবং একটু মুচকি হাসলাম। আসলে আমি জগতের সর্বাধিক সৌভাগ্যবান ব্যক্তি। এরপর রসূল (স) চলে গেলেন। আর আমি একাকী পড়ে রইলাম। তার চলে যাওয়ায় যদিও ব্যথিত হয়ে পড়েছিলাম, তা সত্বেও আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি। এ সৌভাগ্য বড় অভিনব ধরনের।

আমাল বললো—আফসোস! যদি তোমার সাথে থাকতাম!

আমি তাকে বললাম—প্রিয়তমা! সর্বক্ষণ তুমিতো আমার সঙ্গেই আছ।

মাহমুদকে বুটের তলায় পিষতে পিষতে উতওয়া আবার চিৎকার করে উঠলো—মাহমুদ! কথা বল। তোর এরূপ আচরণের অর্থ আমি বুঝি। তোর মত অনেকের অভিজ্ঞতা আমার আছে। উতওয়া মাহমুদকে তার মিষ্টি মধুর স্বপ্ন থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার সুন্দর জগতটাকে ধ্বংস করে দিলো। মাহমুদ দ্বিতীয়বার চোখ মেললো। সে এবারো নব দম্পতির বাসর শয্যা, আন্দোলিত রশি এবং রক্তে রঞ্জিত কালো হাত দেখার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু এবার সে সাদা চশমা চোখে একজন ডাক্তারকে তার পাশে দেখতে পেলো, তবে এ ছিল অন্য একজন নতুন ডাক্তার। তার মাথায় অনেকগুলি রশি পেঁচানো ছিল। যা হোক ডাক্তার বললো—উতওয়া বেগ! আমি আপনাকে বলেছি, তাকে হাসপাতালে স্থানান্তর করা একান্ত প্রয়োজন।

—ডাক্তার সাহেব! বিড়ালের মত এদের সাতটা জীবন।

—উতওয়া বেগ! এ তো দু'দিন যাবত কোন কিছু খায়নি বা পানও করেনি। এসব ক্ষত তার শরীরে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। তার মৃত্যু হলে আপনাদের কোন উপকার হবে না। আমি বুঝি না, এত ব্যস্ততা কেন? যদি সে বাঁচে তাহলে সপ্তাহকালের মধ্যেই সে ভালো হয়ে যাবে। তখন আবার তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আনা যাবে। সে মানসিক ও শারীরিক উভয়দিক দিয়ে ভেঙ্গে পড়েছে। উতওয়া বেগ! আমাকে একটু বুঝান তো, শক্তি প্রয়োগে সব কিছু পাওয়া যায় নাকি?

—তার স্ত্রীর সাথে মিলনের জন্য নিয়ে যাও তাকে। হাসপাতাল—সিত্তিন হাসপাতাল———যত্তোসব। ক্রোধান্ধ উতওয়া বকতে বকতে চলে গেল।

মানবতার কসাইখানার রক্তাক্ত প্রাঙ্গনে উতওয়া ফিরে এলো। সেখানে সে বাদামী রংয়ের একজন সুদানী যুবককে দেখতে পেলো, উতওয়া তার দিকে এগিয়ে গিয়ে বললো—তুমি কি রিযক ইব্রাহীম?

—হাঁ! জনাব আফেন্দী।

—আমি তোমার বাব্যকে চিনি। তার ওপর অভিশাপ! সে ছিল একজন বড় পুলিশ অফিসার। অত্যন্ত কুৎসিত, অভদ্র ও ছোট লোক।

বিনয়ের সাথে 'রিযক' বললো—মৃতদের গুণাবলীর কথাই স্মরণ করুন, আফেন্দী! আমার বাবা ছিলেন মিসর—সুদান ঐক্যের আহ্বায়কদের অন্যতম। মিসরের গৌরব এবং জাতীয় শহীদদের গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়েছে।

দাঁতে দাঁত পিষে উতওয়া তার কাছে এগিয়ে গেল। তারপর তার পিঠে সজোরে একটা থাপ্পর মেরে রাগে বিড় বিড় করে বললো—ছোটলোক! আমাকে আদব শিখাচ্ছো? লাগাও একে পঞ্চাশটি চাবুক।

মুহূর্তে চতুর্দিকে থেকে অগনিত কোড়ার আঘাতে রিযক ইবরাহীমের ওপর বর্ষিত হতে থাকলো। কিছুক্ষণ পর উতওয়া হাত উঠিয়ে বললো—থাম, যথেষ্ট হয়েছে।

এরপর তদন্তকারী অফিসারকে লক্ষ্য করে বললো—এ কুত্তাটি কি স্বীকার করেছে?

—হ্যাঁ আফেন্দী!

অশ্রুসিক্ত নয়নে 'রিযক' বলে উঠলো—ব্যাপারটি হলো, আমার কাছে জেলে বন্দীদের পরিবারবর্গের জন্যে সিকি গিনি সাহায্য চেয়েছিল। আমি এককালীন দান হিসেবে তা দিয়েছি।

—তাই! তুমি কেবল 'ইখওয়ানী' বন্দীদের পরিবারবর্গের জন্যেই সাহায্য করো কেন?

—যারা সাহায্য পাবার উপযুক্ত, আমি আমার সামর্থ অনুযায়ী তাদের প্রত্যেককে দান করে থাকি।

—কিন্তু তুমিও তো ঐ দলের একজন সদস্য ছিলে।

—জী হ্যাঁ!

উতওয়া হা-হা করে হেসে উঠে তদন্তকারী অফিসারকে নির্দেশ দিলো—একে গোপন সশস্ত্র দলের তালিকাভুক্ত করে তাদের সাথে মিলিয়ে নাও।

—অবশ্যই, জনাব আফেন্দী!

রিযক ইবরাহীম চিৎকার করে উঠলো—এটা ভয়ংকর জুলুম।

আবারও উতওয়া তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললো—সশস্ত্র দলের সাথে তুমি থাক বা না থাক, তাতে কিছু যায় আসে না। তুমি যে 'ইখওয়ানুল মুসলিমীনের' লোক এটাই হলো বড় কথা।

—ইখওয়ানের লোক হওয়া কি অপরাধ?

—এখনো তা জান না?

—বিপ্লবীদের অনেক উচ্চপর্যায়ের ব্যক্তিবর্গও তো আমাদের সদস্য ছিলেন।

অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের সাথে উতওয়া তার দিকে চেয়ে বলে উঠলো—তোমাদের সাথে? তুমি হাসালে দেখছি।

—তাদের অনেকেই তো ফিলিস্তীনের যুদ্ধে—আমাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছেন। প্রেসিডেন্ট নিজেও তো ইমাম হাসান আল-বান্নার মৃত্যু দিবসে তার কবরের পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং তার মহান কার্যাবলী ও সংগঠনের প্রশংসা করেছেন।

অতি সুক্ষ্মভাবে তার দিকে চেয়ে সে বললো—বুঝলাম, ফিলিস্তীনের যুদ্ধে তুমি একজন স্বেচ্ছাসেবক ছিলে।

—এটা আমার গর্ব। আমি আমার কর্তব্য পালন করেছি।

প্রফুল্লভাবে উতওয়া বললো—ভালো কথা, এটা দ্বিতীয় স্বীকৃতি।

তোমাদের দফতরে লিখে নাও, তার চেহারার ন্যায় তার অতীতও সম্পূর্ণ কালো। একে ঝোলানো উচিত।

তদন্তকারী অফিসার উতওয়ার কথার জের টেনে বললো—উতওয়া বেগ! আমাদের নিকট সর্বশেষ যে রিপোর্ট এসেছে তা কিন্তু ভুলে যাবেন না। এতে বলা হয়েছে মিসর থেকে সুদানকে বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের চেষ্টা চলছে।

—এর জন্য দায়ী আপনারাই।

রিযক ইবরাহীম চিৎকার করে বললো—'এ রকম? না, সুদানী মাতার সন্তান, প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট মুহাম্মদ নজিবকে বিতাড়িত করার কারণে তোদের গাত্রদাহ শুরু হয়েছে?

—ওরে কুত্তার বাচ্চা! আরো পঞ্চাশ ঘা বেত তোর পাওনা হলো।

রিযক ইবরাহীমের নগ্ন, কৃষকায়, দুর্বল শরীরে আবারো চাবুকের আঘাত পড়তে থাকলো। উতওয়া তাকে পিছনে রেখে বন্দী আসামীদের মাঝে পায়চারী করতে লাগলো। আসামীদের সকলেরই পায়ের পাতা ও নলী চাবুকের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত করা হয়েছে। উতওয়া পায়চারী করতে করতে একটি যুবককে চিৎকার করে দয়া ও অনুগ্রহের আবেদন করছে শুনতে পেলো। যুবকটির ভাষা ও বলার ভঙ্গীতে সে বুঝতে পারলো, সে মিসরী নয়! বরং অন্য কোন দেশের হবে। সে নিকটে এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলো—তোমার নাম কি, বন্ধু?

—আবদুল হামীদ নাজ্জার, জনাব আফেন্দী!

—কোন এলাকার অধিবাসী?

—ফিলিস্তীনের।

—তুমি কি ইখওয়ানের লোক? তোমাদের এ বিপদ কি যথেষ্ট নয়?

—ফিলিস্তীনের যুদ্ধে আমি তাদের সাথে অংশ নিয়েছিলাম। আপনারা যখন ফালুজায় শত্রু পরিবেষ্টিত অবস্থায় ছিলেন, আমরা তখন আপনাদের গোপনে গোলাবারুদ ও রসদপত্র সরবরাহ করেছিলাম। আপনাদের জন্য আমাদের অনেক লোকই শহীদ হয়েছিল সেদিন।

উতওয়া একটু মাথা নাড়লো। শত্রু বেষ্টিত সেই কালো দিনগুলির কথা সে স্মরণ করতে লাগলো। সে স্মরণ করতে লাগলো সেই ক্ষুধা ভয় ভীতি, অশ্রু বিসর্জনের কালো রাতগুলিকে। সেই দিনগুলিতে সব জিনি-সের প্রতি, সকল প্রকার আদর্শ, মূলনীতি, শ্লোগান ও নেতৃত্বের প্রতি তার একটা অনীহা ও বিতৃষ্ণার সৃষ্টি হয়। বেষ্টনীর বাইরে পৃথিবীর সকল দেশের সব মানুষ যারা জীবনকে উপভোগ করছে, তাদের প্রতি তার চরম ঘৃণা সৃষ্টি হয়। সেই দিনগুলিতে মদ, নারী, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি থেকে সে বঞ্চিত হয়ে জরাগ্রস্থ, হাড়গিলে, হাড্ডিচোষা ও খুটে খাওয়া নেকড়ের মত হয়ে গিয়েছিল। সে দিন সে পণ করেছিল, এখান থেকে মুক্তি পেলে নিজের জন্যে—কেবল-

মাত্র নিজের জন্য বেঁচে থাকবে। সবই জাহান্নামে যাক—আদর্শ—মূলনীতি—ইতিহাস—ইসলাম……। উতওয়ার বিশ্বাস জন্মেছে জীবনের আরাম আয়েশ পূর্ণরূপে উপভোগ করা এবং নিজ অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্যেই মানুষের সৃষ্টি। কামনা-বাসনা চরিতার্থের জন্যে সব কিছু করা বৈধ। ফালুজার ঘটনা তাকে শিখিয়েছে রক্ত দান বৃথা, বীরত্ব একটা ফাকা বুলি ও ভ্রাতৃত্ব একটা ধোকাবাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। বিজয়ের দ্বারা ব্যক্তিগত ভাবে সে নিজে কিছুই লাভবান হবে না। তার লালসা যে পূরণ করতে পারবে তার দাস হওয়া বরং ভালো। তা সে চুরি, হত্যা বা অঙ্গীকারই ভঙ্গ করুক না কেন। উতওয়া কি ভুলে গেছে সে দিনটির কথা? যুদ্ধের সময় একদিন সে একটি গ্রাম্য যুবতীকে জোরপূর্বক ধরে আনার চেষ্টা করেছিল। এমতাবস্থায় কমাণ্ডার তাকে বন্দী ও বেত্রাঘাত করে। নির্বোধ কমাণ্ডার সেদিন তাকে চরিত্র, নৈতিকতা, মহত্ব ও খোদাভীতির কথা শুনিয়েছিল আর বলেছিল, ধর্ষণ এমন এক মহা অপরাধ যা ক্ষমার অযোগ্য। সেই কৃষ্ণ দিনগুলির কথা স্মরণ করলে এখনো ভীষণ হাসি পায় তার। সে দিনটির কথা কি সে ভুলতে পারে যে দিনটিতে তার পৌরুষকে ম্লান করে দেয় এমন নৈতিক অনাচারের অভিযোগ তার বিরুদ্ধে আনা হয়েছিল। এটা এমন একটি ব্যাপার যা তাকে ভীষণ কষ্ট দেয়। উতওয়া তার স্মৃতির জগত থেকে সম্বিত ফিরে পেয়ে তাকিয়ে বললো—আবদুল হামীদ! তাহলে তুমি সেচ্ছাসেবক ছিলে?

—হ্যা, জনাব আফেন্দী!

—এটাই তোমার দোষী হবার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

—নেকড়ের মুখের আহার হিসেবে আমার দেশকে ছেড়ে দেব, এটাই কি উচিত ছিল? তাহলে আমি কি মুসলিম বলে দাবী করতে পারি?

—যে ভাবে ইচ্ছা তুমি তোমার দেশকে রক্ষার চেষ্টা করতে পার। তবে ইখওয়ানুল মুসলিমীনের সদস্য হওয়া এটাতো অন্য কথা।

—কি ভাবে জনাব?

—আবদুল হামীদ! আমি জানি তোমাদের দাওয়াত জাতীয়তা তথা সব কিছুর উর্ধে। এ কারণে আমি বিশ্বাস করি এর উদ্দেশ্য প্যালেষ্টাইনের স্বাধীনতা নয়, বরং এর উদ্দেশ্য কিছু জঙ্গী ক্যাডারদের প্রশিক্ষণ দেয়া যারা যুদ্ধ করে সমগ্র আরব বিশ্বকে ইখওয়ানী শাসনের অধীনে এনে দেবে।

আবদুল হামীদ কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললো—আমরাতো আল্লার রাস্তায় যুদ্ধ করছি। আমাদের মস্তিস্কে এসব ট্যাকটিকস নেই।

—তুমি ট্যাকটিকস শব্দটিও জান তাহলে!

তারপর উতওয়া তদন্তকারী অফিসারকে লক্ষ্য করে বললো—আমি তোমাকে কি বলিনি যে সে এদের সাথে আপাদমস্তক জড়িত এবং প্রাক্তনদের একজন ?

—হ্যাঁ, জনাব আফেন্দী—তদন্তকারী অফিসার উত্তর দিলো।

আবদুল হামীদ কিছুটা থেমে থেমে বললো—ব্যাপারটি তো একটি উত্তম জীবন ও অধিকতর ন্যায় বিচারের দিকে দাওয়াত ছাড়া আর কিছু নয়।

উতওয়া হো হো করে হেসে উঠে বললো—এর থেকেও অধিক ন্যায় বিচার তুমি আশা কর ? একে পঞ্চাশ ঘা বেত মার। কোড়ার আঘাত তার শরীরে পড়ছে আর সে চীৎকার করে বলছে—হুজুর ! আমার অপরাধ কি ?

উতওয়া তাকে পিছনে রেখে সামরিক কারাগারের প্রাংগনে পায়চারী করতে লাগলো। বাশগাবিশ উচ্চ কর্কশ স্বরে এখানে সেখানে কয়েদীদের গ্রেফতারের কারণ বিতরণ করে বেড়াচ্ছে। মাঝে মাঝে সে তার দীর্ঘ কোড়াটি চক্রাকারে মাথার ওপর ঘুরিয়ে নগ্নদেহ কোন কয়েদীর পিঠে সজোরে আঘাত করছে। আবদুল মাকসুদ, আবদুল জাওয়াদ ও অন্যান্য সৈনিকরা সদম্ভে ঘোরাফেরা করছে। উতওয়া বেগের প্রতি তাদের নিষ্ঠা ও ভালবাসার প্রমাণ অবশ্যই দেখাতে হবে। আর দেখাবেই বা না কেন ? তিনি তো তাদের অতিরিক্ত ইনক্রিমেণ্ট এবং সময় অসময়ে দু'একটা বর্ধিত 'এলাউন্স'ও দিয়ে থাকেন। উতওয়া একজন কয়েদীর সামনে গিয়ে থামলো। অভিযুক্তদের তারা যে তথাকথিত 'বাসর শয্যার' শূলীতে চড়িয়ে থাকে, তাকে তার একটি কাঠের সাথে বাঁধা হয়েছে। উতওয়া তার দিকে একটু ঝুকে পড়ে বললো—বেগ সাহেবের সাথে আমি একটু পরিচিত হতে চাই।

—জনাব আফেন্দী ! আমি মজলুম—অত্যাচারিত ! আমি আল্লার… …

—ওরে বর্কারর বাচ্চা ! অস্ত্র কোথায় ? আমি তোমাকে চিনি—'জিযা' থেকে।

—অস্ত্র তো আমার কাছে আমানত স্বরূপ ছিল। তাতো আসল মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছি।

—মালিক আবার কে ?

—আমি কথা বলতে পারছি না।

—এখনই আমি তোমাকে কথা বলাচ্ছি।

চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী উতওয়া জ্বলন্ত সিগারেট সহ তার হাতটি বাড়িয়ে দিলো এবং তা উক্ত কয়েদীর বাম চোখের নীচে ঠেসে ধরে বলতে লাগলো—তোমার জন্যে আমার বিরাট ক্ষতি—এর অর্ধেকও এখন পর্যন্ত পান করিনি।

—এখনই আমি কথা বলছি।

—বল, জানোয়ার !

—অস্ত্র তো প্রেসিডেন্টেরই।

—ওরে বাঁদির বাচ্চা। এ মহান নামটি তোর অপবিত্র জিহ্বা দিয়ে উচ্চারণ করবি না।

—এটাই সত্যি কথা। তারা আমাকে আমানত স্বরূপ দিয়েছিলেন—আমি অস্ত্রাগারে রেখেছিলাম, তিনি যখন চাইলেন তখন ফেরত দিলাম। সে অনেক দিনের কথা।

—তারা কিছু অংশ তোমার কাছে রেখে দিয়েছিল।

—মিথ্যে কথা, তাকে জিজ্ঞেস করুন।

—কাকে জিজ্ঞেস করবো?

—প্রেসিডেন্টকে।

—আবার? বেশ, ভালো কথা।

এরপর সে সৈনিকদের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললো—পঞ্চাশ চাবুক—এরপরও যদি ভদ্রভাবে কথা বলতে না শেখে তা হলে আরো পঞ্চাশটি।

একথা বলে উতওয়া তার অফিসের দিকে চলে গেল। এর মধ্যে মাই-ক্রোফোনে 'ইয়া জামাল ইয়া মিসালাল ওয়া তানিয়্যাহ' (অর্থাৎ হে জামাল আবদুন নাসের! তুমি স্বদেশের প্রতীক) গানটির আওয়াজ ভেসে উঠলো। উতওয়া চিৎকার করে বলে উঠলো—সমগ্র কারাগারটি যেন উম্মে কুলসুমের সাথে কোরাস গাইছে।

এখানে সেখানে চাবুকধারী সৈনিকরা বন্দী অভিযুক্তদের মাঝে ঘোরাফেরা করছে, আর চাবুকের আঘাত তাদের পিঠে আগুনের ফুলকী ঝরাচ্ছে। তাদের সেই বিখ্যাত গানটি গাইবার জন্যে তাড়া দিচ্ছে। অশ্রু আর গানের সাথে আহাজারী মিশ্রিত হয়ে এক হৃদয়বিদারক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। অল্পক্ষণ পরেই মাইক্রোফোন বন্ধ হয়ে গেল।

উতওয়া আবার চিৎকার করে বলে উঠলো—ওরে জানোয়ারের দল! গাইতে থাক! গাইতে থাক!

বন্দীদের কণ্ঠে বার বার সেই দেশাত্মবোধক গানটি ধ্বনিত হয়ে উঠতে থাকলো। তাদের সে গান ক্রন্দন ও শোক গাথার মধ্যে কোন প্রভেদ ছিল না। আর দেয়ালে টাংগানো প্রেসিডেন্টের ছবিটি যেন হেসে হাত নেড়ে এ দৃশ্য অবলোকন করছিলো।

উতওয়া জোরে হো হো করে হেসে বলে উঠলো—জানোয়ারের দল, ভালো করে আর্ট শিখে নাও।

৫

উতওয়া ফিরে এলো তার অভিজাত বাসগৃহে। সেখানে অসংখ্য ফুল থাকা সত্বেও সে যেন তাতে কোন ঘ্রাণ অনুভব করলো না। তাছাড়া হল-ঘর ও কক্ষগুলোর জৌলুস বাড়িয়ে দেবার এমন উপমাহীন সাজ-সজ্জা তাতেও যেন সে কোন অর্থ খুঁজে পায় না। তার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—বার, খাবার ও ঘুমাবার কক্ষগুলো। প্রতিভাধর শিল্পীদের অংকিত চিত্রের অনেকগুলো বোর্ড সেখানে ঝুলানো রয়েছে। সেগুলোকে গভীর-ভাবে নিরীক্ষণ করে তার ভাব ও প্রতীক উদ্ধারের কথা কিন্তু একটিবারও সে চিন্তা করেনি। আসলে প্রেসিডেন্টের বড় আকারের ঝুলানো ছবিটি ছাড়া আর কোথাও যেন তার দৃষ্টি পড়তে চায় না। প্রেসিডেন্টের নীচেই রয়েছে তার নিজের ছবিটি। এ ভাবেই ছবি দু'টি রাখার জন্যে সে খুব লালায়িত ছিল।

একটি শূন্য কামরায় সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো অন্য একটি ক্ষুদ্র ছবিও রয়েছে। হ্যাঁ, এটাই নাবিলার ছবি। এই মূহুর্তে উতওয়া একপ্রকার মারাত্মক শূন্যতা অনুভব করলো। আবার সামরিক কারাগারে ফিরে যাবে কি না, তা চিন্তা করলো। সেখানে সে কোন রকমের শূন্যতা অনুভব করে না। বরং বিভিন্ন ধরনের কাজ ও পর্যালোচনায় সব সময় ডুবে থাকে, যেমন বিভিন্ন ঘটনার সৃষ্টি, মানুষের পরিণামের ফিরিস্তি তৈরী, আর তাদের জীবন ও মরণের ব্যাপারে তার অহংকারী ভূমিকা। চূড়ান্ত আদেশ ও নির্দেশের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির কামনা যেন সীমাহীন। সেই একটি দিনের কথা কি সে কোন দিন ভুলতে পারবে? যে দিন সামরিক কারাগারের চত্বরে দাঁড়িয়ে 'ইখওয়ানের মুরশিদে আম' 'হুদাইবীকে' তার সামনে সেনাবাহিনীর কমা-ণ্ডারের মত দাঁড়িয়ে থাকার নির্দেশ দিয়েছিল। আর হুদাইবীর সামনে দিয়েই অন্য সব বন্দীদের তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। তাদের সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছিল—'ইয়া জামাল-ইয়া মিসালাল অতানিয়্যাহ' (হে জামাল আবদুন নাসের! তুমিই জাতীয়তার প্রতীক) গানটি! হ্যাঁ, মুর্শিদ-ই আম প্রথমত এ ভাবে দাঁড়াতে অস্বীকার করেছিলো। কিন্তু উতওয়া তার সাথীদের উপর প্রতিশোধ নেবার হুমকি দিয়েছিলো। শুধু হুমকিই নয়, বরং তাদের উপর বেত্রাঘাতও করা হয়েছিলো। অবশেষে ঐ লোকটি বাধ্য হয়ে কমাণ্ডারের ভূমিকায় অভিনয় করতে রাজী হয়েছিলো যাতে তার প্রিয়-বন্ধুরা শাস্তি থেকে বেঁচে যায়। এ ছিল সেই মুর্শিদে আম, যার একটি বাক্যে লক্ষ লক্ষ

মানুষ আন্দোলিত হয়। আর আজ উতওয়া তাকে তার একটি চাবুক দ্বারা আন্দোলিত করেছে। হ্যাঁ— প্রতিটি বস্তুর ক্ষেত্রে শক্তিই হলো শেষ কথা। ওরে সে সব হতভাগার দল! যারা নিজেদেরকে এবং অন্যদেরকেও তর্ক-বিতর্ক ও অর্থহীন বাক-বিতণ্ডায় নিমগ্ন রাখে। তাদের জেনে রাখা উচিত আদেশ কার্যকরী করার জন্যে একটি মাত্র গুলিই যথেষ্ট। একটি গুলিই শান্তি ও স্থিতি ফিরিয়ে আনতে পারে। চিন্তাশীল ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরাই আসলে পৃথিবীতে একটি মুসিবত। এ ধরণের মতবাদেই উতওয়া বিশ্বাসী। তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাকে এর প্রতি নিষ্ঠাবান করে তুলেছে। একদিন সে যখন একজন কৃষক কে মেরে রক্তাক্ত করে দিয়েছিল, সে দিন তার আলেম পিতা তাকে বলে ছিলেন—

আমার প্রিয় সন্তান! আল্লাহকে ভয় করো, তুমি কি শেষ বিচারের দিনকে ভয় করো না? সে দিন উতওয়া ছিলো একটি যুবক এবং সামরিক কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র। সে তার পিতার জীবন-যাপন পদ্ধতির প্রতি ব্যঙ্গবিদ্রুপ ও তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকাতো। উতওয়া তার পিতার কথার প্রতিবাদ করে বলেছিলো—আপনি কি দেখেন নি সে ঘোড়ায় চড়েই আমার পাশ দিয়ে চলে গেল?

—আমার স্নেহের ছেলে! তাতে হয়েছে কি?

—আমার সম্মানে ঘোড়া থেকে নেমে যাওয়া তার উচিত ছিলো। সে কি জানে না আমি কে?

—উতওয়া! তুমি আল্লার বান্দাদেরই একজন, আর সেও তাই।

—আমি কারো বান্দা নই—ক্রোধান্বিত কণ্ঠে উতওয়া প্রতিবাদ করলো।

—ওরে বোকা! আল্লার কাছে শিগগির ক্ষমা চা, অন্যথায় তারই আগুনে তোকে আমি পুড়িয়ে মারবো।

বাড়ীর দরজার দিকে পিছন ফিরে যেতে যেতে রাগে গজ গজ করে সে বলতে থাকলো—এসব ছোট লোক কৃষকদের ক্ষমা করা মস্ত বড় অপরাধ এরা ডাণ্ডা ও চাবুক ছাড়া শুনতে পায় না, অবাধ্যতা দুর হয় না।

তার পিতা চিৎকার করে উঠলেন (সে সময় তার সাদা দাড়ি আন্দোলিত হচ্ছিল)—দুর হয়ে যা! তোর উপর আল্লার লা'নত।

উতওয়ার সেই অতীত দিনগুলোর কথা মনে পড়ে গেল আজ। সব সময় সে তার বাবা, মেডিকেলের ছাত্র তার বড় ভাই এবং অন্যান্য লোকদের থেকেও একথাগুলি শুনে থাকতো—মানুষের সন্তুষ্টি ও স্নেহ লাভের সর্বোত্তম পন্থা হলো 'ভালোবাসা।' একথাটির মধ্যে যে কোন সত্য নিহিত নেই, বরং এটি অসারতায় পরিপূর্ণতা উতওয়া দেখতে পেয়েছে। কারণ অর্থের দ্বারা সকলকে বাধ্য করা যায়। এখন তার দৃষ্টিতে অর্থসম্পদ ও শক্তি যেন দু'টি খোদা, আল্লার পরিবর্তে তারাই ইবাদত লাভের যোগ্য।

উতওয়া তার পরিবারের লোকজন ও আত্মীয়-স্বজন থেকে বহুদূর দীর্ঘদিন একাকী অবস্থান করে লেখা-পড়া করেছে। লাগামহীন ঘোড়ার ন্যায় এ সময় সে নিজেকে স্বাধীন করে দিয়েছে। চরিত্রহীন কতগুলি বন্ধুদের সাথে সে 'বার' ও চিত্ত বিনোদন কেন্দ্রে যাতায়াত করতো। আর এ সময়ই সে মদের পেয়ালা ও দেহ ব্যবসায়িনী বহু নারীর সাথে পরিচিত হয়েছে। প্রথম প্রথম এসব ব্যাপারে সে কিছুটা ইতস্তত করতো কিন্তু ধীরে ধীরে এ অভিনব জগতের দিকে অগ্রসর হয়ে গেল। অবশেষে সে এতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে পড়লো। এ কাজে অর্থের প্রয়োজন পড়লে ধার অথবা চুরি করতো। মদের পিপাসা বা নারীর আসক্তি অনুভব করলে নিম্ন মানের সস্তা মদ পান করে নীচ শ্রেণীর দেহব্যবসায়ী নারীর সাথে রাত্রি যাপন করতো। ক্ষুধা পেলে শিম বা এজাতীয় শব্জী দ্বারা তৈরী স্যাণ্ডউইচ গোগ্রাসে গিলতো অথবা পেট ভরে খাবার জন্যে বন্ধুদের বাড়ীতে হঠাৎ গিয়ে উপস্থিত হতো। দারোয়ান, ঝাড়ুদার বা বারের পরিচারিকা কারো কাছ থেকেই ধার করতে সে লজ্জাবোধ করতো না। যদিও তাকে টাকা দেয়ার ব্যাপারে তার পিতা কখনো কার্পণ্য করেননি। তিনি তাকে যুক্তিসঙ্গত পরিমাণই দিতেন।

১৯৪৮ সালে প্যালেষ্টাইন যুদ্ধের সময় সে এক নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করে। নির্যাতন, নিপীড়ন, রক্তের বন্যা, বন্ধু-বান্ধব আপনজনদের মৃত্যু, ভীতি, শংকা, রাত্রি, ক্ষুধা এবং দূর্বলতা, এ সবই সে দেখেছে। সে আরো দেখেছে ধ্বংসাত্মক মারণাস্ত্রের খেলা। দেখেছে যাদের হাতে রয়েছে রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন, শিল্পের চাবিকাঠি ও কর্তৃত্ব তাদের বিলাস ব্যাসন। দেখেছে হাজার হাজার মানুষকে জুয়ার আড্ডার দিকে ঠেলে দেয়ার দৃশ্য। এসব দেখেও সে অবস্থার পরিবর্তনের কোন চিন্তা উতওয়া করেনি। অথবা হতভাগ্যদের অবস্থার উন্নতি হয় এমন কোন নতুন জীবনের নীলনকশাও সে তৈরী করেনি। সে সব সময় ক্ষমতা ও প্রাচুর্যে উঁচুস্তরের লোকদের সমান হবারই আশা করেছে। এমন সময় সে কিছু লোকের কাছ থেকে পরিবর্তন ও সাফল্যের কিছু বিপ্লবী চিন্তা দর্শন শুনে দ্রুত তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। আসলে তার নিজের যেমন কোন গভীর চিন্তা নেই, তেমন নেই কোনো সৃজনী শক্তি ও প্রখর মেধা। তার প্রধান বৈশিষ্ট হলো, অন্ধ আনুগত্য, নেতৃবর্গের প্রতি বিনয় ও সম্ভ্রম এবং অত্যাচার ও কঠোরতার প্রতি অতি উৎসাহ যা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

একদিন সন্ধ্যায় তার এক বন্ধু তাকে বলেছিলো—উতওয়া! আমার আশংকা হয়, তোমার দুষ্কর্ম তোমাকে অধঃপতনে নিয়ে না যায়। ব্যঙ্গভরে হো হো করে হেসে সে উত্তর দিয়েছিলো—উতওয়া দাঁড়িয়েই থাকবে, পড়বে না।

এরপর এলো বিপ্লব, আর সেই বিপ্লবে সে বিশেষ ভূমিকাও পালন করলো। বিপ্লবের নেতারা তাদের অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট

ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলো। তারা তাকে যোগ্য স্থানেই বসিয়ে দিলো—যাতে সে জার্মান নাজীদের শ্রেষ্ঠ নেতা কম্যুনিষ্ট বিশ্বে অত্যাচার-নিপীড়নের কলাকৌশল এবং আন্তর্জাতিক গোয়েন্দাবৃত্তির অপকর্ম সম্পর্কে পড়া-লেখার সুযোগ পায়। অতি বিস্ময়কর ভাবে সে তাদের পন্থা-পদ্ধতি ও চিন্তা-ধারা বুঝার জন্যে এগিয়ে এলো। একদিন সে একজন উঁচু দায়িত্বশীল কর্ম-কর্তাকে বলেছিলো—সত্যিকথা বলতে কি, আমি এসব বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে বিশেষ উপকৃত হইনি। তারা সর্বদাই আমাকে বলেছে, তারা যা বলে থাকে তার থেকে প্রকৃতিগতভাবে আমি নাকি বেশী জানি। আমি সেই প্রথম থেকেই বিশ্বাস করে আসছি ভয়-ভীতি প্রদর্শন আর কিছু লোককে খতম করে অন্যদেরকে শিক্ষাদান ও অনুগত্য করার দর্শন প্রয়োগ করা ছাড়া যে কোন ধরনের রাজনৈতিক সফলতা স্থিতি লাভ করতে পারে না। আর পাঁচ মিলিয়ন লোক হত্যা করলে দেশের এমন কিছু ক্ষতি হবে না—বলতে গেলে এটা একটা অনুল্লেখযোগ্য সংখ্যা।

অতীতের যে কোন সময় অপেক্ষা আজ উতওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে, সে সর্বদাই হকের ওপর রয়েছে। আমার গর্বের জন্যে এটাই কি যথেষ্ট নয় যে, প্রতিটি স্থানেই আমার ছাত্র রয়েছে- শুধু মিশরেই নয়, বরং আরব বিশ্বের অনেক দেশেই—এ কথা বলতে বলতে সে একটি পূর্ণ পান-পাত্রে চুমুক দিলো।

কিন্তু নাবিলাতো এখনও আসছে না! প্রত্যাশিত সময়ের চেয়ে বড় বেশী দেরী করছে। সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো, উপস্থিত হবে। যারা প্রতি-শ্রুতি রক্ষা করে না তাদেরকে আমি ঘৃণা করি। যে আমাকে ধোকা দেবে তার জন্যে ধ্বংস! আমি তাকে পৃথিবী থেকে একেবারেই নিশ্চিহ্ন করে ফেলবো। আহ্! বিচার দিবস। আমার পিতাকে আল্লাহ্ ক্ষমা করুন! সত্যিই আপনি ক্ষমার যোগ্য। কেননা বইয়ের পৃষ্ঠার মাঝে, সহীহ ও জয়ীফ হাদীসের অনুসন্ধানে, তাফসীর সমূহের তুলনামূলক আলোচনায়, মানুষকে সৎকাজ ও দয়ার দিকে আহ্বান জানিয়ে এবং তালাক, বিয়ে-শাদী, স্ত্রীর ভরণ-পোষণ, কিসে অযু যায় ও যাকাত আদায়ের নিয়ম প্রভৃতি সমস্যা সম্পর্কে ফতুয়া দিয়েই আপনি আপনার জীবন অতিবাহিত করেছেন। এ কারণে জগতে নিজের জন্য এমন কোন সম্মানজনক স্থান রচনা করতে পারেননি। বরং আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে জীবন কাটিয়েছেন। সারা জীবনে মোক্ষম চূড়াটা চিনে যেতে পারেননি। মনে মনে ধারণা করেছেন, আপনার অন্তরে এমন এক পরিতৃপ্তি বিরাজমান, যদি তা রাজা-বাদশারা জেনে যায়, তাহলে আপনাকে তরবারী দিয়ে হত্যা করবে। আমার বাবা! সত্যিই অত্যন্ত মিসকীন! সেই পরিতৃপ্তিটা কি? আপনি বিচার দিবস সম্পর্কে বলতেন, সব সময় অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করতেন, অথচ যেমন উচিত ছিল—সেভাবে আপনি জীবন-যাপন করেননি। নিজ হাতে তৈরী

কারাগারে আপনি আপনার আত্মাকে বন্দী করে রেখেছিলেন, আর সর্বক্ষণ আওড়িয়েছেন—ইন্নাদদুনিয়া সিজনুল মু'মিন (দুনিয়াটা মু'মিনের জন্য কারাগার)। আর আমি কারাগারে বন্দী হতে ঘৃণা করি। হা-হা-হা। এখন ইখওয়ানুল মুসলিমুন আমার এ কারাগারে বন্দী, উপর ওয়ালার মর্জি মত তারা তাদের আকাঙ্খিত স্থানেই রয়েছে। যেমন তারা বলে থাকে, সে রকম তারা অন্তরে বিশ্বাসও করে। তারা বলে থাকে, এ দুনিয়া মু'মিনের কারাগার, সুতরাং আল্লার ইচ্ছার বাস্তবায়নের জন্যে তাদের কারাবাসই উচিত।

টেলিফোনের রিং বেজে উঠলো। উতওয়ার বুকের মধ্যে স্পন্দন শুরু হলো এমন ভাবে যেন থামতেই চায় না। টেলিফোনের ক্রিং ক্রিং আওয়াজ সে ভয় করে এ কথা ভেবে সে নিজেও অবাক হলো। অবশেষে উতওয়া অন্তরের তাগিদে ধীর গতিতে টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেলো এবং রিসিভারটা তুলে নিয়ে কোন প্রকার শিষ্টাচারের ভান না করেই বলে উঠলো—হ্যালো, এটা যুক্তিযুক্ত নয়, নাবিলা... ।

—এতটুকুতেই ভয় পেয়ে গ্যাছো ?

—প্রতীক্ষার অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করাবে, তা উচিত নয়। আমিতো ছোট্ট শিশুটি নই।

—আজ আমি তোমার কাছে যেতেই পারবো না।

—অসম্ভব, কেন, কি কারণে ?

—হিংস্র পশুর ন্যায় আমাকে শিকার করতে পার, অমনটি আশংকা করছি।

উচ্চস্বরে উতওয়া হেসে উঠলো। কিছুটা সন্তুষ্ট হয়েছে এমন ভাবে সে বললো—তুমি জানো, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

—ঠিক আছে, আমি তা হলে কোন প্রকাশ্য স্থানে তোমার প্রতীক্ষায় থাকি।

—এটা সম্ভব নয়।

—কেন ?

—আমি একজন পদস্থ ব্যক্তি, তুমি তা জান। বিশেষ পরিবেশ ও ব্যবস্থা ছাড়া সাধারণ কোন স্থানে আমি যেতে পারিনে।

—সে বিশেষ ব্যবস্থাটা কি ?

—দায়িত্বশীলদের উপস্থিতি, কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা, বিশেষ কোন নিরাপদ স্থান এ ছাড়া আরো অনেক কিছু।

—তুমি ভয় পাও, উতওয়া ?

—আমি তো ভয় পাই না, এসব হলো সতর্কমূলক নিরাপত্তা, গুরুত্বপুর্ণ ব্যক্তিদের এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

বিষন্ন কণ্ঠে নাবিলা বললো—তুমি আমাকে চিনতে পারনি। আমি একটু আনন্দ উপভোগ করতে চাই। পিড়ামিডের ধারে ঘুরে বেড়াতে, উট ও ঘোড়ায়

সোয়ার হতে অথবা চিড়িয়াখানায় বেড়াতে যেতে চাই। তোমার সঙ্গে তরমুজ ও সুদানী ফলখাব, নীলের তীরে কাযিনো হাম্মামে বসবো।

রাগত স্বরে উতওয়া বলতে লাগলো—এসব কেন, এতো নীচ শ্রেণীর লোকদের আচরণ। নাবিলা! আমরা তো নীচ শ্রেণীর নই। আমি এমন এক ব্যক্তি যার আছে একটি কেন্দ্র। তুমি কি এসব আজে-বাজে কাজ পরিত্যাগ করবে? ... — আমি যে স্তরে আছি সেখানে তোমার উঠে আসা উচিত। প্রিয়তমা! আমাকে একটু বোঝার চেষ্টা করো।

—তুমি যা বলছো তার কিছুই আমি বুঝলাম না। তোমার কথাগুলো আমায় গলাটিপে হত্যা করে ফেলবে যেন। তার অর্থ হলো, কোন প্রকার ভ্রমন নয়, সিনেমা নয়, নয় কোন আনন্দ ফুর্তি এটা কি কোন কথা হলো?

বিপ্লবী ভঙ্গীতে উতওয়া বলে চললো—খুব শিগগিরই আমাদের মাঝে বিশেষ এক সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হবে, আর এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তখন তো অভিজাত পরিবারগুলিতে আমরা বেড়াতে যাব। আমাদের জন্য সিনেমার বিশেষ শো দেখানো হবে, বিশেষ অনুষ্ঠানে মহিলা শিল্পীরা গান গেয়ে শোনাবে আমাদের, অনেক অনেক আনন্দ ফুর্তির সুযোগ পাব। তুমি খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছো প্রিয়া।

দুঃখের সাথে নাবিলা বললো—কিন্তু আমি তো ভালোবাসি সাধারণ মানুষকে, তাদের সাথে মেলামেশা করতে।

—তারা তো সব ছোট লোক। রাস্তা দিয়ে চলাচলকারিনী প্রতিটি নারীকে লক্ষ্য করেই তারা অশ্লীল গান গেয়ে তাদেরকে উত্যক্ত করে থাকে।

—তুমি কি তাদেরকে ঘৃণা করো, উতওয়া? তাদের সম্পর্ক তো হয়েছে নবীর (সঃ) সাথে।

—হ্যা, আমি তাদেরকে সহ্যই করতে পারিনে। ঢোক গিলে কিছুক্ষণ পরে সে বললো—তুমি কি আসবে না?

—আজতো পারছি না?

প্রত্যাখ্যান উতওয়াকে ভীষণ কষ্ট দিয়ে থাকে—ভদ্রভাবে, অক্ষমতা বা আনুগত্যের সুরে, যে কোন ভাবেই তা হোক না কেন। তার আদেশের অবাধ্যতা মস্তবড় অপরাধ। সে যেন ফেটে পড়তে চাইলো। টেলিফোনে উচ্চস্বরে চিৎকার করে উঠলো—আমার নির্দেশ, অবশ্যই হাজির হবে।

ফোনের রিসিভার তার কানে বেপরোয়া হাসির খিল খিল আওয়াজ বয়ে নিয়ে এলো, আর সে শুনতে পেল, নাবিলা বলছে, তুমি কি মনে করছো, আমি তোমার আজ্ঞাবহ অনুগত সৈনিক?

—আমি রসিকতা করছি না।

—আর আমি নিজের ওপর অত্যাচার করছি।

—বললাম তো আমি রসিকতা করছি না।

—শেষ করছি, ...বাবা অসছেন।

একথা বলে হাসতে হাসতে নাবিলা টেলিফোন ছেড়ে দিলো। রাগে উতওয়া রিসিভারের দিকে তাকালো, তারপর হ্যালো — হ্যালো নাবিলা বলে চিল্লাতে থাকলো। কারো কোন সাড়া না পেয়ে অবজ্ঞা ও রাগের সাথে রিসিভারটি টেলিফোনের ওপর নিক্ষেপ করলো। পিছন ফিরে দেখে 'উয়াইস' নির্বাক দাঁড়িয়ে। চীৎকার করে উতওয়া বলে উঠলো—পাঠার মতন দাঁড়িয়ে আছিস কেন? কোন প্রয়োজন তোকে এখানে ঠেলে এনেছে?

একটি মাত্র শব্দ ছাড়া উয়াইস আর কিছুই বললো না—দুপুরের খাবার।

—জানোয়ার কোথাকার! এখান থেকে দূর হয়ে যা। তুই কি একটা নির্বাক মূর্তি?

অত্যন্ত ধীর ও শান্ত গতিতে ওয়াইস চলে গেল, কোন প্রকার রাগ বা প্রতিক্রিয়ার লক্ষণ তার মধ্যে দেখা গেল না। উতওয়ার ন্যায় অনেককে সে দেখেছে। আমীর-উমরা এবং রাজা-উজিরদের বালাখানার খাদেম ছিল সে। এদের সবার চরিত্র এক—কারো কোন পরিবর্তন হয় না। এক জনের বাসগৃহ পূর্ববর্তীদের বাসগৃহেরই অনুরূপ। একের আচরণ অন্যের আচরণেরই অনুরূপ, বরং তার থেকেও জঘণ্য। যে সব ব্যক্তিকে ঢুকতে, বের হতে, খেতে, পান করতে এবং কথা বলতে দেখে থাকে তারা সকলেই যেন সেই একই পুরাতন রাজ্যের বাসিন্দা, আজকের দিনটি গতকালেরই মত। অবস্থার আরো অবনতি না ঘটলে তার মনে হয় আগামী কালেরও কোন পরিবর্তন হবে না। বিড় বিড় করে 'উয়াইস' বললো—তারা আল্লাহকে জানে না।

৬

উতওয়া বেগ আজ এক কঠিন সংকটের মুখোমুখি। তার জীবনে এমন সংকটের সম্মুখীন সে আর কোন দিন হয়নি। অন্যান্য রাজনৈতিক সমস্যা-বলী এ সংকটের তুলনায় প্রায় কিছুই নয়। যুদ্ধের দিনের সেই ঘেরাও, হত্যা, ক্ষুধা ও ভীতি যদি এ সংকটের সাথে তুলনা করা হয় তবে সেগুলিও খুবই সহজ ব্যাপার বলে মনে হবে। এমন কি সামরিক কারাগারে যে সব ব্যক্তির মুখোমুখি সে হয়ে থাকে—যারা অবাধ্যতা, ঈমান ও আত্মত্যাগের কথাই প্রকাশ করে থাকে, তা থেকেও। তাদের ওপর তো জয়লাভ করা যায় চাবুক ও হত্যার দ্বারা। আর আজকের যে মহা সংকট, তা হচ্ছে 'নাবিলা'-কে নিয়ে। কেননা সে বশে আসতে চায় না, সে চায় 'উতওয়া' নতুন করে চিন্তা করুক। সবচেয়ে বড় বিপদ হলো, সে আপ্রাণ চেষ্টা করছে, উতওয়া যে সব চিন্তা-দর্শন ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী তা থেকে তাকে সরিয়ে নিতে। যা উতওয়ার মন মগজে দীর্ঘ দিন যাবত শিকড় গেড়ে বসেছে এবং তা যেন বিতর্কের উর্ধে সর্ব স্বীকৃত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। আরো আশ্চর্যের

ব্যাপার হলো, সে সব দিক দিয়ে দুর্বল। তার না আছে বিস্তর অর্থ সম্পদ আর না আছে কোন বড় পদ। শুধু মাত্র শিক্ষয়িত্রী। কোন অভিজাত বংশেরও নয়। উতওয়া দীর্ঘ দিন থেকে বিশ্বাস করে এসেছে, সমস্যা যত জটিল হোক না কেন, শক্তির দ্বারাই তার সমাধান সম্ভব। কেবলমাত্র মন ভোলানা রূপ ছাড়া তার তো আর কিছুই নেই। উতওয়া শক্তি দ্বারা এ রূপকে কিভাবে পরাভূত করবে? সে চিন্তা করে কৌশল বের করার চেষ্টা করতে থাকে। উতওয়া ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলছে, কোন প্রকার বুদ্ধি ও সুষ্ঠু কর্মপন্থা তার মাথায় আসছে না। সে জোরে হেসে উঠলো। একা একাই হাসছে উতওয়া। খোলা দরজার বাইরে থেকে 'উয়াইস' তাকিয়ে দেখলো......শুনতেও পেল উতওয়া হাসছে। ভীত চকিত ভাবে উয়াইস লক্ষ্য করলো— ।...... এই উন্মাদ, মাথা খারাপ লোকটা হাসে কেন?........উতওয়া দ্রুত গতিতে বাইরের দিকে চলে গেল এবং উয়াইসের সাথে ধাক্কা খেল। উয়াইস প্রায় মাটিতে পড়েই যাচ্ছিল। উতওয়া গোয়েন্দা বিভাগে তার কিছু অন্তরঙ্গ বন্ধুদের কাছে গেল। কিছুক্ষণ পর একখানি কাগজে কয়েকটি লাইন লিখে তার সামনে পেশ করা হলো। উতওয়া ও তার বন্ধু উভয়ে হেসে উঠে পরস্পর কোলাকুলি করে হাত মিলালো। উতওয়ার বন্ধুটি তাকে বিদায় দিতে দিতে বললো—মাআস সালামাহ, ইয়া নামস! (ওরে খবীস নিরাপদে থাকো)। তোমার সম্পর্কে সব সময় আমি বলে থাকি, তুমি পরাজিত হবে না।

নাবিলা ক্লাসে তার ছাত্রীদেরকে তাতারীদের ইতিহাস পড়াচ্ছিল। সে অত্যন্ত মিষ্টি মধুর গল্পের মত পাঠ্য বিষয় ব্যাখ্যা করছিল। ছাত্রীদের সামনে তাতারীদের প্রকৃতি ও তাদের অভিনব কার্যকলাপের বর্ণনা দিচ্ছিল। আর কি ভাবে তারা বাগদাদ ও অন্যান্য শহর করতলগত করে, কি ভাবে তারা ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের অসংখ্য গ্রন্থ নদীতে নিক্ষেপ করে, কি ভাবে তারা সেই স্তুপের ওপর দিয়ে হেঁটে নদীর পশ্চিম তীরে পৌঁছে যায়, এ সব কথা সে তাদের শোনাচ্ছিল। এরপর নাবিলা তাতারী হামলার মোকাবেলায় মিসরবাসী তথা সমগ্র আরব জাতি ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হয়ে যে শক্তি ও বীরত্ব প্রদর্শন করে, তার ব্যাখ্যা করছিল। আর ছাত্রীরা এমন নীরবতা সহকারে শুনছিল যেন তাদের প্রত্যেকের মাথার ওপর কোন পাখি বসে আছে। এমন সময় হঠাৎ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা এসে কম্পিত হস্তে দরজায় টোকা দিতে লাগালেন, তার চোখ দিয়ে তখন অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। বিড় বিড় করে তিনি বললেন—মাফ করবেন। মিস নাবিলা, আপনি একটু আসুন। তারা আপনাকে ডাকছে।

নাবিলা পড়াটা শেষ করতে চাচ্ছিল। আর ছাত্রীরাও এ আবেগময় কাহিনীটি শোনার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলো। কাহিনী ও গল্প শোনার তাদের কতই না আগ্রহ! কিন্তু প্রধান শিক্ষয়িত্রী মাঝখানে বাধ সাধলেন।

নাবিলা অত্যন্ত চিন্তিতভাবে তাকে অনুসরণ করলো। যখন সে প্রধান শিক্ষয়িত্রীর কাছে ব্যাপারটি জানার জন্যে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করতে লাগলো, তখন তিনি ভীত-সন্ত্রস্তভাবে বললেন—গোয়েন্দা বিভাগের লোক—আল্লাহ আমাদের হিফাজত করুন.........।

—গোয়েন্দা? কেন? অনুচ্চ কণ্ঠে নাবিলা প্রশ্ন করলো।

—আমি জানিনে।

লোকটি প্রধান শিক্ষয়িত্রীর কক্ষে বসে ছিল। যেন ঘাড়ের রগগুলি ফুলিয়ে বসে আছে। তার চোখ দু'টি নাবিলার প্রতিই নিবদ্ধ। কম্পিত পদে নাবিলা এসে দাঁড়ালে সে উঠে দাঁড়ালো। সালাম ও সম্ভাষণ জানিয়ে মৃদু কণ্ঠে বললো—আপনার কাছে পাঁচ মিনিট সময় চাচ্ছি—আমার মোটেই সময় নেই।

—আপনি কে? নাবিলা প্রশ্ন করলো।

—নিরাপত্তা বাহিনীর লোক।

তারপর প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে ছোট্ট একটা কার্ড বের করে নাবিলার সামনে তুলে ধরে বললো—আশা করি এখন আপনি নিশ্চিত হবেন।

নাবিলা যেন কিছুই পড়তে পারে না। তার চোখ দু'টি ঝাপসা হয়ে আসছে। লোকটা তাকে অধিক সময়ও দিচ্ছে না। সে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এর তাৎপর্য কি, সে কিছুই বুঝতে পারে না। ঘটনার আকস্মিকতায় সে বোবা হয়ে গেছে। সে তার শরীরের সকল বিচ্ছিন্ন শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে কাঁদ কাঁদ স্বরে বললো—আমি কি এর কারণ জানতে পারি?

—এখানে বাক্যালাপের কোন অবকাশ নেই। আর পাঁচ মিনিটের বেশি কোন সওয়াল জওয়াব করা হবে না।

তারপর সেই লোকটি তার বাহু- দুটি বিস্তৃত করলো এবং নাবিলার দিকে ইঙ্গিতপুর্বক শিষ্টাচারের ভনিতা করে বললো—অনুগ্রহপুর্বক আসুন......... গাড়ীটি বাইরে।

নাবিলা হোঁচট খেল। প্রায় পড়তে পড়তে আল্লাহ্ তাকে রক্ষা করলেন। তাকে অনুসরণ করে নাবিলা চলতে থাকে, সে যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। সে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না, এটা স্বপ্ন না বাস্তব? তার অন্তরের মাঝে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে, তা ভাষায় প্রকাশ করতে সে অক্ষম। অকস্মাৎ তার স্মৃতিতে ছাত্রীদের ছবিগুলি ভেসে উঠলো। একটা পরিপুর্ণ সমাবেশ। সে তাদের তাতারীদের বর্বরতার কাহিনী শুনাচ্ছিল, আর তাদের চোখে আগ্রহ, ভালোবাসা ও আকাংখার আভা ফুটে উঠছিল। কিন্তু তাতারীদের যুদ্ধের কাহিনী শেষ না হতেই প্রধান শিক্ষিকা এসে হাজির। এত তাড়াতাড়ি তিনি বের হতে বললেন যে, তার সাথে সাক্ষাতের আনন্দ-টুকুও ম্লান করে দিলো। কিন্তু এ মুহূর্তে সে তা ভাবছে কেন? সামনে তাকিয়ে সে দেখতে পেল নিরাপত্তা বাহিনীর লোকটি দ্রুত লম্বা পা ফেলে

চলছে, আরো সামনে সে দেখতে পেল কালো রং-এর একটি প্রাইভেট গাড়ী দাঁড়িয়ে, । শুধু নম্বরটি ছাড়া আর কোন কিছুই তার গায়ে লেখা নেই। আর বিরাট বপুধারী দু'ব্যক্তি গাড়ীটির পাশে পিছনের দিকে দাঁড়িয়ে। এরা গাড়ীর কাছে গিয়ে পৌঁছলে, সেই লোকটি নাবিলাকে ইশারা করে বললো—ইরকাবি, উঠে বসো।

— কোথায় যেতে হবে? নাবিলা প্রশ্ন করলো।

নিরাপত্তা বিভাগের অফিসারটি কোন উত্তর দিলো না। তবে সেই দাঁড়িয়ে থাকা দু'ব্যক্তির একজন পিছন দিকের বাম পাশের দরজাটি খুলে ভিতরে গিয়ে বসলো। আর দ্বিতীয় ব্যক্তি তাড়াহুড়া করে নাবিলার বাহু দু'টি ধরে জোরপূর্বক ভিতরে বসিয়ে দিলো। মাত্র কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই নাবিলা নিজেকে পিছনের সিটে এমন দু'ব্যক্তির মাঝখানে দেখতে পেল, যাদের সে মোটেও চেনে না। সামনের সিটে বসেছে চালক। আর তার পাশেই রয়েছে নিরাপত্তা বিভাগের লোকটি। গাড়ী ছুটে চললো, আর নাবিলা চিৎকার করতে থাকলো—

এটা তো হাইজ্যাক। তোমরা একটি সংঘবদ্ধ হাইজ্যাকার দল। ওরে শয়তানের দল, গাড়ী থামা, নয়তো চিৎকার করে আমি লোক জড়ো করবো।

কেউ কোন মন্তব্য করলো না। নাবিলা চিৎকার করে গাড়ী থামাবার চেষ্টা করছিলো। কিন্তু লোক দু'টি অত্যন্ত শক্তভাবে ধরে তাকে বসিয়ে দিচ্ছে, আর তাদের দৃষ্টিতে যেন এক প্রকার পৈশাচিকতা জ্বলজ্বল করছিল। নিরাপত্তা বাহিনীর অফিসারটি গাড়ীর জানালা বন্ধ করার এবং যথা সম্ভব দ্রুত চালাবার নির্দেশ দিলো। নাবিলা প্রায় সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললো, এদের কাছে আত্মসমর্পনের জন্যে এখন সে অনুতপ্ত। সে হাত-পা ছোড়া-ছুড়ি ও চিৎকার করলো, দু'হাত দিয়ে লোক দু'টিকে মারলো। নিরাপত্তা বাহিনীর লোকটি রাগত দৃষ্টিতে তার দিকে একবার চেয়ে পকেটে হাত দিয়ে একটি নতুন হাতকড়া বের করে পিছনের একজনের দিকে ছুড়ে দিল। তারা সেটা নাবিলার হাতে পড়িয়ে দিল। নিরাপত্তা অফিসারটি দ্বিতীয়বার নাবিলার দিকে ফিরে এক চোখে একটি ভ্রুকুটি কাটলো এবং সজোরে এক থাপ্পর বসিয়ে দিল তার গালে। নাবিলা প্রায় চেতনা হারিয়ে ফেলেছিল। জীবনে এই প্রথমবারের মত সে এমন একটি চপেটাঘাত লাভ করল। অপমান ও ক্ষোভে তার দু'চোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। আকস্মাৎ তার স্মরণ হলো—হ্যাঁ, উতওয়ার কথাই তার স্মরণ হলো। কিছুক্ষণ নীরব থেকে সে বললো—এর বিনিময়ে তোমাদের খুব চড়া মূল্য দিতে হবে। তোমরা জান না আমি কে! সামরিক কারাগারের কমাণ্ডার বেগ আল-মালওয়ানীর বাগদত্তা আমি। নিরাপত্তা অফিসারটি হো হো করে হাসতে হাসতে বললো—তোমার এসব অমূলক দাবী আমাকে ধোকা দিতে পারবে না। আইন-শৃংখলার শত্রুদের কেউ উতওয়ার বাগদত্তা হতে পারে না।

—তুমি কি বলতে চাও ?

—ঠিক সময়ে সবকিছু জানতে পারবে। তোমার শত্রুতামূলক তৎপরতা উতওয়া বেগ যখন জানতে পারবে, তখন সে তোমাকে প্রত্যাখ্যান করবে এবং তার সুপ্রসিদ্ধ চাকবুট দিয়ে তোমার নরম তুলতুলে শরীরটি তুলো ধোনা করে ছাড়বে। রাগে নাবিলা চিৎকার করে উঠলো—এসব বানোয়াট অভিযোগ কেন ?

আমি জানি না, মেয়েরা সব সময় চিল্লাচিল্লিই করে থাকে। চুপ থাকাটাই তোমার জন্য উত্তম। তোমার প্রতিটি কথার জন্য তোমাকে শিঘ্রই কৈফিয়ত দিতে হবে। আমাদের সঙ্গে টেপ রেকর্ডার রয়েছে, তোমার প্রতিটি কথাই রেকর্ড করা হচ্ছে। আমাদের কাছে তোমার কর্মতৎপরতা সম্পর্কে যে রিপোর্ট রয়েছে, তোমার এসব কথাবার্তা তার সাথে মিলে যাবে।

নাবিলা তার চতুর্দিকে নজর বুলালো। পাথরের মূর্তির মত যে লোক দু'টি তার পাশে নিশ্চুপ বসে আছে তাদের দিকে একবার তাকালো। তারপর হিষ্ট্রিয়া রোগীর মত হেসে উঠে বললো—আমি কিছু বুঝলাম না। অথচ তা অপরাধ হবে, এটা কেমন করে হতে পারে ? আমাদের এ যুগের নিম্নমানের ফিল্মে ঘুমন্ত অবস্থায় যে সব মানুষকে ভ্রমণ করতে দেখা যায়, এটা তো তাদেরই মত।

কেউ কোন মন্তব্য করলো না। নাবিলার মনে পড়ছে তার আব্বা, আম্মা ও ভাইদের কথা। তার আরো মনে পড়ছে ছেড়ে আসা নীরব, শান্ত বাড়ীটি, ছোট পাঠাগার, টেপরেকর্ডার তার রুচি অনুযায়ী নির্বাচিত ফাইন আর্টের বোর্ডগুলি, তার সংরক্ষিত কবিতাগুলি, বালিকা বিদ্যালয়ের কিশোর ছাত্রীদের আর শিল্প, ইতিহাস, স্মরণীয় বিষয়বস্তু তথা জীবনের সকল দিক সম্পর্কে আলোচনারত তার সহকর্মীদের কথা। সে চিন্তা করছে, পরিপূর্ণ ও আনন্দময় জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াটাই তার জন্যে প্রকৃত মৃত্যু। এ ছাড়া মৃত্যুর আর কি অর্থ হতে পারে! একটা মধুময় জীবনকে চিরকালের জন্যে ছেড়ে যাওয়াকেই তো মৃত্যু বলে। যে জীবনে থাকে একাধিক ব্যক্তি, চিন্তা, শিল্প, প্রাণী ও জড় জগৎ, কৃষি, আকাশ, পানি এবং চন্দ্র-সূর্য। এখন সে যা দেখছে, প্রকৃত পক্ষেই তা দোযখ। সুদৃশ্য খাচায় সবুজ বর্ণের পাখীটির কথা এখন তার মনে পড়েছে। তার ইচ্ছে হচ্ছে হাত বাড়িয়ে খাঁচা খুলে বন্দী পাখীটিকে মুক্ত করে দেয়। পাখীটিকে খাঁচায় বন্দী করে সে যে একটি জঘণ্য অপরাধ করেছে তা সে বুঝতে পারলো। বিড় বিড় করে সে বললো—হে আমার প্রিয় বেদনাতুর পাখীটি ! আমি তোমার জন্য কাঁদছি।

নাবিলার ডান দিকে বসা লোকটি যখন দেখতে পেল, নাবিলার চোখ থেকে অশ্রু ঝরছে, তখন বলতে লাগলো—ভয় নেই। হঠকারিতা ও অস্বীকৃতি জানালে নির্যাতন ভোগ করতে হবে। প্রতিটি বিষয়ে পরিষ্কারভাবে কথা বললে ব্যাপারটি অনেকাংশে সহজ হবে।

ভীত-সন্ত্রস্তভাবে নাবিলা বলে উঠলো—স্বীকৃতি ? তোমরা কি বলতে চাও ?

সামনে বসা অফিসারটি চিৎকার করে উঠলো—বুযুমী, জানোয়ার কোথাকার। কথা বন্ধ কর। নাবিলার বাম পাশে বসা লোকটি উত্তর দিলো—জনাব ! আমি তো কথা বলিনি।

—তোরা সবাই জানোয়ার ! আমি তো সি, যফ্‌ত মুতাওয়াল্লীকে বলছি।

মুতাওয়াল্লী বসে বসেই একটা স্যালুট দিয়ে উত্তর দিলো—কিছু বলছেন ? জনাব আফেন্দী !

—হ্যাঁ, চুপ কর, হারামজাদা।

গাড়ীটি প্রধান কর্যালয়ে পৌঁছে একটি প্রশস্ত ফটক অতিক্রম করে আঙ্গিনায় গেল। তারপর একটু ঘুরে একটি বিরাট অট্টালিকার ছোট্ট একটা পার্শ্ব দরজায় গিয়ে পৌঁছলো। মুহূর্তেই তারা নাবিলাকে গাড়ী থেকে নামিয়ে অট্টালিকার ভেতরে নিয়ে গেল। সে নিজেকে এমন একটি ছোট্ট কক্ষে দেখতে পেল যেখানে দু'জন লোক বসে আছে। একজন বসে আছে সবুজ মূল্যবান পর্দায় ঘেরা অভিজাত অফিসকক্ষের পেছন দিকে, তার মাথার ওপরে টাঙ্গানো রয়েছে আরব-নেতা জামাল আবদুন নাসেরের রঙ্গীন ছবি, আর তার বাম দিকে শোভা পাচ্ছে একটি কালো বোর্ড, সোনালী অক্ষরে যাতে লেখা রয়েছে—আল-আদলু আসাসুল মুলক—রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি হচ্ছে ন্যায়বিচার। তার মনে হচ্ছে, এ ধরণের লেখা আরো কোথাও যেন আগে দেখেছে। হ্যাঁ আদালতের সামনে। না, না—প্রাক্তন বাদশাহ ফারুকের প্রাসাদ 'কাসরে আবেদীনের' সিংহাসন কক্ষে। অফিসের মধ্যে বসা পদস্থ লোকটি বলে উঠলো—রে নুরুন নবী ! কি চমৎকার রূপ ! কী সর্বনাশ ! এ প্রাণ ভোলানো সুন্দরী নিজেকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে কেন ?

নাবিলা তার দিকে ফিরে অশ্রু ভেজা চোখে অত্যন্ত নম্রভাবে বললো—ভদ্র ব্যবহার আশা করি। আমার অপরাধ কি তা আমি জানতে চাই।

মুচকি হেসে লোকটি মাথা ঝাঁকালো এবং সাদা কাগজে কিছু লিখতে লিখতে হাত দিয়ে ইশারা করলো। তারপর বললো—তাড়াহুড়া করো না। বসো, বসো। আমরা কারো ওপর জুলুম করিনে।

খুশী হয়ে নাবিলা বললো—আমি এটা বিশ্বাসই করিনে। মহান বিপ্লবের পক্ষে জাতির নিষ্ঠাবান ও দেশপ্রেমিক সন্তানদের ওপর জুলুম সম্ভবই নয়।

লোকটি লেখা বন্ধ করে মাথা উচু করে বলল—নিশ্চয়, নিশ্চয়।

নাবিলা অনেকখানি সান্তনা লাভ করলো। কিন্তু সে বড় লোকটিকে বলতে শুনলো—তবে যারা বিপ্লবের উদারতাকে নিজ স্বার্থে ব্যবহার করছে এবং আগুন নিয়ে খেলছে—দুঃখের বিষয় আগুন বিপ্লবকে পোড়াতে পারে না, বরং যারা তা নিয়ে খেলে তাদেরই হাত জ্বালিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, তাদের দেহ, বাড়ী-ঘর এবং তাদের সাথে সম্পৃক্তদেরকেও জ্বালিয়ে দেবে।

নাবিলা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বললো—সবাই আমাকে চেনে জানে — — বাড়ীতে, স্কুলে, রাস্তায়, সমাজে, পাড়ায় সকলে আমাকে জানে।

নাবিলার প্রতি দীর্ঘস্থায়ী সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সেই লোকটি বললো—সবার থেকে আমরাই বেশী জানি। তারপর দণ্ডায়মান ব্যক্তিদের দিকে কাগজখানা ছুড়ে দিয়ে বললো—পঁচিশ।

একটি লোক কাগজ খানা উঠিয়ে নিয়ে পায়ের গোড়ালী দিয়ে মাটিতে সজোরে আঘাত করে আরবী ৭ অংকটির মত (V) পা দু'টি একত্রিত করলো। তারপর সম্ভাষণ জানিয়ে দ্রুত নাবিলাকে টেনে নিয়ে বের হয়ে গেল। অট্টালিকার ভূ-গর্ভস্থ একটা ছোট্ট কক্ষে তাকে ঢুকিয়ে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলো। নাবিলা তার চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে কিছুই দেখতে পেল না। এখানে সে কিভাবে বসবে? কিভাবে ঘুমাবে? এমুহূর্তে যা কিছু ঘটছে, বাস্তবে তা ঘটা সম্ভব নয়। এটা যেন স্বপ্ন। নিঃসন্দেহে এটা স্বপ্ন। শীঘ্রই হয়তো সে জেগে উঠবে।

৬

কিছুটা প্রশান্তি এবং আল্লার ওপর দৃঢ় প্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছে নাবিলা। যা ঘটে গেছে তা গভীর ভাবে ভেবে দেখতে বসেছে সে। কোন প্রকার রাজনৈতিক ডামাডোলে কোনদিন সে জড়িত হয়নি। সে বিশ্বাস করতো, রাজনৈতিক অঙ্গনে যারা কাজ করে তারা হয় অতিরিক্ত বলে অথবা ধোঁকাবাজি করে। আর যারা অল্প কথা বলে তারাই নিষ্ঠাবান। এ কারণে কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে দলভিত্তিক যেসব রাজনৈতিক তৎপরতা চলতো সে দিকে সে কোন দিন ভ্রূক্ষেপ করেনি। ডিপার্টমেণ্টে একদিন সে তার এক বন্ধবীকে বলতে শুনেছে, দৈনন্দিন জীবন, সমাজ, স্বদেশ ও প্যালেষ্টাইন সমস্যার একমাত্র সমাধান সমাজতন্ত্র, যা কি না উপনিবেশবাদের সাথে সর্বদাই সংঘর্ষে লিপ্ত। সে তাকে কিছু গোপন লিফলেটও দিয়েছিলো, অনেকটা অনিচ্ছুকভাবে সে তা পড়েছিলো। তাতে সাধারণভাবে যেসব কথা লেখা ছিলো, তাতে কিছুমাত্র তৃপ্ত না হয়েই তা তাকে আবার ফিরিয়ে দিয়েছিলো। একদিন বোরকা পরিহিত তার এক বান্ধবী তাকে বলে ছিলো, মুক্তি, স্বাধীনতা, সাম্য, ন্যায়নীতি, ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের একটি মাত্র পথই আছে তা হলো-ইসলাম। কোন অবস্থাতেই মানব রচিত আইন ও বিধান খোদায়ী বিধান থেকে শ্রেষ্ঠ হতে পারে না যা মানুষ ও সৃষ্টিজগতের জন্যে আল্লাহ্ তৈরী করে পাঠিয়েছেন। একথা বলে সেই পর্দানশীন মেয়েটি তার সামনে ইসলামের ইতিহাস ও ইসলামী সভ্যতা থেকে অনেক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুলে ধরলো। আর লৌহকারার অন্তরালে কম্যুনিষ্টদের স্বর্গরাজ্যে মানুষ যে জুলুম-অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার হচ্ছে তা ব্যাখ্যা করতে থাকলো।

নাবিলা তার বক্তব্যে প্রায় প্রভাবিত হতে চলেছিলো ; কিন্তু সে রাজনীতি ও বিভিন্ন রাজনৈতিক সমস্যা থেকে দূরে থেকে শিল্প, সংস্কৃতি ও শিক্ষাগত যোগ্যতা বৃদ্ধি করে একজন শিক্ষিকা হিসেবে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ভবিষ্যৎ

বংশধরদের নৈতিকতা, মহত্ত্ব ও দেশপ্রেমের দীক্ষায় দীক্ষিত করে দেশ সেবার মহান উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দেয়। সে আরো শুনেছে, ওয়াফ্‌দা, সা'দীন দাসতুরীন, কাতলাহ্‌, মিসরীয় নারী সমিতি এবং সমাজতান্ত্রিক দলের মূলনীতি সমূহ। কিন্তু এর সবকিছুকেই সে এড়িয়ে চলেছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবক-যুবতীদের ধ্বংসাত্মক সংঘর্ষ থেকে নিজেকে সব সময় দূরে রেখেছে। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, চলতি ঘটনাবলী সম্পর্কে সে একেবারেই মুখ বন্ধ করে থাকতো বা তার সাথে কোন সম্পর্কই রাখতো না। বিশেষত বিপ্লবের পর। পূর্বের কোন দল বা গোষ্ঠীর মতামতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে নিজের বিশেষ চিন্তা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতেই সে সব সময় কথাবার্তা বলে থাকে। সত্য বলে সে যেটাকে বিশ্বাস করতো তাই-ই বলতো। সব ধরনের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত অতি সতর্কভাবে এড়িয়ে চলা সত্ত্বেও আজ তার এ দশা হলো কেন? সে কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। বিনা কারণে নিশ্চয় তাকে গ্রেফতার করা হয়নি। এমন কি কাজ সে করেছে, যার দরুণ সাধারণ গোয়েন্দা ভবনের এ নির্জন অন্ধকার কামরায় এমন লাঞ্ছিত অবস্থায় তাকে টেনে আনা হয়েছে? সে শুনেছে সব জায়গায় সরকারের গুপ্তচর থাকে। সে আরো শুনেছে, শাসকগোষ্ঠী বা রাষ্ট্রপ্রধানকে সামান্য সমালোচনার কারণে কখনো কখনো কোন কোন লোককে গ্রেফতার করে বিচারকের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়েছে, তারপর তাকে জেলে ঢোকানো হয়েছে। সে আরো শুনেছে একদল লোককে রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্রের দোষে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। তাদের অপরাধ হলো নিছক পারিবারিক এক বৈঠকে তারা দেশের রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনাকালে তাদের কেউ কেউ স্বাধীনভাবে বিপ্লবের সমালোচনা করেছিলো। অত্যাচার, উৎপীড়ন তথা হত্যা, চাকুরীজীবিদেরকে চাকুরী থেকে অপসারণ, কিছু সামরিক অফিসারকে বরখাস্ত এবং কোন কোন মন্ত্রীর পদচ্যুতির কথাও সে, শুনেছে। এসবের একমাত্র কারণ ক্ষমতাসীনদের কিছু সমালোচনা বা উপদেশ দান যা তারা আদৌ পছন্দ করে না।

তবে সত্যিকথা বলতে কি, নাবিলা এগুলোকে অপপ্রচার মনে করে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করতো। তার বিশ্বাস ছিলো লোকমুখে যেসব কথা শুনা যায় প্রকৃত পক্ষে তা সেইসব ঈর্ষাপরায়ণ উচ্চপদস্থ অফিসারদের কল্পকথা, বিপ্লব বিরোধী ভূমিকার জন্যে যাদেরকে পদচ্যুত করে সকল বিষয়-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

ইখওয়ানুল মুসলিমীন বিরোধী বহু অপপ্রচার সে পত্র পত্রিকায় পড়েছে এবং রেডিও-টেলিভিশনেও শুনেছে। তবে যা কিছু লেখা হয় বা বলা হয় তার সবই বিশ্বাসযোগ্য কি না, এ ব্যাপারে সে দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে ছিলো। সে চাইতো দু'পক্ষের কথা শুনে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে। শুধুমাত্র সরকারী পক্ষের কথা শুনে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছা সম্ভব নয়। কতকগুলি ব্যাপার তাকে ইখওয়ান সম্পর্কে কথিত অভিযোগ সম্বন্ধে সন্দিহান করে তুলেছিলো। তা হলো, সে

তাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয় অঙ্গনে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে স্বেচ্ছাসেবকদের ট্রেনিং দিতে দেখেছে, প্যালেষ্টাইন যুদ্ধে তাদের বীরত্বের কথা শুনেছ, বিশেষ করে সে 'আওকার ও জীপ গাড়ীর' ঝগড়া সংক্রান্ত বিচার ধারাবাহিকভাবে শুনেছে, তাদের সম্পর্কে প্যালেষ্টাইনে নিযুক্ত উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারদের সাক্ষ্য সে পাঠ করেছে, আর সে দেখেছে কিভাবে তাদের মূলনীতিগুলি যুবকদের শিষ্টাচার ও উন্নত নৈতিকতার দিকে নিয়ে এসেছে। সব শেষে শুনেছে বিপ্লবের কোন কোন নেতা জনসমাবেশে 'ইখওয়ানের' গুণ-কীর্তন করেছে। তাদের কেউ কেউ আবার নিজেদের-এর সদস্য ও একে সহযোগিতার কথাও ঘোষণা করেছে। তাহলে সরকার আজ তাদের কিভাবে খিয়ানতকারী, বিপর্যয় সৃষ্টিকারী ও বিপথগামী বলে অভিযুক্ত করতে পারে? যা হোক, নাবিলা এসব বিষয়ের চিন্তা 'তাকে' উঠিয়ে রেখেছিল এবং এ আশায় সব কিছু থেকে দূরত্ব বজায় রাখছিলো যে, সময় এলে একদিন সব রহস্যই প্রকাশ হয়ে পড়বে।

এ হলো নাবিলার রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা। প্রকৃতপক্ষে এটা কোন চিন্তাই নয়। একটু আনন্দ-ফুর্তি করা এবং কে কি বলে বা করে তা শোনা ও দেখাই তার উদ্দেশ্যে। তাহলে তাকে গ্রেফতার করা হলো কেন? সে কি এমন কিছু বলেছে? তার কোন আত্মীয় বা বান্ধবীর সাথে আলোচনাকালে তাদেরকে আঘাত করে এমন কোন মন্তব্য কি কখনো সে করেছে? এমন কোন অন্যায় কাজ সে করেছে বা কোন কথা বলেছে, যা সে স্মরণ করতে পারছে না। যার দরুণ তাকে এ অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। গোয়েন্দা অফিসারটির চপেটাঘাতের কথা স্মরণ হলে তার চোখ দু'টি পানিতে ভিজে যায়। সে তার চেহারাকে অত্যন্ত পবিত্র ও সম্মানিত স্থান বলে মনে করে—সেখানে কারো কোন অধিকার সে স্বীকার করে না। কিন্তু একজন বখাটে, ছোটলোক সে পবিত্রতা নষ্ট করে সেখানে সজোরে এক থাপ্পড় বসিয়ে দিল! তার ক্ষমতা থাকলে সে তার হাত কেটে ফেলতো। আসমান ও জমিনের কোন আইনই এ অপরাধকে ক্ষমা করতে পারে না। উমর ইবনুল খাত্তাবের ন্যায়বিচার সম্পর্কিত সেই কাহিনীটি নাবিলার মনে পড়ে, যা সে প্রায়ই তার ছাত্রীদের শুনাতো। 'জাবালা বিন আয়হাম ছিলেন সম্ভ্রান্ত আরবদের একজন। উমর যখন জানলেন, তিনি একজন দরিদ্র আরব বেদুঈনকে থাপ্পর মেরেছেন, তখন খলিফা উমর সেই বেদুঈনকে আদেশ দিয়েছিলেন 'জাবালাকে' অনুরূপ একটি থাপ্পর মারার জন্যে। কিন্তু স্বদেশ, ধন-সম্পদ, ধর্ম ও আভিজাত্য সবকিছু ফেলে জাবালা রোম সাম্রাজ্যে পালিয়ে যায়। —হায় খোদা! প্রতিদিন আমাদের এ ভূমিতে কত অন্যায় থাপ্পরই না মানুষের গালে পড়ছে। বিনা অপরাধে আমি না হয় চপেটাঘাত সহ্যই করলাম। আর সেসব অসহায় বেচারাদের কী অবস্থা যাদের প্রতি মিথ্যা দোষারোপ করা হয়েছে যে তারা প্রেসিডেন্টকে হত্যা ও জোরপূর্বক রাষ্ট্র ব্যবস্থা পাল্টে দেবার

ষড়যন্ত্র করেছিলো ! লোকদের মুখে যা শুনা যাচ্ছে তাতে এটা নিশ্চিত, হয় তাদের হত্যা করা হবে অথবা কঠিন শাস্তি দেয়া হবে।

অনেক চিন্তা করেও যা কিছু ঘটেছে তার কোন কারন খুঁজে পেল না নাবিলা। কারণ জানতে পেলে হয়তো কিছুটা শান্তনা পেত। ক্ষোভে-দুঃখে অন্তরটা ভরে গেছে, মাথা ফেটে যাবার উপক্রম হয়েছে, অনেক কেঁদেছে এবং অনেক কিছুই চিন্তা করেছে। ভীষণভাবে পানির পিপাসা অনুভব করেছে। চারপাশে তালাশ করে কোথায়ও পানি পায়নি। সেলের দরজায় জোরে আঘাত করেছে; কিন্তু কেউ সাড়া দেয়নি। জোরে চিৎকার করতে করতে আবারো দরজায় আঘাত করতে লাগলো; কিন্তু কেউ উত্তর দিল না। অন্ধকার সেলটি তার কাছে ভীতিপ্রদ কবরের মত মনে হচ্ছিল, আর তার দেয়ালে সে হতভম্বের মত অসহায়ভাবে মাথা ঠুকছিলো।

সেলের ভেতরে পূর্বদিকের পিলারটির কাছে সরে এলো নাবিলা। পা দু'টি ছড়িয়ে পিছনের দেয়ালে হেলান দিয়ে মাটিতে বসে পড়লো। দীর্ঘ প্রতীক্ষা যেন শেষ হতে চায় না। এর মধ্যে তার চোখ দুটি বুজে এলো এবং আস্তে আস্তে সে ঘুমিয়ে পড়লো। কতক্ষণ ঘুমিয়েছে, তা ঠিক বলতে পারে না। কোন কোন সময় ঘুমও শ্রেষ্ঠ নিয়ামত হিসেবে দেখা দেয়। অন্তত এ সময়টুকুতে তিক্ত বাস্তবতা ও দুঃখ-বেদনার গণ্ডি থেকে পালিয়ে কিছুটা স্বস্তি লাভ করা যায়। ঘুমোবার পূর্বে সে মনে মনে বলছিল—হায়, যদি আমার মরণ হতো।

বলা হয়ে থাকে, ঘুমও না কি একপ্রকার মৃত্যু। একটা সোরগোল ও হৈ-হল্লা শুনে ভীত-সন্ত্রস্তভাবে সে ঘুম থেকে জেগে উঠলো এবং সেলের দরজার তালা খোলার শব্দ শুনতে পেল। দরজা খুলার পরই সে এক মহিলাকে তার সামনা-সামনি দেখতে পেল। তার পরনের কাপড় ছেঁড়া-ফাড়া, মুখ-মণ্ডল ক্ষত-বিক্ষত এবং খালি পা। সে সেই ছেড়া কাপড় দিয়ে টেনেটুনে বুক ঢাকার চেষ্টা করছে। নাবিলা সেই মেয়েটির বুক, চোখ, হাত এবং গায়ে আরো ক্ষত ও রক্ত জমার চিহ্ন লক্ষ্য করলো। জেল রক্ষীরা তাকে সজোরে সেলটির মধ্যে ধাক্কা দিয়ে ঢুকিয়ে দিলো আর সে অত্যন্ত দুর্বল অবস্থায় মেঝের ওপর লুটিয়ে পড়লো।.........অত্যন্ত মর্মস্পর্শী করুণ দৃষ্টিতে নাবিলার দিকে এক দৃষ্টিতে এমনভাবে তাকিয়ে রইলো যে, সেই সংকীর্ণ কামরাটিতে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের সৃষ্টি হলো। এরপর সে হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠলো। মুহূর্তে নাবিলা উঠে দাঁড়িয়ে তার দিকে এগিয়ে গেল এবং অত্যন্ত দরদ ও আন্তরিকতার সাথে তাকে তুলে নিয়ে বুকের সাথে চেপে ধরলো। মেয়েটির কান্না আরো বেড়ে গেল। কাঁদতে কাঁদতে সে বললো—

'মিনহুম লিল্লাহ......রববুনা ইয়ন্‌তাকিম......রববুনা আকওয়া মিনহুম...... সাল্লামতু আমরি ইলাকা ইয়া রব।'—'খোদার কসম, আমার রব তাদের থেকে প্রতিশোধ নিবেন...আমার রব তাদের থেকেও শক্তিশালী.....প্রভু হে, আমি আমার সব কিছুই তোমার হাতে সোর্দ'প করেছি।'

নাবিলাও কেঁদে বুক ভাসালো। কিছুক্ষণ পর নাবিলা একখানি ছোট্ট সাদা রুমাল বের করে তার বান্ধবীর ক্ষত মুছতে থাকলো, যার সম্পর্কে সে কিছুই জানে না। মেয়েটি তার দিকে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে তাকালো। নাবিলা তার দিকে স্নেহ, প্রীতি ও সম্মানসূচক দৃষ্টিতে তাকিয়ে অত্যন্ত নরম গলায় তাকে প্রশ্ন করলো—আপনি কে?

—সালওয়া আহমদ আব্দুল করিম সাফী।

—বোন! কেমন আচরন করা হয়েছে আপনার প্রতি?

—প্রতিদিন হাজারো মানুষের প্রতি যে আচরণ করা হচ্ছে, তেমনই।

সালওয়া ডুকরে কেঁদে উঠে বলতে থাকলো—চিন্তা করুন, তারা আমার ইজ্জতহানি করতে চায়, কোন আইনে? কোন বিধান এটা?

বিড়বিড় করে নাবিলা বললো—এটা বিশ্বাস করা যায় না।

—আপনি তাদের চেনেন না।

—আমি তাদের চিনি না.........কিসের জোরে তারা এমন করতে পারে...

রাগত স্বরে সালওয়া বললো—শয়তানের জোরে।

নাবিলা আবারো সালওয়ার চেহারা, তার ক্ষত ও ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন কাপড়ের প্রতি নজর বুলিয়ে বললো—মনে হচ্ছে তারা আপনাকে খুব মেরেছে।

—ইজ্জতহানির তুলনায় তাদের সব কাজই নগণ্য.........এমন কি মৃত্যুও।

নাবিলা আস্তাগফিরুল্লাহ পড়ে বললো—কিন্তু, এসবের কারণ কি?

ব্যাপারটি সত্যি অভিনব। চিন্তা করুন, সব দোষ হলো, আমার স্বামী জার্মানীতে পারমাণবিক প্রকৌশলে ডক্টরেট কোর্সে পড়া-শুনা করছেন......আর তারা চায় তাকে গ্রেফতার করতে। তারা আমাকে চাপ দিচ্ছে যেন আমি তাকে একের পর এক চিঠি লিখে দেশে ফেরত নিয়ে আসি। তিনি যে জবাব দেন, তাও তারা নিয়ে নেয়। তারা তাকে ধমক দেয় যদি তিনি দেশে এসে আত্মসমর্পণ না করেন তাহলে তারা আমাকে গ্রেফতার করবে অথবা হত্যা করবে। তার দোষ হলো তিনি 'ইখওয়ানের' সাথে সম্পর্ক রাখেন—তাছাড়া আর কোন অভিযোগ তার বিরুদ্ধে নেই। প্রতিদিন এখানে যা ঘটছে, তা তিনি জানেন। তাই আমার স্বামী দেশে ফিরতে অস্বীকার করেছেন। নির্দোষ ও সমভ্রান্ত ব্যক্তিদের ভাগ্যে প্রতিদিন এখানে যা ঘটছে, ইউরোপ আমেরিকার পত্র-পত্রিকায় তার বিস্তারিত বিবরণ ছাপা হচ্ছে। আমার স্বামী কি জেনে-শুনে নিজেকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারেন? এটা অসম্ভব। তারা তার সম্পর্কে হতাশ হয়ে আমাকে গ্রেফতার করেছে। আমার তিন বছরের ছেলেটিকে তারা আমার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আমাদের পাশের ফ্লাটের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। তার ভাগ্যে কি ঘটেছে আমি এখনো জানি না। ....আমার প্রাণপ্রিয় কলিজার টুকরো.........তুমি এখন কেমন আছ? এই বলে সালওয়া কান্নায় ভেংগে পড়লো।

নাবিলা তার মাথায় ও পিঠে অত্যন্ত দরদের সাথে হাত বুলাতে থাকলো এবং তার দু'গাল বেয়ে চোখের পানি গড়িয়ে পড়তে থাকলো।

কিছুক্ষণ পরেই সালওয়া তার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো—আর আপনার পরিচয়?

—নাবিলা আবদুল্লাহ.........সমাজ বিজ্ঞানের শিক্ষিকা।

—আপনাকে গ্রেফতার করা হয়েছে কেন?

অত্যন্ত ব্যথিতভাবে নাবিলা তার হাত দু'টি প্রসারিত করে বললো—আল্লার কসম, আমি জানি না। বোন! আমাকে বিশ্বাস করুন।

—আপনি কি 'আল-আখাওয়াত-আল-সলিমাত'-এর (ইখওয়ানের মহিলা শাখার) সদস্যা ছিলেন? এমনটি তো মনে হয় না।

—তেমনটি মনে হয় না কেন?

মাফ করুন—ইখওয়ান সদস্যাদের পোশাক হচ্ছে বিশেষ এক ধরনের—এই ধরুন এ রকম—মাথায় উড়না, লম্বা লম্বা জামা—প্রশস্ত হাতা ইত্যাদি।

মুচকি হেসে নাবিলা বললো—তাহলে, আমিতো এ অভিযোগ থেকে মুক্ত।

—তাহলে, সমাজতান্ত্রিক কোন দলের সাথে কি আপনার সম্পর্ক আছে?

নাবিলা রাগের সাথে প্রতিবাদ করে বললো—নাউযুবিল্লাহ! তাদের কর্ম-পদ্ধতি ও তাদের পরস্পর বিরোধী দর্শন ও বিশ্বাসগুলোকে আমি ভীষণ ঘৃণা করি।

—আপনি দেখছি অবাক করলেন।

এরপর তাদের দু'জনের মাঝে কিছুক্ষণ নীরবতা বিরাজ করে। সালওয়া সন্দেহের দৃষ্টিতে নাবিলার দিকে তাকায়। তারপর নীরবতা ভঙ্গ করে একটু আস্তে করে যেন মনে মনে আওড়াতে থাকে—আমার ভয় হচ্ছে, আপনি হয়তো গোয়েন্দা বিভাগেরই লোক হবেন।

কিছুটা তিরস্কারের সুরে নাবিলা বললো—এমন ধারণাও করতে পারলেন?

সালওয়া তাকে জড়িয়ে ধরে চুমা দিতে দিতে বললো—দুঃখিত! আমরা এমন এক পৃথিবীতে আছি যেখানে পিতা-পুত্রকেও সন্দেহ করে—এটা যেন নেকড়ের বিশ্ব—এখানে সত্য ও সুন্দরের চেহারার বিকৃতি ঘটেছে—প্রতিটি বস্তুই কুৎসিত, অত্যন্ত জঘণ্য, আল্লার ওপর ভরসা ছাড়া আর কিছুই আশা করা যায় না।

কিছুটা দুঃখ প্রকাশ করে নাবিলা বললো—কোন দলের সাথেই আমার সম্পর্ক নেই। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃংখলারও আমি শত্রু নই, আমি কোন জাসুসও নই—অনেক কিছু সম্পর্কেই আমি অনভিজ্ঞ, এমন কি আমি আমার নিজের সম্পর্কেও বহু কিছু জানি না।

বাইরে তারা একটি সোরগোল শুনতে পেল। রাত্রির অন্ধকারও গাঢ় হয়ে এসেছে। দু'জনেই সেলের দরজার তালায় চাবি ঘোরানোর শব্দ শুনতে পেল, আর সংগে সংগে এমন কতকগুলি কুৎসিৎ শয়তানী চেহারা তাদের সামনে দেখা গেল যেখানে শুধু শাস্তি ও ভীতির রূপই ফুটে উঠেছে। তাদের চেহারা দোজখ বাসীদের থেকেও খারাপ। তাদের একজন ডাকলো—নাবিলা আবদুল্লাহ!

নাবিলা কম্পিত হৃদয়ে দাঁড়াতে দাঁড়াতে জবাব দিলো—জী!

লোকটি চীৎকার করে বললো -জী, জনাব আফেন্দী--শিষ্টাচার, ভদ্রতা শেখ।

—তাআম, ইয়া আফিন্দম—জী জনাব আফিন্দী।

—অনুসন্ধান।

—কি বললেন ?

—বলছি, অনুসন্ধানে এসো।

নাবিলা তাকালো সালওয়ার দিকে। সালওয়া নিজেকে কিছুটা সম্বরণ করে নিয়ে নাবিলার একটি হাত মুঠ করে ধরলো, তারপর তাকে জড়িয়ে ধরে তার মাথায় চুমু দিতে দিতে বললো—আল্লাহু মাআকে—আল্লাহ তোমার সহায়।

দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তিদের একজন একটা শয়তানী হাসি হেসে বললো—মনে হচ্ছে, তোমাদের দু'জনের ভিতরের সম্পর্কটা খুবই পুরাতন—খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

সালওয়া প্রতিবাদ করলো-আল্লার কসম ! সম্পূর্ণ মিথ্যা।

লোকটি গর্জে উঠলো—এসো—আমাদের সময়ের অপচয় করো না—তোমরা সবাই তো শয়তানের কন্যা।

নাবিলা চলেছে তার পেছনে পেছনে, মাঝে মাঝে হোঁচটও খাচ্ছে। আর সালওয়া বসে বসে স্মৃতিচারণ করছে, স্মরন করছে, তার ক্ষত, দাঁতের চিহ্ন এবং শ্লীলতাহানির অপচেষ্টা। জীবনে এই প্রথমবারের মত সে উপলব্ধি করে যে সে আল্লার অতি নিকটে। সে আল্লাকে, আর আল্লাহ তাকে ভালবাসে। আল্লাহ কখনো তাকে পরিত্যাগ করবেন না। একাগ্রচিত্তে সে তার রবের দরবারে হাত উঠিয়ে মোনাজাত করলো—'প্রভূ হে ! আমার অবস্থা তুমি ভালো জান, তোমার দয়া ও করুণা চাওয়ার অপেক্ষা রাখে না।'

৭

যেখানে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়, নাবিলা সে কক্ষটিতে হতভম্বের ন্যায় ঠায় দাঁড়িয়ে। একজনের দিকে তাকায়, সে কোন আমল দেয় না। আবার অন্যের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়, সেও কোন ভ্রূক্ষেপ করে না। গলা ঝেড়ে বা কাশি দিয়ে তৃতীয় ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়েও ব্যর্থ হয়। নীরবে অথবা আস্তে আস্তে অতি সংক্ষিপ্ত বাক্য বিনিময়ের পর মানুষ ঢুকছে ও বের হচ্ছে। সে যেমন অপমান বোধ করতে থাকে, তেমনি মানসিক পেরেশানিও। তার রূপে মানুষের মাথা ঘুরে যায়। যে কোন সমাজ ও পরিবেশেই সে যাক না কেন তার ব্যাপক ও উন্নত সংস্কৃতি তার প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ও সম্মান বয়ে নিয়ে আসে। এ কারণে কোন প্রকার অহমিকা ও আত্মম্ভরিতা ছাড়াই সে নিজে ব্যক্তিত্ব ও মতামতকে সম্মান ও গুরুত্ব দিতে অভ্যস্ত। আর ঠিক একই কারণে সে মানুষকে

আর মানুষ তাকে ভালবাসে। আর এখানে? এখানে মানুষের কোন মূল্য নেই। যে মানুষকে আল্লাহ সম্মানিত করেছেন, ফেরেশতাদের দ্বারা সিজদাহ করিয়েছেন, আর যে মানুষ সম্পর্কে তার রব বা প্রভু বলেছেন—অলাকাদ কাররামনা বনি আদম—আমি আদমের সন্তানদেরকে সম্মানিত করেছি। মনে হচ্ছে তার অগোচরেই বিশ্বের রূপ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। যে সব স্বতসিদ্ধ বিষয় সে দেখেছে এবং শিখেছে আজ যেন সব ম্লান হয়ে গেছে, অথবা আড়ালে লুকিয়েছে। আর সে স্থান দখল করেছে এক নতুন মূল্যবোধ। সে মূল্যবোধ কতই না জঘন্য! রাগে তার ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো। যে কোন পন্থা ও যে কোন মূল্যেই এমন গ্লানিকর অবস্থার অবসান হওয়া উচিত। অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সামনে এগিয়ে সে মাঝখানে যে লোকটি বসে আছে তার কাছে গেল। মনে হচ্ছে সেই যেন তাদের মধ্যে সিনিয়র অফিসার। মাথা ঝুকিয়ে তিনি সামনের কিছু নথিপত্র দেখছেন, এমন সময় নাবিলা তার সামনে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে বললো—মাফ করবেন। সকাল থেকে আমি এখানে দাঁড়িয়ে। আমাকে কি উদ্দেশ্যে আপনারা নিয়ে এসেছেন?

বিদ্রুপপূর্ণ দু'টি চোখ তার দিকে উঠিয়ে অফিসারটি বললো—এত তাড়া কিসের?

—আমি ও একজন মানুষ। আমারও অনুভূতি এবং ব্যাথা-বেদনা আছে।

একটু মুচকি হেসে লোকটি আবারও নথি-পত্রের দিকে নজর বুলাতে শুরু করলো। নাবিলা আবারও কিছু বলতে উদ্যত হলো; কিন্তু পেছন থেকে একটি হাত তার দিকে এগিয়ে এলো এবং প্রথমে যে স্থানে দাঁড়িয়েছিল সেখানে টেনে নিয়ে গেল। মাথা ঘুরিয়ে সে সাদা জামা ও সরু পাজামা পরিহিত একটি পাতলা ছিপছিপে যুবককে দেখতে পেল। সে বললো—শৃংখলা শিখুন।

—কোন্ শৃংখলা...আহার, পানি এবং এমন কি কোন প্রকার প্রশ্নের অধিকার ছাড়াই কুকুরের মত আমাদের ফেলে রেখেছেন।

বোকার মত ব্যঙ্গভরে হেসে সে উত্তর দিলো—নিয়ম মেনে চলো, তোমার অনেক উপকারে আসবে।

মাঝখানে যে লোকটি বসেছিলো, এবার সে মাথা উঁচু করে ডাক দিলো—নাবিলা আবদুল্লাহ!

—জনাব আফেন্দী।

আমাদের কাছে রিপোর্ট এসেছে যে, তুমি নাকি বর্তমান সরকারের কঠোর সমালোচনা করে থাক, আর তোমার নাকি ধারণা দেশে প্রকৃত গণতন্ত্র নেই। আর আমাদের কাছে এ তথ্যও আছে যে, তোমার না কি—ইখওয়ানুল মুসলিমীনের সাথে অত্যন্ত সন্দেহযুক্ত সম্পর্ক রয়েছে। তাছাড়া তোমার......নাবিলা বাধা দিয়ে চিৎকার করে বলে উঠলো—মিথ্যা।

ক্রোধান্বিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে লোকটি বললো—আমাদের কাছে প্রমাণ এবং

সাক্ষীও আছে ।

—তাদের আমার সামনে নিয়ে আসুন।

—মিস নাবিলা ! আমার কথা আমি এখনো শেষ করিনি । তারপর সাক্ষী প্রমাণ ছাড়াই তোমার স্বীকারোক্তি আদায় করার দায়িত্ব আমাদের । আমার দৃঢ় বিশ্বাস 'সালওয়া আস-সাফী' নামক যে মেয়েটি সেলে তোমার সাথে ছিলো, সে তোমার পূর্ব পরিচিত.........তোমাদের পাশেই রক্ষিত গোপন মাইক্রোফনের মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের অলাপ-আলোচনা আমরা শুনেছি । আমরা বুঝতে পেরেছি, তুমি তার প্রতি অত্যন্ত সহানুভুতিশীল । আর এটাই হলো সবচেয়ে বড় প্রমাণ ।

অত্যন্ত আক্ষেপের সুরে নাবিলা বলে উঠলো—আমরা কোন্ যুগে বাস করছি ? এমনটি আর কখনো দেখিনি ।

—আমরা বিংশ শতকে বাস করছি । ব্যক্তি স্বাধীনতার দেশ খোদ আমেরিকাতেই আড়িপেতে টেলিফোনের কথা বার্তা ও গোপন আলোচনা শোনার ঘটনা অহরহই ঘটছে । তোমার সম্পর্কে আমরা সব কিছুই জেনেছি । তুমি শিক্ষিতা, তাই আমরা কথা সংক্ষিপ্ত করতে চাই । তুমি যা কিছু জান, আমাদের সাফ সাফ বল । পা দিয়ে মাটিতে মৃদু আঘাত করে নাবিলা বললো—এসব বিষয়ে, মোটকথা আমি কিছুই জানি না । ধৈর্যহারা হয়ে তদন্তকারী অফিসারটি উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো । তারপর বললো—কার কার বই পড়ে থাক ?

—হাতের কাছে যারই বই পাই পড়ে থাকি । আক্কাদ, হাকিম, তোহা হুসাইন, শওকী, হাফেজ, নাযার কুবানী, সাত্রে', দস্তয়ভস্কী প্রমুখের লেখা পড়ে থাকি ।

কিছুটা বিদ্রুপের ভঙ্গিতে তদন্তকারী অফিসার তার মাথাটি নেড়ে বললো—এই 'দস্তয়ভস্কী' কে ?

—রুশ লেখক ।

—আবার নতুন এক বিপদ । বিপ্লব পূর্ব যুগের বই পড়ে থাক......কম্যুনিষ্টদের বইও পড়ে থাক ।

—দস্তয়ভস্কীর আবির্ভাব ঘটেছিল রুশ বিপ্লবের পূর্বে ।

—তুমি দেখছি তার ইতিহাসও জান ।

—হ্যাঁ । এটা কোন অপরাধ নয় । তিনি একজন বিরাট ঔপন্যাসিক তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছিল, কিন্তু কায়সার তাকে ক্ষমা করে দেন ।

তদন্তকারী অফিসার দীর্ঘক্ষণ হো হো করে হেসে বললো—প্রভু তোমাকে কায়সারের মাধ্যমে কল্যাণ দান করুন এবং যে মুসিবতে তুমি আটকে পড়েছ তা থেকে তোমাকে নাজাত দিন । যেন ভয় পেয়েছে, এমন ভাবে নাবিলা তার দিকে তাকালো । কিন্তু সাথে সাথেই লোকটি তাকে বললো—তোমার হবি কি ?

—আমার হবি ? কি বলতে চাচ্ছেন; এটাকি রেডিও সাক্ষাতকার, না সংবাদ পত্রের রিপোর্টিং ? আমি চিত্র তারকাদের কেউ নই........!

৪—

—আমি যা জিজ্ঞেস করেছি, সেটারই উত্তর দাও।

—সাহিত্য, মিউজিক ও শরীর চর্চা আমি পছন্দ করি।

—রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোন বই পড় না ?

—খুবই কম।

—তাতো পড়বে না, কারণ তোমার ভূমিকা তো নেতিবাচক।......তুমি কি প্রেসিডেন্টের ভাষণ শুনে থাক ?

—কখনো কখনো।

—সে ভাষণ সম্পর্কে তোমার মতামত কি ?

—হাত তালি দিয়ে থাকি, তবে লোক দেখানোর জন্য নয়।

—হাত তালির কথা বলছি না, বলছি তোমার অন্তরের প্রতিক্রিয়া কেমন হয় ?

—যতক্ষণ পর্যন্ত আমার অন্তর প্রভাবিত ও সন্তুষ্ট না হয় ততক্ষণ আমি কোন ব্যাপারে হাত তালি দিই না।

—কিন্তু, তুমি মন্ত্রীদের ও সরকারের উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদের কিছু কাজ-কর্মের সমালোচনা করে থাক।

যদি এমনটি ঘটে থাকে, তবে তা কোন রাখা-ঢাকা ব্যাপার নয়। একজন ভদ্র নাগরিক হিসেবে এটা আমার অধিকার। এর উদ্দেশ্য থাকে, ব্যাপারটি যাতে উত্তমভাবে সমাধা হয়।

—আমার বিশ্বাস ছিলো, তুমি বুদ্ধিমতী এবং ব্যাপারটি তুমি স্বীকার করবে—আর তাই তুমি স্বীকার করেছো।

বিস্ময়ের সাথে নাবিলা বললো—আমি কি স্বীকার করেছি ? আমি তো কোন অপরাধ করিনি। লোকটি তার অফিস কক্ষের পিছন ভাগ থেকে উঠে দাঁড়ালো। তারপর এদিক ওদিক একটু পায়চারী করে নাবিলার দিকে এগিয়ে একটু বিপ্লবী ভঙ্গিতে বললো—

সমালোচনা ও ষড়যন্ত্রের মধ্যে একটা গভীর যোগসূত্র রয়েছে।

—আমি বুঝলাম না।

—শিগগিরই তুমি বুঝতে পারবে। জনম তকে তুমি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিয়ে যাচ্ছ, আর ধারণ করছো এটা নিছক একটি মতামত ও সমালোচনা, এটাতো রাষ্ট্রদ্রোহীতায় উৎসাহদান, যার পরিণতি হচ্ছে বিপ্লব.........আইন-শৃংখলার বিপর্যয়। ফলে দেশ জ্বলতে থাকবে। ধ্বংস ও অশান্তিতে ভরে যাবে। আর ঔপনিবেশিক তথা ইহুদী শক্তি লাভ করবে এক স্বুবর্ণ সুযোগ। দেশ যাবে রসাতলে। এখন কি বুঝতে পেরেছো—হে শিক্ষিতা সুন্দরী ? তোমরা না জাতির ভবিষ্যত বংশধরকে প্রতিপালন ও নৈতিকতা শিক্ষাদানের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছো ?

কান্না বিজড়িত কণ্ঠে নাবিলা চিৎকার করে উঠলো—তুমি যা বলছো এর কিছুই আমি চিন্তা করিনি। আল্লার নামে শপথ করে বলতে পারি, আমার নিয়ত ছিল সম্পূর্ণ সৎ।

—ভালো কথা। তবে তোমার সৎ নিয়তের উপর বিশ্বাস করে আমরা বসে থাকলে দেশ তো গোল্লায় যাবে।

—কিন্তু অন্যান্য প্রতিটি জাতিই তো তাদের সরকারের সমালোচনা করে থাকে, তাতে তো সে দেশের কিছুই হয় না।

—বর্তমানে যারা দেশ শাসন করছে তাঁরা অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও নিষ্ঠাবান লোক সুতরাং কোন ব্যাপারে তাদের সমালোচনা সঙ্গত নয়।

—এমন অধিকার আল্লাহ কাকেও দেন নি......এমন কি নবীদেরকেও।

একটু চাতুর্যপূর্ণ মুচকি হাসি হেসে লোকটি বললো—তোমার এ কথাটির ব্যাখ্যা করে বুঝাও তো।

অত্যন্ত শান্ত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে নাবিলা বলতে থাকলো—নবী (স) সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করতেন। ওহুদের যুদ্ধে শত্রুর মোকাবিলায় তিনি শহর থেকে বের হতে চাইছিলেন না, কিন্তু সাহাবীরা এ সিদ্ধান্ত না মেনে শহরের বাইরে যাবার জন্যে পীড়াপীড়ি করতে থাকলেন। অবশেষে তিনি বের হলেন। বদর যুদ্ধে তিনি কোন এক স্থানে অবতরণ করতে চাইলেন। কিন্তু সেখানে অবতরণ না করে জনৈক সাহাবীর পরামর্শক্রমে পানির কুয়োর ধারে তাঁবু গাড়লেন। এমনি ধরণের অসংখ্য ঘটনা আমি বলতে পারি।

লোকটি তার দিকে তাকিয়ে একটু ব্যঙ্গ হাসি হেসে বললো—অবিকল ইখয়ানুল মুসলিমীনের ভঙ্গিমা। আমার বিশ্বাস ছিলো, তাদের সাথে তোমার সম্পর্ক রয়েছে......এটা একটা নতুন প্রমাণ।

নাবিলা কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো—আপনারা সব ব্যাপারকে ভয়ানক মনে করেন, আর তিলকে তাল করে থাকেন।

—সন্দেহ ও অমূলক ধারণা—এ দু'টিই হচ্ছে আমাদের প্রকৃত সত্যে উপনীত হবার পথ।

নাবিলা চিৎকার করে উঠলো—আপনারা তো জীবনের সুন্দরতম জিনিসকে ধ্বংস করে ছাড়বেন।

—এটা খুবই মারাত্মক কথা। প্রশাসনের ধ্বংসাত্মক সমালোচনা?

—প্রশাসন কোথায়?

—আমরা।

নাবিলা তার সামনে প্রেসিডেন্টের বিরাট আকৃতির ঝুলন্ত ছবিটার দিকে তাকালো। এ ছবিটি হাসছে না। তিনি এখন কোথায়, নাবিলা তা কল্পনা করতে থাকে। হায়, যদি তিনি এসে একবার শুনতেন! তিনিই কি একদিন বলেননি—আমি তোমাদের মধ্যে আত্মসম্মান, ও স্বাধীনতার চেতনা সৃষ্টি করেছি। এখন হয়তো তিনি কোমল শয্যায় নিরিবিলিতে বসে কোন নতুন বই পড়ছেন, কোন সাময়িকীর পৃষ্ঠায় নজর বুলাচ্ছেন, ছেলেমেয়েদের নিয়ে হালকা রসিকতা করছেন, গুরুত্বপূর্ণ কোন সম্মেলনে বক্তৃতা করছেন অথবা কোন বিপ্লবী ফরমান জারীর

কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। এ স্থানটি এবং এ ধরণের স্থানগুলি ঘুরেফিরে স্বচক্ষে দেখার কয়েক মিনিট সময় কি আজ তাঁর হাতে নেই? একটি জিনিসের বিনিময়ে নাবিলা তার জীবন দিতে আজ সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আর তা হচ্ছে, প্রেসিডেন্টকে একটি মাত্র প্রশ্ন—আজ এখানে সালওয়া, তার নিজের ও অন্যদের সাথে যা করা হচ্ছে সে সম্পর্কে আপনার মত কি?

নাবিলা তার ক্ষোভ গোপন করতে করতে বললো—আপনারা যা করছেন, প্রেসিডেন্ট তা জানতে পেলে, আপনাদের প্রতি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

—তুমি নিশ্চিত থাক……তিনি সবই অবগত। আমরা তো কেবল তারই কর্ম পদ্ধতির বাস্তবায়নকারী।

—আমি বিশ্বাস করি না।

—আমরা তার কাছে প্রতিদিন রিপোর্ট পেশ করে থাকি। যে সফলতা দেখতে পাচ্ছ তার মূল রহস্য হলো, সরকারী নির্দেশকে বাস্তবায়নে আমাদের কর্তব্য-নিষ্ঠা। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমরা তো সৈনিকই।

নাবিলা অনুভব করলো, তার যেন কণ্ঠরোধ হয়ে আসছে, অতি কষ্টে সে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে থাকলো। তার শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত বইতে শুরু করলো এবং চোখ অন্ধকার হয়ে আসলো। মাথা ঘুরে উঠলো এবং মাটিতে পড়ে যাবার উপক্রম হলো। এমন সময় সে বাইরে, একটা শোরগোল শুনতে পেল। ইয়া আল্লাহ্! এটা স্বপ্ন না বাস্তব? সে তার কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছে। এটা যেন আল্লার অনুগ্রহ… এ তো! উতওয়া আল-মালওয়ানীর কণ্ঠস্বর।

—এটা কেমনতরো ফাযলামী? সম্পূর্ণ বানোয়াট একটা রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে ঐ ছোট লোকটি তোমাদের নিয়ে আমার বাগদত্তাকে গ্রেফতার পর্যন্ত করেছে? আল্লার কসম! যা কিছু ঘটেছে, সবই আমি প্রেসিডেন্টকে জানাবো।

নাবিলা বিবর্ণ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থরথর করে কাঁপছিল, তার শ্বাস-প্রশ্বাস দ্রুত উঠানামা করছিলো, আর দু'চোখ বেয়ে অবিরত অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিলো। আবেগে নাবিলা উচ্চ স্বরে কেঁদে ফেললো। এ সময় সে শুনতে পেল, উতওয়া বলছে—প্রিয়া, তুমি এখানে? শিগগিরই আমি এর প্রতিকার করবো। এই জানোয়ারদেরকে এমন শিক্ষা দেব যা তারা জীবনে ভুলবে না।

উতওয়া তার বাহু দু'টি উন্মুক্ত করে নাবিলার দিকে কিছুটা এগিয়ে গেল। মুহূর্তের মধ্যেই নাবিলা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে তার বাহুবেষ্টনীতে ধরা দিলো। উতওয়া তার চুলে হাত বুলাতে বুলাতে তার চোখের পানি মুছে দিতে লাগলো। আর তার সকল ক্রোধের ছাপ মুখমণ্ডলে ফুটিয়ে তুলে নাবিলার দু'গণ্ডে চুমো দিলো।

—প্রিয়া, তুমি অস্থির হয়ো না। বেলা একটার দিকে তোমাদের বাড়ীর লোকেরা আমাকে ব্যাপারটি জানায়—বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ব্যাপারটি তাদের জানান। সকাল থেকে দুপুরের পর পর্যন্ত আমি খুবই ব্যাস্ত ছিলাম। তাই আসতে দেরী হয়ে গেছে।

—উতওয়া ! তারা আমার সাথে অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করেছে—অসৌজন্যমূলক আচরণ করেছে, খুবই অভদ্র ব্যবহার করেছে। আমাদের এ পবিত্র ভূমিতে এমনটি ঘটতে পারে তা আমি বিশ্বাসই করতে পারিনে।

কিছুটা বিস্ময়ের সাথে উতওয়া বললো—তুমি আমার বাগদত্তা, এ কথা কেন তাদের জানালে না ?

—তাদের বলেছি, কিন্তু তারা কোন গুরুত্ব দেয়নি।

ব্যাপারটি যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও মারাত্মক হয়েছে এমন ভাব প্রকাশ করে তদন্ত অফিসার বললো—স্যার ! আমরা জানতাম না।

—তোমাদের এর জন্য কঠিন মূল্য দিতে হবে। একথা বলতে বলতে উতওয়া মাথা ঝাঁকালো। এরপর নাবিলার একটি হাত ধরে বললো—এসো !

—উতওয়া ! আমরা কি শিগগিরই বের হবো ?

—নিশ্চয়, নিশ্চয়। এই যে কুকুরগুলিকে তুমি দেখলে, তাদের জেলে ঢোকানোর ক্ষমতা আমার আছে। তবে তোমার মর্যাদা সম্পর্কে যদি তারা অজ্ঞ থাকে, তাহলে ভিন্ন কথা।

রাগত স্বরে নাবিলা বললো—আমার সম্পর্কে তারা কি ভাবে জানবে, তারা তো এ কথাই জানে না যে, আমি তোমার বাগদত্তা ?

—ওগো কুমারী ! আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আমি আমার অপরাধ স্বীকার করছি।

অনেক দূরে কোন কিছুর প্রতি তাকিয়ে নাবিলা বললো—এ কথার অর্থতো এই, যদি আমি তোমার বাগদত্তা না হতাম, তা হলে তারা আমাকে অন্ধকারে নিক্ষেপ করতো। উতওয়া বললো—অবশ্যই।

—এটা কি জুলুম নয় ?

—প্রিয়া ! অধৈর্য হয়ো না। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিধানের জন্য যদি কিছু ভুল ত্রুটি হয়ে যায়, আমাদের উচিত তা ক্ষমা করা। সম্মানের দৃষ্টিতে এবং সৎ নিয়তে তা দেখা দরকার। তবে আমি নিশ্চিতভাবে বলছি, তুমি যে দুর্ভোগের মুখোমুখি হয়েছো, তার বিনিময়ে তুমি লাভ করবে বরং তার চেয়ে অনেক বেশী। এসো।

এরপর উতওয়া তদন্তকারী অফিসারটির সামনে একটা চিরকুট ছুড়ে দিলো। যা তাকে সাধারণ গোয়েন্দা বিভাগের ডিরেক্টরের কাছে নাবিলাকে ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে কৈফিয়তের হাত থেকে বাঁচাবে। নাবিলা চলেছে উতওয়ার পাশাপাশি। তার চিন্তা-চেতনায় প্রাচীন প্রবাদের একটি বাক্য ধ্বনিত হয়ে উঠছে—'দাখেলুহু মাফকুদুন ওয়াল খারেজু মিনহু মাওলুদুন।—'ভিতরে যারা প্রবেশ করেছে তারা হারিয়ে গেছে, যারা বেরিয়ে এসেছে তারা লাভ করেছে নবজীবন।' সে স্মরণ করছে সালওয়াকে। হতভাগিনী এ মুহূর্তে তো আশ্রয় নিয়েছে অন্ধকার, ভীতি ও শঙ্কার মধ্যে। তার সাথে যে আচরণ তারা করছে, সে তা যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে।

নাবিলার ভালোবাসা আর মমতাভরা এক বিন্দু অমূল্য অশ্রু তার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়লো।

৮

উতওয়া বেগ তার ব্যক্তিগত গাড়ীতে নাবিলার পাশে বসে। রাতের মৃদু মন্দ বাতাস নাবিলার চিন্তাক্লিষ্ট আর বিমর্ষ চেহারার ওপর পরশ বুলিয়ে যাচ্ছে। উতওয়া অত্যন্ত আস্থার সাথে দ্রুত গতিতে গাড়ী চালাচ্ছে। একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তার দেহ, বয়স ও পদমর্যাদা অপেক্ষা তার ক্ষমতা অনেক বেশী। চলন্ত গাড়ীর চাকার ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে বিলীন হয়ে যাচিছল। উতওয়া বলতে লাগলো—ঘটনাটি জেনে আমি ব্যথা পেয়েছি। গত সপ্তাহে একজন মন্ত্রীর ভাগ্নের ব্যাপারেও এরূপ ঘটনা ঘটেছে। আর প্রায় এক মাস হয়ে গেল প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর উপদেষ্টা আমেরের অফিসের একজন উচ্চ পদস্থ অফি-সারের ভাইকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাছাড়া 'আহরাম' পত্রিকার চীফ এডি-টর হায়কলের সহযোগী একজন সাংবাদিককেও গ্রেফতার করা হয়েছে। হায়কল এমন এক ব্যক্তি যার ভীষণ প্রভাব-প্রতিপত্তি! এমন ধরণের অসংখ্য ঘটনা প্রতি-দিনই ঘটছে। সমাজের গতিবিধির ওপর রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সংস্থার পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে, যাতে শান্তি-শৃংখলা বজায় থাকে। আমি তোমার নামে গোয়েন্দা বিভাগে এক বিরাট ফাইল আছে বলে জেনেছি।

ঘৃণার স্বরে নাবিলা বললো—এসব ঘটনা শুনে আমার গভীর বিশ্বাস জন্মেছে যে, সেখানে আরো বহু মজলুম রয়েছে।

—একথা আর কারো সামনে বলবে না। এমনকি আমার সামনেও না।

—আমি তো নেহাত সত্যি কথাই বলছি।

—তোমার মুক্তির জন্য আল্লার শুকরিয়া আদায় কর।

—সারাজীবনেও আমি আর শান্তি পাবো না।

উতওয়া তার ডান হাতটি বাড়িয়ে অত্যন্ত আদুরে ভঙ্গিতে নাবিলার গলা জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলো—

আমি যতক্ষণ তোমার পাশে আছি, কাউকেই আর ভয় করতে হবে না। আমার নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা যে কতখানি তা প্রেসিডেণ্ট জানেন। এ কারণে আমার কোন আবেদনই তিনি ফেলবেন না। আমি এককভাবে উন্নতির দ্বার প্রান্তে পৌঁছে গেছি।

অশ্রুভরা চোখে নাবিলা ডাকলো—উতওয়া।

—প্রিয়া!

—তুমি কি সালওয়াকে কোন সাহায্য করতে পার?

—সালওয়া কে?

সালওয়ার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি—জিন্দাখানার অন্ধকার সেলে বসে তার সম্পর্কে যতটুকু সে জেনেছিলো, নাবিলা তা বললো, আর উতওয়া মাথা নেড়ে নেড়ে তা শুনলো। অবশেষে উতওয়া বললো—তোমার উচিত তাকে ভুলে যাওয়া।

—কেমন করে?

—একটি ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট কোন মাধ্যম বা শুপারিশ গ্রহণ করবেন না। তা হচ্ছে আল ইখওয়ানুল মুসলিমীন সম্পর্কিত কোন বিষয়।

নাবিলা তার দিকে ফিরে গুরুত্ব দিয়ে বললো—আচ্ছা এসব কিছু তিনি কি বিস্তারিতভাবে জানেন?

—অবশ্যই। তাঁর আদেশকে যে লংঘন করে অথবা সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক তৎপরতার গণ্ডী থেকে বাইরে চলে যায়, বিতাড়ন ও লাঞ্ছনা ছাড়া তার আর কোন শাস্তিই হতে পারে না। সামান্য একটু ভুল অথবা সামান্য একটু অপমান কখনো কখনো ভয়ংকর বিপদ ডেকে আনে। এটা তাঁর জীবন, আর তার ভবিষ্যৎ বিপ্লব ও জাতির স্বার্থের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

কিছুটা বিস্ময়ের সুরে নাবিলা বললো—কিন্তু তিনি তো একজন ব্যক্তিমাত্র।

—এমন বিপদজনক কথা বালা না। তোমার হাত-পায়ের আঙ্গুলগুলি কি সমান?

কিছুক্ষণ চুপ থেকে নাবিলা আবার বললো—খলিফা ওমর রাতে রাস্তার গাছতলায় ঘুমোতেন।

এ জন্যই তো লোকেরা তাকে হত্যা করেছে, আমিও ইতিহাস কিছু জানি, বুঝলে?

—কিন্তু তিনি তাঁর বিচিক্ষণতা ও ন্যায়পরায়নতার জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন—হ্যাঁ, তার প্রেম-প্রীতি ও সভ্যতায় পৃথিবীকে করে তুলেছেন পরিপূর্ণ।

দ্রুত গতিতে গাড়ী ছুটে চলছে। উতওয়া সিগারেটে আগুন ধরাতে ধরাতে বললো—এ জন্যই ইসলামী ইতিহাসের পাঠ্যসূচী পরিবর্তনের সুপারিশ করে একজন Expart একটি রিপোর্ট প্রেসিডেন্টের কাছে পেশ করেছে। পূর্বে আমি বিষয়টি ভালোভাবে বুঝিনি...কিন্তু এখন বুঝলাম, এটা সঠিক চিন্তা নিঃসন্দেহে।

আবার সালওয়ার কথা উল্লেখ করে নাবিলা বললো—কিন্তু সালওয়া বেচারী তো নির্দোষ। তার স্বামী হয়তো আসামী...কিন্তু সালওয়ার দোষটা কোথায়?

—স্বামীর ওপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য সালওয়া হচ্ছে একটি মাধ্যম। এছাড়া তারা আর কি করতে পারে?

—লা তাযেরু ওয়াযেরাতুন উয্‌যিরা উখরা—'একজনের অপরাধের শাস্তি অন্যজন ভোগ করবে না।' আল্লাহ তাঁর কিতাবে এই রকমই তো বলেছেন। তোমরা কি কোরআনের আয়াত পরিবর্তনেরও চেষ্টা করছো যেমনটি করেছো ইতিহাস ও ইতিহাসের ঘটনাবলীর পাঠ্যসূচীর ক্ষেত্রে?

—প্রিয়তমা! দ্বীনকে ইখওয়ানরা যতটুকু বুঝে থাকে আমরা তার থেকে খুব ভালোই বুঝি...বিশ্বাস কর আমাকে।

নাবিলার মাথার ভিতর ঘুরপাক খাচ্ছে অনেক জিনিস। ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে সব। যেভাবে উচিত সে ভাবে সে যেন জীবনকে বুঝতে পারেনি। এটা কতবড় অমনোযোগিতা তার। আকাশ-কুসুম কল্পনায় আর চিন্তা-ভাবনায় বিগত দিন গুলি তার কেটে গেছে। কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হতেই সে অমনোযোগিতা তার আর রইল না।...সে একটু একাকী থাকতে চায়...সবকিছু সম্পর্কে নতুন করে চিন্তা করতে চায়। অতীতের তার সকল রঙীন স্বপ্ন বিক্ষিপ্ত ও টলে গেছে...মানসিক অশান্তির যে দাবানল তার অভ্যন্তরে সর্বক্ষণ জ্বলছে তাতে সেই স্বপ্নগুলি বিগলিত হয়ে গেছে। আইন মিথ্যা। ন্যায়বিচার? সে এক অলীক কাহিনী মাত্র, সুন্দর সুন্দর চিরন্তন মূল্যবোধগুলিকে বেদনাদায়ক বাস্তবতা শুধু মিথ্যায় পরিণত করেছে। সে মহা মিথ্যার ছায়াতলে সমগ্র জাতির কি বেঁচে থাকা সম্ভব? আর কত দিন বাঁচতে পারে? বিরাট ধোকাবাজীর মধ্যে কি ভাবেই বা তারা হাততালি, আনন্দ-উল্লাস এবং গানের পংক্তি আওড়াতে পারে? জীবনের প্রতি নাবিলার ভীষণ বিরক্তি ধরে গেছে। এমন কঠোর বিরক্তি, জীবনের প্রতি যেমন অতীতে ছিল তার গভীর ভালোবাসা। একটি দিনের মাত্র কয়েকটি ঘণ্টা তাকে সম্পূর্ণ নতুন মানুষে রূপান্তরিত করেছে। সে চিন্তা করছে, সেই সব হতভাগ্যদের মাথায় কি সব চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে যারা বছরের পর বছর শাস্তি ও ভীতির মধ্যে কাটাচ্ছে...তাদের জীবন কি ভাবে দীর্ঘায়িত হচ্ছে... তারা কি খায়-দায়, পান করে এবং হাসে? এই ক'টি ঘণ্টা তার অন্তরে যে ধ্বংসের সৃষ্টি করেছে তা যে কত বড় ভয়াবহ যেন তা সে বিশ্বাসই করতে পারে না। এটা যেন তাদের কথিত বোমার ন্যায় কিছুটা, যা তার চিন্তা ও স্বপ্নগুলিকে আলোকিত করে তুলে পুনরায় তা ঘৃণা, প্রত্যাখ্যান ও হিংসার এক বিরাট শক্তিতে রূপান্তরিত করেছে। নিজেকে সে একজন স্ত্রী হিসেবে চিন্তা করছে... কিন্তু সে কি প্রসব করবে। বিতাড়িত ভবঘুরে ও বিধ্বংস বংশধরদের একটা অংশ! এ ছাড়া সে তো আর কিছুই প্রসব করবে না। তারা জগতে কোন সভ্যতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে না। এমন একটি কদাকার জীবন তারা রচনা করবে যা অসংখ্য ফোসকা ও ক্ষতে পরিপূর্ণ থাকবে।

নাবিলা শুনতে পেল, উতওয়া বলছে—নাবিলা! খুব শিগগিরই আমরা একটি আনন্দময় রাত্রি যাপন করবো যা তোমার সকল দুশ্চিন্তা ভুলিয়ে দেবে।

সাপে কাটা ব্যক্তির ন্যায় নাবিলা বলে উঠলো—আমি?

—তুমি ও আমি।

—আমি অসুস্থ।

—একটি মাত্র পিয়ালাই তোমার প্রাণ চঞ্চলতা ও ফুর্তি ফিরিয়ে আনবে প্রিয়া।

—আমি পান করি না।

আমার জন্যই করবে...তোমার কাছ থেকে যে ধন্যবাদ আশা করি এটাই হবে সেই ধন্যবাদ।

নাবিলা কেঁদে উঠলো এবং ফোঁপাতে থাকলো। বিস্ময়ের দৃষ্টিতে উতওয়া তার দিকে তাকিয়ে বললো—কি হয়েছে?

—তুমি তো আমার কথা জান না।

—কি এমন ঘটেছে? এ তো কেবল একটু অভিজ্ঞতা অর্জন, যা দ্বারা আমরা উভয়েই উপকৃত হবো।

—একটি রাত, না আমি কোন কিছুর উপযুক্ত নই……তোমার কাছে আশা করবো……নিজেকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে আমাকে সুযোগ দাও… আমি মানুসিক দিক দিয়ে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক……একমাত্র আল্লাহ্ই তা জানেন। তা ছাড়া একথা তোমার ভোলা উচিৎ নয় যে, গোটা পরিবার এখন আমার প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছে।

উতওয়া গাড়ীর গতি আরো বাড়িয়ে দিলো। প্রশস্ত রাস্তায় হাওয়ার গতিতে গাড়ী ছুটে চলেছে, আর সে রাগে দুঃখে ফুসছে। তারপর হিংস্র ও ক্ষুধার্ত নেকড়ের ন্যায় বিড় বিড় করে বললো—তোমার কাছ থেকে এমন আচরণ? তাদের দাঁত থেকে তোমাকে ছাড়িয়ে আনার প্রতিদান কি এই?

নাবিলা তার একটি হাত উতওয়ার কাঁধের উপর রেখে অত্যন্ত নরম ভাবে বললো—উতওয়া! তুমি জান না আমি তোমাকে কত ভালোবাসি। যখন তুমি এখানে অনুসন্ধান কক্ষে প্রবেশ করলে তখন আমি নিজেকে যে কতখানি সৌভাগ্য-বতী মনে করলাম তা বর্ণনাতীত। সেখানে তোমার আবির্ভাব ছিলো একজন ফেরেস্তার ন্যায়, যাকে আল্লাহতায়ালা আমার মুক্তির জন্য পাঠিয়েছেন। আমি যেন জন-মানব, পানি ও লতা-গুল্মহীন ভীতিপ্রদ এক প্রান্তরে ধ্বংসের মুখোমুখী ছিলাম, আমার উৎপীড়িত আত্মায় তোমার কথা যেন শীতল ও শান্তির পরশ নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিল। সত্যিই বলছি, সেখানে তোমার আগমন একটি মু'জিযা মনে হয়েছিল। তাই তোমার সাথে সুন্দর আচরণই আমার কাম্য।

নাবিলাদের বাড়ির গেটে এসে গাড়ীটি থামলো। বুড়ো তড়ি ঘড়ি করে এগিয়ে এলেন। গিরে-গাঁটে বাতে আক্রান্ত মা ও আসতে গিয়ে থেমে গেলেন। ছোট ছোট ভাই-বোন,ভাইপো ভাইজীরা আনন্দে গাইতে গাইতে এলো—

আবালাহ……আবালাহ নাবিলা—'শিক্ষায়িত্রী শিক্ষায়িত্রী নাবিলাহ।'

সে তার মাকে কাঁদতে কাঁদতে জড়িয়ে ধরলো। আববার হাতে চুমা দিতে গিয়ে চোখের পানিতে ভাসিয়ে দিলো! ছোট ছোট বাচ্চাদের বাহু বন্ধনে নিয়ে এলো, চোখের পানিতে প্লাবিত গণ্ডদ্বয় তাদের মাথার ওপর ঘষতে থাকলো। তারপর ক্ষোভে, দুঃখে জোরে জোরে কাঁদতে লাগলো।

উতওয়া এগিয়ে গিয়ে তার একটি হাত শক্তভাবে ধরে বলতে লাগলো—এ সব তুমি কি করছো? আশে-পাশের দরজা জানালাগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখ…… অহেতুক মেয়েরা উকি মারছে আমাদের জন্য যা সুবিধে জনক নয়।

এরপর নাবিলা পিতার দিকে ফিরে বললো—চাচাজান! একমাত্র আপনিই

আমাকে ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম। যা ঘটেছে তা আর কাউকে জানানো ঠিক হবে না। ব্যাপারটি জানাজানি হয়ে গেলে বহু রাজনৈতিক সমস্যা মাথাচাড়া দিয়ে উঠবে। যা কিছু ঘটেছে সে সম্পর্কে নাবিলার একটি কথাও বলা আমাদের কারো জন্য কল্যাণকর হবে না। এখানেই ব্যাপারটি শেষ হয়ে যাওয়া উচিৎ। যেন কোন কিছুই ঘটেনি এমনি ভাবে চেপে যাওয়া দরকার।

মাথার সমস্ত চুল পেকে যাওয়া বৃদ্ধ লোকটি উতওয়ার কথা মেনে নিলেন এবং মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন-এটাই বুদ্ধির কথা, এটাই ঠিক।

এরপর উতওয়া তার চেহারায় বিজয় ও আত্মপ্রত্যয়ের হাসি ফুটিয়ে নাবিলার হাতটি ধরে দরদের সাথে বললো—বুঝেছ প্রিয়া?

—বুঝেছি—বলে নাবিলা মাথা ঝাঁকালো।

—নাবিলা! আগামীকাল আবার দেখা হবে।

হতভম্বের মত নাবিলা তার দিকে তাকালো। সে তখন চিন্তা করছিলো অনুসন্ধান কক্ষের সুদৃশ্য অফিসের সেই কালো পিলারটির পাশে গুটি-শুটি মেরে পড়ে থাকা সালওয়া সাফীর কথা। আরো চিন্তা করছিলো সেই সব আহাম্মক লোকগুলির কথা, যারা করুণা ও ভালোবাসা কি তা জানে না। এ সব লোকদের মা, বাবা, স্ত্রী, সন্তান ও বন্ধু-বান্ধব থাকা কি সম্ভব? তাদের মাথার উপর প্রেসি-ডেন্টের ঝুলানো ছবি। সে ছবি ভোজভাজীর নায়কের দাম্ভিক অহংকারই প্রকাশ করছে। নাবিলার মাথা ঘুরছে। আগন্তুকদের কথাবার্তা তার কানকে বধির করার উপক্রম করছে। কর্কশও দীর্ঘ হাততালি তার শরীরের তামাম গোপন শিরা-উপশিরাগুলিকে যেন অকেজো করে দিচ্ছে। অকস্মাৎ সবার সামনে মাটিতে পড়ে গেল সে। কিছুই জানতে পারলো না। তারা ধরা-ধরি করে তাকে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গেল।

ভয়ে তার মা হাউ-মাউ করে বলতে লাগলো—তারা এর সাথে কেমন জঘণ্য আচরণ করেছে? ডাক্তার দেখাও......আমার মেয়ে আমার স্নেহের মেয়ে.......!

—এটা তার জন্য মঙ্গলজনক হবে না। যে সন্দেহ তার প্রতি আরোপ করা হয়েছে তা খুবই শক্তিশালী......অতএব তাকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিন ডাক্তার বা অন্য কাউকে দেখানোর দরকার নেই।

নাবিলার মা যাকিয়া তার এক নাতির কাঁধে ভর দিয়ে উতওয়ার নিকটে এসে প্রশ্ন করলো—বেটা! কোন সন্দেহের কথা বলছো? সবই ত পুলিশের বানোয়াট।

এক হাতের তালু দিয়ে অন্য হাতে থাপ্পর মেরে উতওয়া বললো—কী মুশকিল! আম্মা আমাকে বুঝার চেষ্টা করুন......এটা রাজনৈতিক ব্যাপার, রাষ্ট্রের নিরাপত্তার সাথে জড়িত......।

মহিলাটি ভয়ে নিজের বুকে আঘাত করে স্বগতোক্তির মত বললো—রাজনীতি? আমার মেয়ে নাবিলা? অসম্ভব।

একান্ত অসহায় ভাবে উতওয়া মায়ের দিকে তাকিয়ে বললো— আল্লাহু ইয়াতুলুকে ইয়া রুহু— আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবি করুন।

সবাই ধরাধরি করে নাবিলাকে ভিতরে নিয়ে গেল। তার দেহটি যেন একটি কাষ্ঠ খণ্ড। সে এমন শব্দ করছিল যা ব্যথা ও দয়ার উদ্রেক করে। শক্তভাবে সে তার হাত দু'খানি মুষ্টিবদ্ধ করে রেখেছিল, কেউ খুলতে পারছিল না। তার মুখ দিয়ে এক প্রকার সাদা ফেনা বাহির হচ্ছিল। উতওয়া তার দুটি বোঁজা চোখ, দু'টি মিলিত ঠোঁট, স্ফীত বুক ও সাদা বালিশের ওপর ছড়িয়ে পড়া চুলের দিকে তাকালো। অত্যন্ত দুঃখজনক সময় সত্ত্বেও তার অতুলনীয় সৌন্দর্য যেন সে গিলতে থাকলো। তারপর একটু ঝুকে পড়ে অত্যন্ত দরদের সাথে তার কপালে একটু চুমো দিয়ে বললো—শিগগিরই আপনারা তাকে সুস্থ দেখেতে পাবেন। তাড়াতাড়ি সে সুস্থ হয়ে উঠবে। বাতি নিভিয়ে দিয়ে নিরিবিলিতে ঘুমাতে দিন তাকে। এটা সাময়িক একটা অচেতন ভাব, কিছুটা বিশ্রাম নিলেই নার্ভগুলি স্বাভাবিক হয়ে যাবে......সামরিক কারাগারে প্রতিদিনই আমি এ ধরনের অবস্থা বহু দেখে থাকি......যদি আমার কাছে সেই ইনজেকশনটি থাকতো তাহলে ব্যাপারটি কয়েক মুহুর্তেই শেষ হয়ে যেত। এতক্ষণে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতো। টেলিফোনে খোঁজ নিব......যদি কোন জরুরী কাজ না থাকে তাহলে আপনাদের সাথেই আজ রাত কাটাবো।

উতওয়ার যাওয়ার পর পরই যখন গাড়ী ঘোরানোর শব্দ শুনতে পাওয়া গেল তখনই সাইয়্যেদাহ যাকিরা বলে উঠলেন— শিগগিরই তোমরা ডাক্তার ডাক।

দ্বিধার সাথে পিতা বললেন—যাকিয়া, তুমি কি উতওয়ার কথা শোননি?

—এই উতওয়া কে?

—যে তোমার মেয়েকে জেল থেকে ছাড়িয়ে এনেছে।

—আমার মেয়ে তো আগে বাঁচুক।

—এটা রাজনৈতিক ব্যাপার, কতদুর গড়াবে তা তুমি জান না।

মা রাগে চিৎকার করে বলে উঠলো—অভিশপ্ত! সরকারের চৌদ্দগোষ্ঠী।

—তোমার গলার স্বর একটু নীচু করো, নইলে আমরা মুসিবতে পড়বো।

—এর থেকেও বড় মুসিবত কি আর আছে? আমি এখনি ডাক্তার ডাকবো, যা হয় হবে।

তিনি উঠে ধীর গতিতে টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি যে বাতের ব্যাথার দরুণ বসে ছিলেন তা যেন ভুলেই গেলেন। বাড়ীর অন্যান্য সকলেই তাকে সমর্থন করলো তবে বাবা কিছুটা বিরোধিতা করলেও মনে মনে ভীষণ স্বস্তি পাচ্ছিলেন। ততক্ষণে টেলিফোনের রিং ঘোরাতে শুরু করেছেন নাবিলার মা।

ডাঃ সালেম বললেন – নার্ভের দুর্বলতার জন্যেই এটা হয়েছে আর এগুলি কষে যাবার কারণেই সে জ্ঞান হারাচ্ছে। মনে হয়, সে কোন মানসিক শাস্তি ভোগ করছে। কম পক্ষে দু'সপ্তাহ পূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন। ভালো হয়, পূর্ণ সুস্থ না

হওয়া পর্যন্ত কায়রো ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেলে। কিছুটা দুশ্চিন্তাহীনতা অথবা নিরিবিলি স্থান এবং ভিটামিনের কয়েকটি টেবলেটই এর ঔষধ। আর খাদ্য খাবারের দিকে গুরুত্ব সহকারে লক্ষ্য রাখবেন।

নাবিলার চেহারায় কিছুটা সুস্থতার ভাব দেখা গেল। সে বিছানায় উঠে বললো -আমার সাথে যা কিছু করা হয়েছে সব কিছুরই বর্ণনা দিয়ে একটি চিঠি লিখবো প্রেসিডেণ্টকে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এ সব কুকুর ঐ সকল দুঃখজনক ঘটনার সঠিক তথ্য তার থেকে গোপন করে।

শান্তভাবে তার আব্বা বললেন—বেটি! শান্ত হও! আরো সমস্যা বাড়িয়ো না। যা কিছু ঘটেছে তার জন্য আল্লার শোকর। যা চলে গেছে তা ভুলে গিয়ে আমরা আমাদের দরজা-জানালা বন্ধ করে বসে থাকবো।

নাবিলা বারবার বলতে থাকলো—আমি ভুলতে পারিনা, যা হয় হবে।

নাবিলার মা বললো—বেটি! আমি বুঝতে পারছি তুমি অত্যাচারিত। আমার অন্তরই তা বলছে। তবে প্রেসিডেণ্ট কিছুই করবেন না তোমার জন্য। এরা তো তার বিশ্বস্ত কুকুরের পাল।

নাবিলার আব্বা আবদুল্লাহ রাগে চিৎকার করে উঠলেন। বললেন—তোমরা কি চুপ করবে? এসব কথা দ্বারা আমাদের ওপর মুসিবত ডেকে আনছো! আমার মত বৃদ্ধের ওপর কি তোমাদের আস্থা আছে? দীর্ঘ জীবনআমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে...অনেক কিছু আমি দেখেছি...যাকিয়া...আমার কথা বুঝতে চেষ্টা করো।

ডাক্তার আবার নাবিলার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন—তোমার যা ইচ্ছা হয় তা লিখতে পার। তারপর তার বাবার দিকে ফিরে বললেন—এই লেখা তার অনেক দুঃখ ও দুর্বলতা দুর করে দেবে, এটাও চিকিৎসার একটা অংশ।

তার আব্বা প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বলে উঠলেন—বই পড়বে, রেডিওতে গান বাজনা ও ধারাবাহিক নাটক শুনবে, এগুলি যথেষ্ট নয়?

বিছানা থেকে নাবিলা উঠে লাইব্রেরীর দিকে দ্রুত চলতে শুরু করলো। তারপর বই পুস্তক উঠিয়ে উঠিয়ে জানালা দিয়ে বাইরে নিক্ষেপ করতে লাগলো। তার আব্বা তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে তাকে ঠেকাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। তখন ডাক্তার বললেন—তাকে ছেড়ে দিন।

নাবিলা তার কাজ শেষ করে বিছানায় এসে হাঁফাতে লাগলো। ডাক্তার সালেম তাকে প্রশ্ন করলেন—এমনটি করলে কেন?

—এসব বই-পুস্তকে বহু ছল-চাতুরী, ধোকাবাজী, মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা রয়েছে। বাস্তবের কোন কিছুই এতে নেই।

ডাক্তার একটু মুচকি হেসে একটা ছোট ইনজেকশনের শিরিঞ্জ বের করলেন। তারপর নাবিলার বাহুর ওপরের দিকের কাপড় সরিয়ে পিছনের দিক থেকে মাংস পেশীতে সুচ ঢুকিয়ে বলতে লাগলেন—তোমার একথার সাথে আমি একমত নই।

অনেক রুচিবান ভদ্র লেখকও আছেন যাদের বইতে বহু সত্যি কথাও আছে। আচ্ছা, তোমার মাসহাফ অর্থাৎ কুরআন আছে?

অবাক দৃষ্টিতে নাবিলা তার দিকে তাকালো। তারপর জামার আস্তিন গোটাতে গোটাতে অনুচ্চস্বরে বললো—না।

ডাক্তার তার কোটের পকেট থেকে একখানি ছোট সাইজের মাসহাফ বের করে বললো—আমার কাছ থেকে এটা হাদিয়া স্বরূপ গ্রহণ কর।

নাবিলা কম্পিত হাতে তা গ্রহণ করলো, তারপর চোখের কাছে উঠিয়ে নিয়ে পড়তে থাকলো। ভক্তি সহকারে চুমু খেল। কিছুক্ষণ এরকম করতে থাকলো। তারপর সে ডাক্তারের দিকে তাকালো। আর তার মলিন চেহারাকে একটু মুচকি হাসি দিয়ে দীপ্তময় করে বললো—ইখওয়ান থেকে সতর্ক থাকবেন।

ইখওয়ানের কয়েক শো বছর আগে থেকেই কুরআন রয়েছে। এ কারো একক সম্পদ নয়, এতো কিতাবুল্লাহ। এ গ্রন্থ সকল মুসলিম তথা সমগ্র মানব জাতির সম্পদ। ব্যাগ বন্ধ করতে করতে সর্বশেষে ডাক্তার বললেন—শুধুমাত্র তোমার ঈমানই খুব শিগগির তোমাকে সুস্থ করে তুলবে। দুনিয়ার যাবতীয় টেবলেট থেকে তা উত্তম।

কাছের টেবিলের ওপর পবিত্র গ্রন্থখানি রেখে দিয়ে নাবিলা বললো— ডাক্তার! আপনার ঈমান কি কখনো আন্দোলিত হয় না?

একটু হেসে ডাক্তার সালেম বললেন—অনেক সময় এমনটি ঘটে বৈ কি!

—সত্যি?

—অবশ্যই........আমরা নবী নই।

—কেন?

—কেননা, মানুষতো কতগুলি মানসিক অবস্থার সমষ্টি। কখনো দুর্বল আবার কখনো শক্তিশালী, কখনো আশাবাদী আবার কখনো নিরাশ। আমাদের আছে সীমিত শক্তি। আমাদের জীবন তো উত্থান-পতনের নির্দিষ্ট রেখায় সমর্পিত। আমাদের উচিত দুর্বলতা আর পতনকে একেবারেই এড়িয়ে চলা। এ জন্যেই পরীক্ষা আর ধৈর্য। আর এ কারণেই জান্নাত ও জাহান্নামের সৃষ্টি।

—আমি আগামী কালই আবার স্কুলে যাব। একথা বলতে বলতে শয্যা থেকে লাফিয়ে উঠলো নাবিলা।

—আমার নির্দেশগুলো যথাযথভাবে পালন করা উচিত হবে।

—তবে আমি আমার নিজের সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। এখন আমি খুবই ভালো।

—তোমার স্মরণ রাখতে হবে, আমি একজন স্পেশালিষ্ট। আর জ্ঞানীদের কাছে অভিজ্ঞদের মতামত গৃহীত হয়ে থাকে।

—আপনার কথা সত্য। একথা বলতে বলতে নাবিলা মাথা ঝাঁকালো।

ডাক্তার আরো বললেন—বিশ্রামের সময় তুমি তো আবার চিন্তা করতে আরম্ভ করবে। তোমার মস্তিস্কের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আন। মনে রাখবে, ধৈর্য ও সহনশীলতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করা ইবাদত মনে করে, সে সৌভাগ্যবান এবং তার অন্তর শান্তি লাভ করে। আর যারা এটাকে কয়েদ ও বন্ধন

মনে করে তারা তাড়াতাড়িই রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। কথার মর্ম বুঝতে পারছো?

নাবিলা আনন্দে মাথা দুলিয়ে বললো—হ্যাঁ।

—এবার তাহলে অনুমতি দাও।

খুব নরমভাবে নাবিলা বললো—আপনাকে আবার পাব তো?

—ইনশাআল্লাহ। চিকিৎসা উপলক্ষে তোমার সাক্ষাত আমাকে সৌভাগ্যবান করবে।

—মাআস সালামাহ্—যাত্রা শুভ হোক।

ডাক্তার সালেমের প্রস্থানের পরই নাবিলা তার জায়গায় বসতে বসতে বললো—আমি ক্ষুধার্ত। একটা করুণ সুরের গান শুনতে চাই। তোমরা গিয়ে আমার নিক্ষিপ্ত বইগুলি কুড়িয়ে এনে তুলে রাখ। আগামীকাল সকালেই আমি ইসকানদিরিয়ায় যাব। একজনকে আমার সংগে চাই আর আমার অবস্থানস্থল সম্পর্কে কাকেও কিছু বলবে না।

পরদিন নাবিলার যাত্রা সম্পর্কে উতওয়া অবগত হয়ে হৈচৈ শুরু করে দিল! বললো—এটা আর এক মুসিবত। উচিত ছিলো কোথাও না যাওয়া। আর যেতে হলে গোয়েন্দা বিভাগের অনুমতি নিয়ে যাওয়া কর্তব্য ছিলো। কোথায় গেছে সে?

তার আব্বা বললেন—আমরা তো জানি না। ছোট্ট একটা চিরকুট রেখে গেছে, তাতে কোন নির্দিষ্ট স্থানের নাম নেই। আর বলে গেছে, দু'সপ্তাহ পরে ফিরবে!

রাগে উতওয়া টেলিফোনের রিসিভার ছুড়ে ফেলে দিয়ে চিৎকার করে উঠলো—আমি এমনি এক লোক যার একটি মাত্র আঙ্গুলি হেলন হাজারো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের আন্দোলিত করে থাকে, সে কি একটি মেয়েকে শাসন করতে অক্ষম হয়ে পড়বে যার ওজন পঞ্চাশ কিলোরও বেশী হবে না? হায়রে, হতভাগিনী! আল্লার কসম.........বেশ ভালো কথা.........।

৯

ঘটনাটি যখন ঘটেছিল উতওয়া তখন ছোট। উতওয়ার পক্ষে তা ভোলা সম্ভব হয়নি। সব সময়ই মনে পড়ে। একদিন তার মা তাকে একটি সুন্দর খেলনা এনে দিলেন। খেলনাটি ছিল একটি ছোট্ট গাড়ী। ভিতরের ছোট একটি কালো বোতামে টিপ দিতেই গাড়ীটি চলা ও ঘোরা শুরু করে। আর তা থেকে এক প্রকার শব্দ বের হতে ও ছোট একটি ঘণ্টি বাজতে থাকে। তখন খেলনাটির ক্ষুদে চালক মাথা উঁচু করে হাত নাড়তে থাকে। শিশু উতওয়া অবাক বিস্ময়ে তার এই অপূর্ব খেলনাটির সামনে বসে থাকতো। তখন তার বয়স পাঁচ বছরের নীচে। সে এই উৎসাহব্যঞ্জক ধাতব বস্তুটির গোপন রহস্য জানার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। বড়দের জিজ্ঞাসা করলে তারা এমন সব কথা শুরু করে যার এক কণাও সে বুঝতে পারে না। অবশেষে সে তার খেলনাটিকে নিয়ে দূরে এক কোণে গিয়ে বসে। তারপর

একটি পাথর দিয়ে আঘাত করতে করতে ভেঙ্গে গুড়ো করে ফেলে। তার ভিতর থেকে কয়েকটি ক্ষুদ্র অংশ, কিছু তার ও কাঠের টুকরো বেরিয়ে আসে। অবাক দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকে সে, কিছুই বুঝতে পারে না। এরপর সে গাড়ীর সবগুলি অংশ একত্রিত করে নতুন ভাবে জোড়া দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তা চালাতে গিয়ে চালাতে পারে না। তারপর কঁাদতে কঁাদতে তার মা ও ভাই বোনদের কাছে যায়। তঁারা বলেন, এটা আর ঠিক হবে না। কিন্তু তাকে ঠিক করে দিতেই হবে। তার মা তাকে বলেন—মরে গেছে, ওটা মরে গেছে, ওকে আবার জীবিত করা আমাদের ক্ষমতার বাইরে।

সেদিন সে ভীষণ কান্নাকাটি করছিল। এ দিনটির স্মৃতি উতওয়ার অন্তরে গেঁথে আছে। বার বার ঘুরে ফিরে এ স্মৃতি তার মাথায় এমনভাবে ভেসে উঠে যেমন নদীর গভীর তলদেশ থেকে মরা মাছ পানির ওপরে ভেসে ওঠে। সেই ভাঙ্গাচোরা খেলনা ও নাবিলার মধ্যে সম্পর্কটা কি উতওয়া এখন তা জানে না। তবে দু'টিকেই একসাথে এখন স্মরণ হচ্ছে তার। প্রকৃতপক্ষে নাবিলা তার প্রতি এত কঠোর ব্যবহার ও জুলুম করেছে যে তার ধৈর্যের বঁাধ ভেঙ্গে গেছে। সে জানে না নাবিলার সুন্দর মাথাটিতে কি চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। তার চোখ দু'টি কি সব রহস্যে যেন ভরপুর যার তেলেসমাতি ভেদ করতে সে অক্ষম......এমনি-তরো হাজারো রহস্যই তো সে বুঝতে পারে না। সে কি করবে? সে পরাজয় কিম্বা অক্ষমতা স্বীকার করবে না। তবে কি সে নাবিলার মাথা গুঁড়ো করে ফেলবে? সে কি তাকে পিষে ফেলবে, যেমন হাজারো বন্দীদের তার জুতার তলায় পিষে থাকে? না তাকে গ্রেফতার করে 'বাসর শয্যার' কাষ্ঠখণ্ডের সাথে ঝুলিয়ে নরম তুলতুলে দেহটিকে চাবুক দিয়ে তুলোধোনা করে আগুনের ফুলকি ঝরিয়ে দেবে? তারপর সে নত হয়ে তার পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়বে। এভাবে সে লাঞ্ছিত, অপমানিত হয়ে তার কাছে আত্মসমর্পণ করবে।

কিন্তু তার অবাধ্যতা ও অহমিকা সত্ত্বেও উতওয়া তাকে ভালবাসে কেন? নানা বর্ণের ও চেহারা-সুরতের অসংখ্য সুন্দরী নারীতে দুনিয়াটা ভরা। তাদের প্রত্যেকেই তার মত আবেগময়, প্রাণবন্ত ও বিশেষ মর্যাদার অধিকারী ব্যক্তিকে পেতে চাইবে। তাকে একেবারেই ভুলে যাওয়া এবং ধারণা করা যে, সে নেই, তা কি সম্ভব? প্রকৃতপক্ষে সে তা করতে সক্ষম নয়। তাকে তার চাই-ই। দুনিয়ার সকল নারীও যদি তার কাছে আসে, তবুও তারা তার কামনা মেটাতে পারবে না। সে তাকেই চায় এবং শিগগিরই তাকে পাবেও। তবে স্ত্রী হিসেবে নয়, বান্ধবী হিসেবে। অনেক ভাবনা-চিন্তার পর সে বুঝেছে, বিয়েটা এক মারাত্মক ভুল... সর্বাধিক প্রত্যাশিত তৃপ্তিদায়ক—'হারাম'। আর শরীয়ত অনুযায়ী মিলন তার দৃষ্টিতে বিকৃত পন্থা, তাতে তার জন্যে যেমন কোন স্বাদ-গন্ধ নেই, তেমনিভাবে তা তার কামনাকে আলোড়িতও করে না। তার দৃঢ় বিশ্বাস গতকালের রাজনৈ-তিক ঝামেলা মোকাবিলার পর নাবিলা হয়তো অস্ত্র ফেলে পরিপূর্ণ রূপে আত্ম-

সমর্পণ করবে। বিশেষত তার নির্ভেগুলি স্বাভাবিক হলে সে তার ভূমিকাকে শুধরে নিতে প্রয়াসী হবে, তাকে সাহায্য করতে বা তার হৃদয়ে শান্তি ও বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে পারে, আমি ছাড়া অন্য এমন কেউ নেই।

উতওয়া সামরিক কারাগারের অভ্যন্তরে তার অফিস কক্ষে বসে আছে। তার দু'টি চোখ স্বায়ী কসাইখানাটি দেখছে। প্রতিটি কাজই অত্যন্ত সুশৃংখল ও সুনিপুণভাবে চলছে.........অনুসন্ধান.........শান্তি ....স্বীকারোক্তি কাগজে লেখা হচ্ছে বা ক্যাসেটে রেকর্ড করা হচ্ছে.........পদ্ধতিগতভাবে নতুন বন্দী-দের ইসতিকবাল অভ্যর্থনা জানানো হচ্ছে। তবে সেই ইসতিকবাল হলো চাবুক দলন, পীড়ন, গালিগালাজ, লাঞ্চনা ও অপমানের মাধ্যমে, বড় অভিনব ধরনের। প্লাবনের ন্যায় বন্দীদের গতি যেন থামতে চায় না। সামরিক কারাগারের এক সৈনিক এসে সামরিক কায়দায় স্যালুট মারলো। উতওয়া স্যালুটের প্রত্যুত্তোরের কষ্টটুকু স্বীকার না করেই বললো—কি?

—জনাব আফেন্দী, তাওয়াসাকা অসুস্থ—সৈনিকটি জবাব দিল।

—কি বলছিস? তাওয়াসাকা? আল্লার কসম! আমি তোর বাড়ী ধ্বংস করে ছাড়বো। কখন থেকে?

সৈনিকটি কাচুমাচু করে বললো—সব কুকুরই খেয়েছে, কিন্তু সে খাচ্ছে না।

—সকালেই তুই আমাকে খবর দিসনি কেন? এরপর উতওয়া উঠে গিয়ে সজোরে তার গালে এক থাপ্পর মেরে দিল। কিন্তু সৈনিকটি তার জায়গা থেকে সরলো না। উতওয়া আবার বললো—কথা বল, গাধা কোথাকার!

—জনাব আফেন্দী! আপনি ছিলেন না।

—টেলিফোনে আমাকে বলিসনি কেন?

—আমি নম্বর জানিনে।

—জানবি কেন। তুই তো একটা আস্তা গাধা। অফিসার নওবখতিকে খবর দিসনি কেন? তুই এবং যে সব জন্তু-জানোয়ারকে তুই তোর দেশে চরিয়ে থাকিস সবাই এক রকম। তোর ও তোর মত একশো জনের গর্দানের সমান হচ্ছে তাওয়া-সাকা, ওরে নির্বোধ বুঝেছিস?

অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে সৈনিকটি বললো—জী, বুঝেছি।

উতওয়া দ্রুত তার অফিস থেকে বের হলো। অফিসার ও সৈনিকও তাকে অনুসরণ করলো। তাড়াহুড়ো করে সেনাবাহিনীর ডাক্তার ডাকা হলো। একটা থম থমে ভাব বিরাজ করতে লাগলো। উতওয়া একদল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের পাশে এসে থামলো। কুকুরগুলি তার দিকে ছুটে এসে তার গা শুকতে ও জিহ্বা দিয়ে চাটতে লাগলো; কিন্তু তাওয়াসাকা এলো না। সে জেগে আছে, তার চোখ দু'টি বড় কাতর, ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছে। ভয়ে উতওয়া চিৎকার করে উঠলো—

তার কি হয়েছে, ডাক্তার?

ডাক্তার কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললো –আমি বুঝতে পারছি না। পশু বিশেষজ্ঞকে ডাকলে ভালো হয়। কুকুর সম্পর্কে আমি ভালো বুঝি না।

অত্যন্ত বিমর্ষভাবে উতওয়া কুকুরটির দিকে তাকালো এবং খুব দরদের সাথে তার গায়ে নিজের কাঁপা কাঁপা হাত বুলাতে লাগলো।

কুকুরটি যখন ব্যথায় মানুষের মত কোঁকাচ্ছিলো তখন সহসাই উতওয়ার চোখ দু'টি পানিতে ভরে গেল। ডাক্তার তা লক্ষ্য করে তার দিকে যেতে যেতে বললেন—উতওয়া! ভীত হয়ো না ......এই প্রথম আমি তোমাকে কাঁদতে দেখলাম।

কান্না জড়িত কণ্ঠে উতওয়া বললো—ডাক্তার! অন্য সব সৃষ্টিবস্তুর মধ্যে এ কুকুরটিই আমার সবচেয়ে প্রিয়।

—এতখানি!

উতওয়া অফিসার নওবখতির দিকে ফিরে আদেশ করলো—কয়েদীদের মধ্যে কোন পশু চিকিৎসক আছে কিনা খোঁজ কর। যদি না পাও, তাহলে এক্ষুনি কোন পশু চিকিৎসককে গ্রেফতার করে নিয়ে এসো।

উমাবাশী আবদুল মাকসুদ উতওয়ার কাছে এসে একটা স্যালুট মেরে বললো—জনাব আফেন্দী! চার নম্বর কারাগারে ফাতহী আজমী নামে একজন কয়েদী আছে......সে একজন পশু চিকিৎসক......

—এখনো দাঁড়িয়ে আছিস? বলদ কোথাকার।

—সে তো একক পৃথক সেলে বন্দী...... বিপদজনকদের একজন...... তার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তদন্ত চলছে।

উতওয়া সৈনিকটির বুকে সজোরে এক ধাক্কা দিয়ে বললো—তদন্ত বন্ধ করতে বল, তার জন্য সকল প্রকার আরামের ব্যবস্থা কর। অন্য সব কিছু অপেক্ষা তাওয়াসাকা আমার নিকট বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

জী হ্যাঁ, জনাব আফেন্দী।

কয়েক মিনিটের মধ্যে বন্দী পশু চিকিৎসক ডাঃ ফাতহী আজমী এসে উপস্থিত হলো। সে ছিল হালকা-পাতলা বিবর্ণ ও স্বাভাবিভাবে ছেড়ে দেয়া দীর্ঘ দাড়ি বিশিষ্ট এক ব্যক্তি। তার পরনে একটি সরু পাজামা ও একটি ময়লা জামা। তার দেহের কাটা-ছেঁড়া ও ক্ষত তার গুরুত্বের কথা প্রকাশ করছিল। কিছুমাত্র বিমর্ষ ভাব ও চিন্তা ছাড়াই তার চোখ দু'টি জ্বলজ্বল করছিল। ষাঁড়ের মতো চিৎকার করে উতওয়া প্রশ্ন করলো—তুমি ডাক্তার?

পশু ডাক্তার, জনাব আফেন্দী।

উতওয়া আঙ্গুল দিয়ে কুকুরটির দিকে ইশারা করলো। ফাতহী কুকুরটির দিকে এগিয়ে গিয়ে বিসমিল্লাহ বলে গায়ে বিশেষ করে পেটে হাত দিল, তার চোখনাক ভালো করে দেখলো, তারপর খুব আস্তে আস্তে তার মুখ খুললো। কুকুরটিও নিরবে সাড়া দিয়ে যাচ্ছিল। তারপর সে মুখের ভিতরে খাবারের কিছু বাকী অংশের

দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো—পূর্বে এটা কি কুকুর-রোগের প্রতিষেধক কোন খাবার খেয়েছে ?

উতওয়া বললো—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমার সামনেই তো সবগুলি কুকুর খেয়েছে ? সামান্য কিছুক্ষণ নিরব থেকে উতওয়া আবার বললো—কথা বলো, তার রোগটা কি ধরতে পেরেছো ?

—শান্ত থাকুন, জনাব আফেন্দী।

—ষ্টেথিসকোপ বা থার্মোমিটার আনিয়ে দেব কি ?

—ওসব কিছুর প্রয়োজন নেই, জনাব আফেন্দী। সামান্য একটু জ্বর কুকুরদের সচরাচর হয়ে থাকে, সুস্থ হতে পাঁচ দিনের বেশী লাগবে না। এক টুকরো কাগজ ও একটি কলম চাই।

উতওয়া বেগ পকেট থেকে তার পার্কার কলমটি বের করলো। একজন সৈনিক দৌঁড়িয়ে কমাণ্ডারের অফিস কক্ষে গিয়ে এক বাণ্ডিল সাদা কাগজ এনে হাজির করলো। নিরবে ফাতহী তা নিয়ে কাঁপা হাতে বাইরে থেকে কেনার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু ঔষধের নাম লিখে দিল। উতওয়া কাগজখানা হাতে নিয়ে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি সেগুলি কেনার জন্য একজন সৈনিকের উপর দায়িত্ব দিল। এরপর উতওয়া বন্দী ডাক্তারকে লক্ষ্য করে বললো—কুকুরটির যদি কিছু ঘটে তাহলে তোমার মুণ্ডুপাত করবো।

ফাতহী অতিকষ্টে মুচকি হেসে বললো—নিশ্চিন্ত থাকুন, জনাব আফেন্দী।

উতওয়া তার শীর্ণ কাঁধটি ধরে বললো—ফাতহী !

—জী, জনাব আফেন্দী।

—আমি তোমার এমন একটি উপকার করতে চাই যা তুমি তোমার সারা জীবনেও ভুলবে না।

—আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকবো, জনাব আফেন্দী।

উতওয়া তাকে এক কিনারে টেনে নিয়ে বললো—শিগগিরই আমি নির্দেশ দিচ্ছি যাতে আজকের পরে আর কেউ তোমাকে শাস্তি না দেয়। আর যে কেসটিতে তুমি নিজেকে জড়িত করেছো তা থেকেও আমি তোমাকে মুক্ত করে দেব।

—আল্লাহর শপথ, জনাব আফেন্দী। না কোন কেস আছে, আর না তারা অসন্তুষ্ট হয় এমন কোন ব্যাপার আছে।

—আমার কথা শোন নির্বোধ কোথাকার! সাধারণ কয়েদীদের সাথে তোমাকে মিশিয়ে নেব। এটা সত্যি যে, তোমাকে একেবারে ছেড়ে দেয়া যাবে না। তবে কেস ও ট্রাইবুনালের সামনে উপস্থিতির হাত থেকে রেহাই পেলেই যথেষ্ট।

—ধন্যবাদ, জনাব আফেন্দী।

উতওয়া আবারো বলতে লাগলো—আমি তোমার জন্য একটি বিশেষ সেলের ব্যবস্থা করবো। কুকুরগুলিও তোমার সাথে থাকবে—যাতে তুমি তাদের খাদ্য-খাবার ও স্বাস্থের খোঁজ-খবর নিতে পার। আমি তোমার জন্যও যথেষ্ট পরি-

মাণ খাবারের নির্দেশ দেব। অর্থাৎ যে খাবারের মান হবে কুকুরগুলির খাবারের সমান। তেমন—গোশত, ভাত, নানাজাতীয় শাক-সব্জী। আমার ধারণা, তা এত অতিরিক্ত হবে, যা তুমি চিন্তাই করতে পার না।

ডাক্তার ফাতহী আজমী বেশ কিছুকাল কুকুরের সাথে কাটালো। এ সময়ে উৎকৃষ্ট খাদ্য, মানসিক স্বস্তি এবং কোন কোন সময় কুকুরগুলির সাথে কিছুটা চিত্তবিনোদনের সুযোগও তার ভাগ্যে ঘটলো। আর এ সময়ে তার অন্যান্য বন্দী সাথীরা ছিল বন্ধ দরজার অভ্যন্তরে, সামান্য কিছু সময় ছাড়া সুর্যের আলো তারা দেখতে পেত না।

একজন বন্দী ফিস ফিস করে বললো—ফাতহী, তুমিই সৌভাগ্যবান। আল্লাহ কোথা থেকে কি ভাবে যে তোমার ওপর অনুগ্রহ করেছেন তা তুমি টেরও পেলে না।

ফাতহী যখন দেখলো তাওয়াসাকা সুস্থ হবার পথে তখন সে মহান আল্লার শুকরিয়া আদায় করলো। উতওয়া সব চেয়ে বেশী খুশী ও আনন্দিত হল। প্রীতি ভরে কুকুরটিকে কোলে নিয়ে অত্যন্ত দরদের সাথে সে তার দু'টি ঠোঁট তার গায়ে বুলাতে থাকলো। আর কুকুরটি তার লেজটি নেড়ে তার প্রতি যে অতিরিক্ত যত্ন নেয়া হয়েছে যা অন্য কারো কপালে জোটে না তার জন্য যেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে লাগলো। উতওয়া তার সাথে চুপে চুপে কথা বলতে ও খেলা করতে থাকলো-তাওয়াসাকা ! তুমি সুস্থ হয়ে উঠেছো, আমি তো ভীত হয়ে পড়েছিলাম। তাওয়াসাকা ! তুমি তো জানো আমি তোমাকে ভালোবাসি...তোমার বিনিময়ে আমি আমার সব কিছু বিলিয়ে দিতে পারি। যে কোন মানুষের থেকে তুমি আমার কাছে অধিক প্রিয়। তাওয়াসাকা ! তুমি মানুষের থেকে বেশী না হলেও কোন অংশে কম নও। তুমি বিশ্বাস, বন্ধুত্ব, ভালোবাসা, বাধ্যতা ও পূর্ণ আনুগত্যের বাস্তব প্রতীক। যখন আমার সামন তোমাকে আমি নাচানাচি করতে এবং আমাকে দেখে আনন্দ প্রকাশ করতে দেখি তখন আমি বুঝি যে কোন মানুষের থেকে তুমি অধিক দুরদর্শী, অনুভূতিশীল এবং বিচক্ষণ। তাছাড়া রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার খাতিরে তুমি বিদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতকদের রক্ত মাংস খেয়ে থাক। আর আমি যতটুকু চেয়ে থাকি তার থেকেও বেশী তুমি তাদের দেহকে কামড়িয়ে ক্ষত-বিক্ষত করে থাক। যদি তুমি দায়িত্বশীলদের কেউ হতে তা হলে আমি তোমার গলায় ক্যাপ্টেনের তকমা লটকিয়ে দিতাম। না, না, বরং মেজরের তকমা। তোমার গলায় উপদেষ্টার তকমা লাগাতেই বা আমার ক্ষতি কি ? তুমি এটারই যোগ্য।

তাওয়াসাকা যেদিন সেরে উঠলো, উতওয়া বেগ এ উপলক্ষে তার মর্যাদার উপযোগী একটি জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজনের নির্দেশ দিল। বন্দীদের মধ্য থেকে বহু বিখ্যাত কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের এ উপলক্ষে একত্রিত করা হলো। এরপর তাদের নির্দেশ দেয়া হলো, তারা যেন এখনি খুব সুন্দর সুন্দর কাসিদা রচনা করে। তাদের বলা হলো, সঙ্গীত রচনা করে তাতে সুর দিতে এবং

প্যারেডের সময় তা গাওয়ার জন্য। আর তাদের শাস্তি ও সাংঘাতিক কষ্টকর প্যারেড থেকে একদিনের ছুটির প্রতিশ্রুতি দেয়া হলো। এই প্যারেডে তারা দীর্ঘ সময় ধরে দৌড়াতে থাকতো এবং তাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে তারা দুর্বল হয়ে পড়তো। এরপর তারা রক্ত বর্ণের প্রশস্ত আঙ্গিনার আশে-পাশে.........তদন্ত অথবা সঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, মৃত্যুর আঙ্গিনায় পিপাসিত কুকুরের ন্যায় জিহ্বা বের করে বুকে হেঁটে চলতে থাকতো। নির্দেশ অনুযায়ী বন্দীদের একজন বড় কবি তার কাসিদা পাঠ করতে দাঁড়িয়ে বলার কিছু না পেয়ে দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াতে লাগলো। সে হতভম্বের ন্যায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। উত-ওয়া বড় অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। হঠাৎ একজন সৈনিকের হাত থেকে তার চাবুকটি কেড়ে নিয়ে কবির মাথায় শপাশপ আঘাত করতে করতে বলতে থাকলো—কুত্তার বাচ্চা ! কবিতা বল। আমার ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তুই শ' শ' কবিতা লিখেছিস। আমি তা জানি। আমাদের সম্পর্কে তুই কি এ পংক্তিটি বলিসনি—

'তারা সব মোটা বুদ্ধি ও বলদ প্রকৃতির মানুষ/জ্ঞান-বুদ্ধি তাদের হাতের মুঠোর মধ্যে/আর তাদের সে হাত সর্বদা অসৎ কাজের জন্য নিসপিস করে।' আর এখন তাওয়াসাকার সুস্থতা লাভ সম্পর্কে কোন গান রচনা করতে অস্বীকার করছিস ? আমি আমার মর্যাদার শপথ করে বলছি তাওয়াসাকা সম্পর্কে কোন কবিতা যদি তুই না বলিস তাহলে তোকে কোন মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে কোর্টে হাজির করবো। আর মিথ্যা মামলাই বা কেন ? যে কবিতা তুই লিখেছিস, আর তার সম্পর্কে তুই যা বলে থাকিস......তুইতো বলিস......না আমার স্মরণ হচ্ছে না। এরপর একজন অফিসারের দিকে তাকিয়ে বললো—এই কবিটি কি বলছে তা তুমি জান ?

অফিসারটি একটু গলা ঝেড়ে বললো—জনাব, সে তার একটি কবিতায় বলেছে

'নভেম্বরের কোন এক রাত্রে/কান্নার একটি আওয়াযে ঘুম থেকে/জেগে উঠি ভীত হয়ে/শিকারী কুকুরের দল/হামলা চালালো অকস্মাৎ/ডান ও বাম দিক থেকে ঘিরে ধরে।'

এই 'শাময়াল'—'ডান দিক' খুবই চমৎকার। শোন.........এখনি যদি একটা কবিতা না বলিস তো চাবুক মেরে তোর শরীর ছিন্নভিন্ন করে ফেলবো। এ কথা বলতে বলতে উতওয়া হো হো করে হেসে উঠলো।

বন্দী কবি বললো—জনাব আফেন্দী ! কবিতার জন্য সময়ের প্রয়োজন।

—তোর গুষ্ঠী ধ্বংস হোক। আমার সাথে ইয়ার্কি ?

—কাগজ, কলম ও কিছুটা নিরিবিলি প্রয়োজন।

—তোকে আমি বলেছি তাওয়াসাকা সম্পর্কে কবিতা রচনা কর........ আমার কথা মানলে তোকে তার প্রতিদান দেব।

হতভাগা কবি স্মরণ করলো কবি-সম্রাট শওকীর 'ক্লিয়োপেট্রা' কাব্য নাট্যের একটি বিখ্যাত কাসিদা। কবি তার কিছু শব্দ পরিবর্তন করে তাতে তাওয়াসাকার নামটি সংযোজন করার চেষ্টা করলো। সে তার মাথা নেড়ে বলে উঠলো—আচ্ছা, আমি বলছি।

এ কথা শুনে উতওয়া খুশীতে হাত তালি দিতে দিতে অসংখ্য সারিতে সোজা হয়ে দাঁড়ানো বন্দীদের জোরে চিৎকার করে বললো— তার জন্য তোমরা হাত তালি দাও.........উৎসাহিত করো।

বন্দীরা জোরে জোরে হাতে তালি দিতে শুরু করলো। একজন বন্দী মেঘের গর্জনের মত হঠাৎ চিৎকার করে বলে উঠলো—'আশাত তাওয়াসাকা'—তাওয়াসাকা দীর্ঘজীবি হও। অমনি সেই ময়দান 'আশাত তাওয়াসাকা'—ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠলো।

স্থানটি যেনো সুরেলা আওয়াজের মিষ্টি ধ্বনিতে ভরে উঠলো। উতওয়া অতুলনীয় সৌভাগ্য ও আনন্দে মাথা দুলিয়ে হো হো করে হাসতে হাসতে বলতে থাকলো—আল্লার কসম! প্রেসিডেন্টের আগমন উপলক্ষে আবেদীন ময়দানে সমবেত বিপুল জনসমাবেশের জিন্দাবাদ ধ্বনি থেকেও এ ধ্বনি হাজার গুণ বেশী। তাওয়াসাকা! তোমাকে আমি কতই না ভালোবাসি।

আবার নতুন ভাবে নীরবতা নেমে এলো। হতভাগা কবি ধীর ও শান্তভাবে আওয়াজ করতে করতে দাঁড়ালো। সে আওয়াজ ছিল আবেগ ও কান্না বিজড়িত-

'হে তাওয়াসাকা আমি কাঙ্গাল তোমার ভালবাসার
তুমি ক্ষমা করো তোমার প্রেমিককে,
আমি শুনতে চাই তোমার ব্যথার ধ্বনি
তোমার কঠোরতায় আমি বড় কাতর।
তাওয়াসাকা! তুমি সালাম লও ভবঘুরে বিতাড়িতের
এ বিশ্বে যে নিজেকে ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত করেছে।
তাদের হৃদয়গুলি বড় নরম আর প্রেমিক
তোমার প্রেমিকের জন্য কেন নরম হয়না তোমার অন্তর।
তোমার চকচকে দাঁতগুলোর কামড় খুবই গভীর।
তা সত্ত্বেও তোমাকে ভালোবাসতে আমরা বাধ্য।
আমার বান্ধবী, আমার প্রেয়সী! সে দোষ তোমার নয়
সে দোষ তোমার নির্বোধ মালিকের।'

যা কিছু বলা হলো তার একটি কথাও স্বাভাবিকভাবেই উতওয়া বুঝতে পারেনি। কেবলমাত্র সুর ও কাসরাহ বিশিষ্ট ধ্বনির অন্তমিলই তাকে উৎফুল্ল করে তুলেছিল। এটি ছিল তার ওপর প্রভাব সৃষ্টিকারী একটি সুর যা তাকে আন্দোলিত করেছিল। আর সৈনিক ও অফিসারদেরও কোন উৎসাহ ছিল না, যা বলা হলো তার প্রতি। তারা বরং কৌতুকপূর্ণ পরিবেশ এবং জোরে হাততালিতে রত তাদের কমাণ্ডারের উৎফুল্লতার কারণে তাদের চেহারায় বোকার হাসির মত একটা হাসির চিহ্ন ফুটিয়ে রেখেছিল। উতওয়া বেগ তাওয়া সাকাকে ধরে মাথার ওপর তুলে নিলো আর সেই ব্যক্তিটি জোরে সুর করে বলে উঠলো—

তাওয়াসাকা......আশাত তাওয়াসাকা।

সকল বন্দী, অফিসার ও সৈনিক তাদের নিজ নিজ হাতে তালি বাজিয়ে সেই সুরে সুর মিলিয়ে আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুললো। একজন অফিসার একটু ঝুঁকে পড়ে তার এক বন্ধুর কানে কানে বললো—মনে হচ্ছে, বেগ সাহেবের পানের মাত্রা আজ একটু বেশী হয়ে গেছে।

—আমি নিজ চোখে দেখেছি, অফিসে বসে গ্লাসের পর গ্লাস গিলছে।

—হুঁ...এ দুনিয়া থেকে কেউ কিছুই নিয়ে যেতে পারবে না।

বন্ধু অফিসারটি বিড় বিড় করে বললো—না, এক টুকরো কাপড় নিয়ে যাবে।

এরপর তারা দু'জনই উতওয়া বেগের পেছনে হাসিতে ফেটে পড়লো। কিছুটা নীরবতা নেমে এলে উতওয়া বললো—সবাই মনোযোগ দিয়ে শোন।

সকলেই মনোযোগী হলো। অফিসার, সৈনিক ও বন্দীরা, এমনকি কুকুরগুলিও। উওতয়া বেগ বললো—সকল কয়েদীকে জন্তু-জানোয়ারদের বাগানে ঘোরাফেরার জন্য দু'ঘণ্টার ছুটি দেয়া হলো। গোসল ও কাপড়-চোপড় ধোয়ার ব্যাপারে কোন নিষেধ নেই। প্রত্যেক কয়েদীকে এক টুকরো সাবান দেয়া হবে।

একজন কয়েদী চেঁচিয়ে বললো—মহামান্য বেগ সাহেব! টয়লেট ব্যবহারের অনুমতি ?

সাধারণত খুব অল্প সময়ের জন্য টয়লেটের দরজা খোলা হতো। আর কোন কয়েদীরই দু'তিন মিনিটের বেশী পায়খানার মধ্যে থাকার অনুমতি ছিল না। এটা ছিল একটি কষ্টদায়ক ব্যাপার যা কয়েদীদের জন্য বহু সমস্যা ও জটিলতার কারণ হয়ে দাঁড়াতো। বিশেষত যাদের কোষ্ঠ-কাঠিন্য ছিল তারা পড়তো মুসিবতে। তাই উক্ত প্রস্তাবটি সকলের দৃঢ় সমর্থন লাভ করলো। উতওয়া বেগ মুচকি হেসে বললো—টয়লেটও খুলে দেয়া হবে। তবে একটি শর্তে।

আবার নীরবতা নেমে এলো। উতওয়া বেগ সারিগুলির ভিতরে পায়চারী করতে করতে বলতে লাগলো—আমি কোন প্রকার শব্দ শুনতে চাইনা। কোন প্রকার হৈ চৈ বা চেঁচামেচি তোমাদের এ সব সুবিধা থেকে মাহরুম করে দেবে। আমি কে, তাতো তোমাদের জানা আছে, বুঝলে ?

—তামাম ইয়া আফিন্দম—বুঝলাম, আফেন্দী—সকল কয়েদী একসাথে চিৎকার করে বলে উঠলো। পুনরায় নীরবতা নেমে এলে উতওয়া বেগ বললো—গায়ক দল কোথায় ? আমরা অনুষ্ঠান শেষ করবো।

একদল বন্দী এগিয়ে এলো। নিয়ম অনুযায়ী তারা সবাই ছিলো ন্যাড়া মাথা। বিমর্ষ চেহারা তাদের দুশ্চিন্তা প্রকাশ করছিল। ধৈর্যশীল স্বচ্ছ কালো চোখগুলি যেন একটু গভীর তাৎপর্যপূর্ণ হাসি হাসছিল, সে হাসি ছিল বিদ্রুপের বেশী কাছাকাছি। গায়কদের দলটি সারি বেঁধে দাঁড়ালো। তাদের বাদ্যযন্ত্র হলো কাঁসার থালা-বাটি, যা তারা তাদের খাবার সংগ্রহের সময় ব্যবহার করতো। আর ছিল কিছু গ্লাস ও চামচ। এগুলি তারা বাজানোর জন্য ব্যবহার করছিল।

থালাটি ব্যবহার হচ্ছিল তবলা হিসেবে। এ ছাড়াও আরো ছিল মুখের শব্দ ও হাতের তালি। কোরাস দলের নেতা গাইতে লাগলো—

'তাওয়াসাকা, ওগো তাওয়াসাকা/ওগো আমার চোখের মনি/কি আশ্চর্য, তুমি আমার চোখের ঘুম চুরি করেছো/ইনশাআল্লাহ এখন তুমি ভালো আছো।'

অকস্মাৎ উতওয়া বেগের মধ্যে ভীষণ জোশ এসে গেল। সে তাওয়াসাকাকে এক পাশে সরিয়ে রেখে বাজনা ও সুরের তালে তালে নাচতে শুরু করলো। এবং গানের ধুয়ো ও হাততালিও বেড়ে গেল। এ দেখে কয়েদীরা তাদের হাসি ঠেকাতে পারছিল না। এমন সময় একজন অফিসার তার এক বন্ধুর দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে বললো—বেগ সাহেব, তাওয়াসাকাকেও সংগে নিন......

হঠাৎ উতওয়া বেগ চীৎকার করে উঠলো—কারাগারের অধিবাসীরা, যার যার স্থানে স্থির হও।

গান থেমে গেল। নীরবতা নেমে এলো। সবাই শঙ্কাগ্রস্থ দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো, যে কি না কিছুক্ষণ আগেও নাচে মত্ত ছিল। প্রত্যেকেই পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষা করতে লাগলো। তারা ভাবতে লাগলো, সে কি তাহলে তার প্রতিশ্রুতি থেকে ফিরে এলো? উতওয়া বেগ আবার বললো—তোমরা সব জন্তু-জানোয়ার, অসভ্য। প্রত্যেকটি কুকুর নিজ নিজ সেলে চলে যাও।

মুহুর্তের মধ্যে বন্দীদের পিঠে চাবুকের আঘাতে আগুনের ফুলকী ঝরতে শুরু করলো—যাদের মধ্যে সেই বড় কবি, গায়ক এবং বাদকদলও ছিল। আর ক্ষান-কের মধ্যেই উতওয়া বেগ, তার লোকলস্কর ও কুকুরগুলি ছাড়া আর সবাই স্থান ত্যাগ করলো। সেলের দরজা বন্ধ করে দেয়া হলো। কবি ইউসুফ তার সেলের একটি পিলারের গায়ে হেলান দিয়ে বিমর্ষভাবে বসে পড়লো। সুদানী কয়েদী রেযেক ইব্রাহীম বললো—ওহে অনুপম কাসিদার রচয়িতা! কি চিন্তা করছো?

—নীরো গান গাচ্ছে, আর ওদিকে রোম জ্বলছে।

একথা বলতে বলতে ইউসুফ মাথা ঝাঁকালো। তার দ্বীনি ভাই যে ভীষণ কষ্ট পেয়েছে একথা রেযেক ইব্রাহীম বুঝতে পেরে একটু রসিকতা করে বললো—শওকী হলেন মিসরের আমিরুশ শু'য়ারা (কবি-সম্রাট), হাফেজ হলেন নীলের কবি, রামী হলেন যুবকদের কবি, আবদুল মুত্তালিব হলেন পল্লীকবি, মাতরান খলীল মাতরান হলেন লেবাননের কবি, আর শায়খ ইউসুফ হলেন জেলখানার তাওয়াসাকার কবি।

সবাই হো হো করে হেসে উঠলো। এমনকি ইউসুফ নিজেও।

ইউসুফ বলতে লাগলো—সামরিক কারাগারে বসে আমি যে গীতিকা রচনা করেছি একদিন তা আরব বিশ্বের প্রতিটি মানুষের মুখেই শোনা যাবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা একদিন এখান থেকে বের হবো.........মানুষ প্রকৃত সত্য জানবে ....প্রেসিডেন্টের দু'টি চেহারা। একটি যা আমরা দেখছি ও ভোগ করছি। এটি হলো তার ব্যাক্তিসত্তা ও দর্শনের সঠিক অভিব্যাক্তি। আর অন্য চেহারাটি লোকেরা চিনে থাকে যখন তিনি আবেগময় বক্তৃতা করে থাকেন, বিশ্বের নেতৃ-

বর্গ'কে গালাগালি, ও মর্যাদার ওপর আঘাত হেনে কথা বলে থাকেন আর স্বাধী-নতার বড় বড় বুলি আওড়িয়ে থাকেন। স্বাধীনতা? কার স্বাধীনতা? তিনি যে স্বাধীনতা চান তার অভিজ্ঞতা তো আমরা নিজেরাই লাভ করলাম। শাসক-গোষ্ঠির স্বাধীনতা আর যে কুকুরগুলি আমাদের কামড়িয়ে থাকে তাদের স্বাধীনতা। যে স্বাধীনতায় জোর-জবরদস্তি করা হয়, এমন কি নতুন সৃষ্টির জন্যও। আদেশ করার সাথে সাথে কবিতা বল, গান গাও। তোমাদের বাঁচানোর জন্যই আমি কবিতা বলেছি। আমি ভয় করেছি, পাছে তোমরা আমার কারণে তার ক্রোধ ও অত্যাচারের শিকার না হও। এ কারণে যা মনে এসেছে তাই আমি বলেছি।

প্যালেষ্টাইনের আবদুল হামীদ নাজ্জার বললেন—নীরো গান গাইছে, আর রোম জলছে, এটাই তো যুক্তিযুক্ত। রোমবাসী গান গাইবে আর তাদের দেহ ও বাড়ী-ঘর জলতে থাকবে এটাই তো বরং অস্বাভাবিক।

কবি ইউসুফ তার মাথা নেড়ে বললো—কথাটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ।

ইউসুফ উঠে বসে বললো—এসো, আমরা রাসূলুল্লাহ (স) যে সব দোয়া পড়-তেন তার কিছু পড়ি।

ইউসুফ বিসমিল্লাহ বলে শুরু করলো, আর সেলের মধ্যে তার সাথে উপবিষ্ট অন্য সাতজনও অনুচ্চ কণ্ঠে বিড় বিড় করে পাঠ করতে থাকলো। ভক্তি, আনুগত্য ও আল্লার ইচ্ছার ওপর সন্তুষ্টি তাদের সম্মোহিত করে রেখেছিল। কোন কোন সময় চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। তাদের কণ্ঠের সাথে মাথাগুলি দুলছিল। তাদের অন্তরগুলি যেন আকাশের সাথে ঝুলন্ত, আর তাদের বুদ্ধি বিবেক সেই চিরঞ্জীব চিরন্তন মহাসম্রাট আল্লার প্রতি সেজদাবনত যিনি কখনো নিদ্রা যান না। প্রায় এক ঘণ্টা পর এই মিষ্টি মধুর আধ্যাত্মিক জলসা শেষ হলো। একটা প্রকৃত আনন্দে ইউসুফের মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। সে আস্তে আস্তে বললো—আমরা তো আল্লার পথের যাত্রী।

পথটি দীর্ঘ কণ্টকাকীর্ণ। এ পথের পূর্ব ইতিহাস বড় কষ্টদায়ক। ঘটনাবলী অত্যন্ত ভয়াবহ। এ পথের যাত্রীদের ফাঁসি কাষ্ঠে ঝোলানো হয়, দ্বিধাহীনভাবে কারার অন্তরালে নিক্ষেপ করে ধ্বংস করা হয়—যাদের সম্পর্কে বিরাট এ বিশ্বের কেউ কিছু জানতে পারে না। ভীতি ও লাঞ্ছনায় পরিপূর্ণ কালো ও লাল রাত্রি-গুলি অত্যন্ত ধীর গতিতে অতিবাহিত হয়, যা খুবই পীড়াদায়ক। তথাকথিত যোদ্ধারা বিভিন্ন ধরণের বক্তব্য ও শ্লোগান নিয়ে এদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে এবং এ উম্মতের হাজারো নিরপরাধ সন্তানকে ধ্বংসাত্মক পাগলা যুদ্ধে লিপ্ত করে পিষে ফেলা হয়েছে। হাজার হাজার মানুষ মাঠে ময়দানে, বড় বড় জেলের অভ্য-ন্তরে মৃত্যু বরণ করেছে। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও মনীষীরা আত্মগোপন করেছে। মৃত্যুর গান গাইতে গাইতে বিষধর আজদাহা গর্তের থেকে বের হয়ে এসেছে। সবুজ উপত্যকার আনাচে-কানাচে সন্তানহারা ক্ষুধার্ত, হিংস্র নেকড়ে মুহুর্মুহু হুংকার দিয়ে উঠেছে। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের ছিনিয়ে নিয়েছে, শিশু-কিশোরদের শ্বাসরুদ্ধ করে

হত্যা করেছে। এভাবে পৃথিবীতে আল্লার জান্নাতকে জংগলে রূপান্তরিত করা হয়েছে। আর সেখানে চালু হয়েছে জংলী আইন।

অনুচ্চ কণ্ঠে কবি ইউসুফ বললো—'আল্লাহ্ কোন বান্দাকে যখন ভালোবাসেন তখন তাকে পরীক্ষায় ফেলে দেন।'

১০

কয়েকদিন হলো মাহমুদ সাকার 'শেফা খানায়' আছে (সামরিক কারাগারে হাসপাতাল এ নামেই পরিচিত)। প্রথম প্রথম কয়েদীরা এ নামটি শুনে হাসতো। কারণ, কারাগারের বাইরে কৃষকরা যেখানে তাদের গাধার চিকিৎসা করে থাকে, 'শেফা খানা' বলতে কেবল সে স্থানই বুঝায়। আস্তে আস্তে এ নামটি তাদের কাছে পরিচিত হয়ে গেছে। কারাগারে প্রতিদিনই কয়েদীদের প্যারেড করানো হয়। তবে এ প্যারেড কিন্তু ব্যায়াম বা নিয়ম শৃংখলা শিখান্যোর উদ্দেশ্য নয়, বরং এর উদ্দেশ্য হলো শাস্তিদান। প্রায় চার ঘণ্টা ধরে তাদের খুব জোরে দৌঁড়াতে হয়—সেনাবাহিনীতে যা কিনা 'কুইক মাচ'' নামে পরিচিত। শুধু তাই নয়, প্যারেড-সারির গমন পথে সৈন্যরা চাবুক হাতে দাঁড়িয়ে থাকে এবং তা দিয়ে কয়েদীদের পিঠ, মাথা এমনকি চোখ-মুখে শপাশপ আঘাত করে আগুনের ফুলকি ঝড়িয়ে দেয়। ফলে, কোন কোন কয়েদী তার মুল্যবান চোখ দু'টি হারায়। আর কেউ কেউ অক্ষম হয়ে রাস্তার পাশে গড়িয়ে পড়ে কুকুরের মত হাঁপাতে থাকে, আর কেউ কেউ সংজ্ঞা হারিয়ে লুটিয়ে পড়ে। তখন চলতে থাকে তাদের উপর ক্রমাগত চাবুকের আঘাত, যাতে তারা উঠে আবার দৌঁড়াতে থাকে। তবে তাদের বেশীর ভাগই অবশেষে সেই দীর্ঘ যাত্রার অনুসরণে অক্ষম হয়ে চাবুকের কাছেই আত্মসমর্পণ করে থাকে। আর বয়োবৃদ্ধ, অক্ষম, আহত, অন্ধ ও পক্ষাঘাত-গ্রস্তদের জন্য আলাদা ভাবে এক বিশেষ প্যারেডের ব্যবস্থা করা হয়, যাকে তাবু-রুশ শেফা খানা' বলা হয়। এ সব রোগগ্রস্তদের হাসপাতালে ভর্তি করানো এমন কোন প্রয়োজনীয় কিছু নয়। তাবুরুশ শেফা খানার রেজিষ্ট্রিকৃত লোকদের সংখ্যা দিনের পর দিন বেড়েই চলে। একবার উতওয়া বেগ সামরিক কারাগারে বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শনে আসে তার সাম্রাজ্যের হতভাগ্য প্রজাদের অবস্থা ঘুরে ফিরে দেখতে। 'কুইক মার্চের' সারিটি দেখে খুবই খুশী হলো সে। কিন্তু 'তাবু-রুশ শেফাখানা'টিকে দেখলো খুবই ধীর ও মন্থর। অকস্মাৎ থমকে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠলো—এরা কারা?

কারারক্ষক ইয়াসীন জবাব দিলো—জনাব! এরা হচ্ছে তাবুরুশ শেফা খানার।

—বাজে কথা। একটি মাত্র প্যারেড 'কুইক মার্চ'' করতে হবে।

সংগে সংগে মাননীয় কারা রক্ষক তার চাবুক হাতে তাদের দিকে ফিরে বললো—কুইক মার্চ! ওরে কুত্তার বাচ্চারা!

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তারা সুস্থদের প্যারেডের সারির সাথে মিলিত হলো। আর এটা ছিলো একটি দারুণ বেদনাদায়ক দৃশ্য। হৃদরোগে আক্রান্ত, পক্ষাঘাত গ্রস্ত ও আহত ব্যক্তিরা দৌড়াতে চেষ্টা করছে, আর চাবুকের আঘাতে তাদের পিঠে আগুনের ফুলকি ছুটছে। কেউ বা থেমে যাচ্ছে, কেউ বা গড়িয়ে পড়ছে। সাংঘাতিক কষ্টদায়ক দৌড়ে অক্ষম ব্যক্তিদের রক্তে মুহূর্তের মধ্যে ভরে গেল প্রান্তর। তাদের কেউ কেউ হৃদরোগে আক্রান্ত হলো। আর একজন তো শেষ পর্যন্ত প্রাণ ত্যাগ করলো। মরার আগে সে অশ্রুভেজা চোখে তাকিয়েছিলো আকাশের দিকে। তার বুকটা হাঁফরের মত উঠানামা করছিলো। অনেক কষ্টে সে—'ইয়া রব' কথাটি বলার চেষ্টা করলো। অবশেষে, সে রক্ত বমি শুরু করে দিলো। এই ছিলো তাদের দৃশ্য। তারা বুকে হেঁটে চলছিলো, আর তাদের পোশাক, পাগড়ী ইত্যাদি তাদের দুঃখ-বেদনা প্রকাশ করছিলো। উতওয়া বেগের পাশে প্যান্টের পকেটে ডান হাতটি ঢুকিয়ে কোন টু শব্দ না করে নির্বাক পাথরের মত ডাক্তার দাঁড়িয়ে। তার দিকে ফিরে উতওয়া বেগ হাসতে হাসতে বললো—আমি তোমাকে বলছি না, বিড়ালের মত তাদের সাতটি জান?

ডাক্তার বললো—এটা তাদের কারো কারো জীবনের ওপর বিরাট আশংকার সৃষ্টি করবে। হৃদপিণ্ডে ক্ষত অথবা রক্ত জমে যাওয়া রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিরা এত পরিশ্রম সহ্য করতে পারে না।

বিদ্রূপের সুরে উতওয়া জবাব দিলো—তা হলে, গোপন সশস্ত্র দলের সাথে যোগাযোগের ঝুঁকি গ্রহণ করলো কেন তাদের হৃদয়? আর কেনই বা আল্লার রাহে তাদের জীবন উৎসর্গের জন্যে প্রস্তুত তারা? তোরা দেখে নে, এটাই সেই আল্লার রাস্তা।

ডাক্তার বললো—তাদের অধিকাংশই তো এমন, যাদের সন্দেহবশত গ্রেফতার করা হয়েছে। যদি তা না হতো, তাহলে তাদেরকে বিচারের সম্মুখীন করা হতো।

—ডাক্তার! তাদের এই দুই দলের মধ্যে পার্থক্য নেই। তারা সকলেই ইখওয়ানের মানস সন্তান, রাষ্ট্রদ্রোহীর বংশধর।

—মানবিক দিক দিয়ে উচিত হবে.........।

—তোমার বাপের জীবনের শপথ! মানবিক দিকের কথা বলো না। তারা সব জন্তু জানোয়ার। আমাদের সংগে 'শেফা খানায়' চলো, সেখানে ঘুরে ফিরে রোগীদের দেখবে। আমার ভয় হচ্ছে, সেখানে তোমার মানবতা আবার তাদের স্বপক্ষে না নিয়ে যায়, যারা সে মানবতা প্রদর্শনের যোগ্য নয়।

উতওয়া হাসপাতালের দিকে যাচ্ছে। নিরবে ডাক্তার তাকে অনুসরণ করছে। একেক নম্বরের দিকে এগুচ্ছে আর মানুষের চেহারার প্রতি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে। উতওয়া এক রোগীর কাছে গেল। তার পিঠে সজোরে হাত মেরে প্রশ্ন করলো—কে? মাহমুদ সাকার? আল্লা তোর বাড়ী-ঘর ধ্বংস করুক। ঘোড়ার মত হয়ে উঠেছিস দেখছি। আসলে তোরা সবাই শয়তান। খাচ্ছিসওতো ঘোড়ারই মত। তোর কপাল ভালই বলতে হয়।

মাহমুদ তার নির্মল দু'টি চোখ মেলে তার দিকে তাকালো। তার পরণে সরু একটা পায়জামা ছাড়া সারা শরীরই ছিলো নগ্ন। শরীরে অসংখ্য ক্ষতের কারণে কোন কাপড়ই গায়ে রাখতে পারে না। বেশ কিছু ক্ষত আবার ফুলে উঠেছে। মুহূর্তের মধ্যে মাহমুদ চিবান বন্ধ করে এক নজরে গভীরভাবে উতওয়ার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলো। তারপর আবার পনির ও রুটি মুখের মধ্যে নাড়া-চাড়া করতে লাগলো। তার চেহারার ফোলাটা বেশ একটু কমে গিয়েছিলো, তাই চেহারার আঘাতগুলি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিলো। ডাক্তার ফিস ফিস করে উতওয়া বেগের কানে কানে বললো—অত্যন্ত অলৌকিক ভাবে সে বেঁচে গেছে—যে শাস্তি তাকে দেয়া হয়েছে, মরার জন্যে তার অর্ধেকটুকুই যথেষ্ট ছিলো।

উতওয়া বললো—ডাক্তার! তাদের ব্যাপারে ভয়ের কিছু নেই! কথায় বলে, পাপীদের জীবন বড় দীর্ঘ। এরপর উতওয়া তার একটু নিকটে গিয়ে বললো—আল্লার কসম! তুই বুঝবি, ওরে মাহমুদ, ওরে সাকার!

মাহমুদ কোন উত্তরই দিলো না। যদিও সে আহার করা বন্ধ করে দিয়ে রুটির বাকী অংশটুকু পনিরের ছোট্ট টুকরাটিসহ তার পাশের সঙ্গীটির দিকে নিরবে বাড়িয়ে দিয়েছিলো। তারপর সে একটু মাথা বাঁকালো। উতওয়া আবার বললো—আমার বিশ্বাস তুই এখন সেরে উঠেছিস। পুনরায় আমরা অনুসন্ধান বা জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করতে পারি—তাই না ডাক্তার?

ভয়ে মাহমুদের অন্তরটি কেঁপে উঠলো। 'জিজ্ঞাসাবাদ' কথাটির অর্থ সে ভালোই জানে। তাহলো চাবুক, আগুনে পোড়ানো, লাথি-চড়, অশ্লীল গালা-গালির সয়লাব এবং ভিত্তিহীন বানোয়াট অভিযোগ। হায়! প্রথমেই যদি সে মারা যেত! যে আজাব সে ভোগ করছে, মনে হচ্ছে তার কোন শেষ নেই। তার কাছে অস্ত্র আছে, এই অবাস্তব ঘটনাটি উতওয়া বেগের মাথায় কোথা থেকে এলো। তার কাছে তো কোন অস্ত্র নেই। এই কেসে তার সঙ্গী-সাথীরা তো সে সম্পর্কে কিছুই বলেনি। প্রতিটি সাক্ষী-প্রমাণ এ মিথ্যা অভিযোগ থেকে তাদের নির্দোষ প্রমাণ করেছে। হায়! সে সব হতভাগ্য নির্দোষ ব্যক্তি যারা সামরিক কারাগারে প্রবেশ করে থাকে! হ্যাঁ, মাহমুদ যা বলেছে সত্যই বলেছে। অভিযোগ আরোপকারী তাকে স্বীকারোক্তি বা যাই কিছু বলুক না কেন। আর তারই ভিত্তিতে শেষ পর্যন্ত তাকে এখন পীড়াদায়ক শাস্তি দেয়া হলো। এরপর তার বিচার করা হোক, মৃত্যুদণ্ড দেয়া হোক বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড যাই দেয়া হোক না কেন, তাতে তার কোন পরোয়া নেই। এখন তার কাছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো এই রক্তাক্ত উৎপীড়নের একটা পরিসমাপ্তি হওয়া—তা সে মৃত্যুর মাধ্যমেই হোক না কেন। কিন্তু, কথা হলো, যে নির্দোষ সে কি বলবে? কাহিনী বানাবে না মিথ্যা অপরাধ তৈরী করে করে নিজের ওপর আরোপ করবে?

বেশ কিছুক্ষণ নীরব থেকে ডাক্তার বললো—পিটানি ও ক্ষতের চোটে তার পায়ের চামড়া একেবারেই উঠে গেছে। এখন পায়ে হেঁটে চলা তার পক্ষে অসম্ভব।

অত্যন্ত উপেক্ষার সাথে উতওয়া বললো—এটা কিছু না। অনুসন্ধান অফিসে আমরা তাকে ষ্ট্রেচারে করে নিয়ে যেতে পারবো।

—আবার যে কোন ধরণের শাস্তি তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেবে।

—তাতে কি হয়েছে? সে না থাকলে কি দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে? যত্ত সব…।

—উতওয়া বেগ! তার যে কেস তাতে এমন কঠোর শাস্তির উপযুক্ত সে নয়।

একটু মুচকি হেসে উতওয়া বললো—তুমি কি ডাক্তার না উকিল?

—তুমি তা জান।

—তা হলে, সে দোষ স্বীকার করে নিজেকে বাঁচায় না কেন?

ক্ষুদ্র জানালা আর তার শিকগুলি সূর্যের আলো ঢেকে দেয় এমন ঘন হওয়া সত্বেও সেই স্থানটিকে সূর্য যেন চোখ মিটকি মারছিলো। মাহমুদ স্মরণ করছে তার প্রতি আল্লার রহমত ও অনুগ্রহের কথা। সে এমন অবস্থায় হাসপাতালে এসেছিলো যখন তার জীবন রক্ষাকারী প্রতিষেধকের ভীষণ প্রয়োজন। তা না হলে Microbe ও তার বিষক্রিয়া ছড়িয়ে পড়তো সারা দেহে। কোন প্রকার ইনজেকশন না থাকার কথা বলে ডাক্তার নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করলো। অথচ এটা কিন্তু খুবই সামান্য জিনিস। এমন কি, সালফাডাইজিনের একটি টেবলেটও সে হাত দিয়ে কোথাও পেল না। অকস্মাৎ মাহমুদ একদিন ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লে তার জন্যে দশটি 'পেনিসিলিন ষ্ট্রাবটোমাইসিন' ইনজেকশন এসে হাজির হলো। তখনই মাহমুদ বিড় বিড় করে বললো—কোথা থেকে এলো?

—চুপ করে থাক—জানতে চেয়ো না।

—আপনার রবের শপথ! আমি জানতে চাই।

—বড় কারাগারে তোমার ভায়েরা ব্যাপারটি জেনে তোমার জন্যে সেগুলি খরিদ করেছে। শুধু তোমার জন্যেই নয়, অন্যদের জন্যও। তার একটি এই আমার হাতে। এর দাম কত জান?

—কত?

—এক শো গিনি। কি ভাবে তারা……।

—তোমাকে তো বলেছি, জানতে চেয়ো না। বাইরে থেকে সেগুলি খরিদ করেছে…আমি তাঁদের খুবই পীড়াপীড়ি করেছিলাম…যে ইনজেকশনের দাম চার গুরুশ, সেখানে তাঁরা দিয়েছে এক গিনি।

কিন্তু বন্দীদের কারো কাছেই তো নগদ অর্থ নেই…।

ডাক্তার কিছুটা বিরক্তি সহকারে বললো—তোমার চিকিৎসা হচ্ছে, তুমি চুপ থাক। তুমি কি আমার তদন্ত করছো? মাহমুদ স্মরণ করলো সেই রাতগুলির কথা যে রাতগুলি সে কাটিয়েছিলো ভীষণ জ্বর, অচৈতন্য অবস্থা এবং আবোলতাবোল স্বপ্নের ভেতর দিয়ে। এমন কি একদিন সন্ধ্যায় তার কানে এ শব্দটি ভেসে এলো—

ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন…আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রসুলুল্লাহ—আদীরুহু সওবাল কিবলাহ

ওয়া তাশহ্‌হাদু আলাইহি' – 'আমরা এসেছি আল্লারই কাছ থেকে, তাঁরই কাছে ফিরে যাব......আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, আর মুহাম্মাদ আল্লারই রসূল......তাকে কিবলার দিকে ফিরিয়ে দাও......তোমরা সবাই কালমায়ে শাহাদাত পাঠ করো...... ।

কিন্তু সে মরেনি। কোন প্রাণীর আজল এসে গেলে আল্লাহ তাকে মোটেই সময় দেয় না। উতওয়া বেগ ও অন্য সব বড় নেতারা কি একবারও চিন্তা করে না যে, তারা খুব শিগগিরই একদিন মৃত্যু বরণ করবে, এ দুনিয়ার সকল ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও ধন-সম্পদ ছেড়ে চলে যাবে ?

মাহমুদ তার অচৈতণ্য ভাব কাটিয়ে একটু জ্ঞান ফিরে পেল। ডাক্তার চুপ করে দাঁড়িয়েছিলো, আর উতওয়াবেগ ডাক্তার যা বলেছে তা চিন্তা করে দেখেছিলো।

এক সময় উতওয়াবেগ বিড় বিড় করে বললো—প্রজাতন্ত্রী প্রাসাদে ধারণা করা হচ্ছে, মাহমুদ গুরুত্বপূর্ণ কিছু গোপন করছে।

—ধারণা এক জিনিস, আর প্রকৃত ঘটনা ভিন্ন জিনিস—বললো ডাক্তার।

—আমি তা হলে কি করতে পারি ?

—আপনি আপনার উপরের দায়িত্বশীলদের আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝান। ব্যাপারটি সম্পর্কে আপনিই তো তাদের থেকে বেশী জানেন।

—আমার মতামতের কোন গুরুত্ব নেই। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাসেরও ওপরে তাদের ধারনার স্থান।

মাহমুদের স্থানটি ছেড়ে উতওয়া বেগ বেশ কিছু দূর এগিয়ে গেল। তার পাশে ডাক্তার ও চললো। এরপর উতওয়া আবার বলতে থাকলো—এ ব্যাপারে অন্য কোন বাহানা চলবে না। হয় তার কাছে অস্ত্র আছে, এ কথা স্বীকার করে তা বের করে দিতে হবে, অথবা এ ভাবে মৃত্যু বরণ করতে হবে।

—উতওয়া বেগ ! যদি তার কাছে প্রকৃত পক্ষেই কোন অস্ত্র না থাকে ?

উতওয়া অত্যন্ত অবজ্ঞার সাথে তার দু'কাঁধ একটু দুলিয়ে বলে উঠলো—এতে আমাদের বিরাট কিছু ক্ষতি হচ্ছে না।

—তবে, আমাদের একটি জীবনের ক্ষতি হবে।

—এতে আর তেমন কি হবে......মহাসাগরের এক ফোটা পানির মত...... বিরাট বালুর পাহাড়ের এক কণা বালুর মত। ডাক্তার ! এক মাহমুদ মারা গেলে সৃষ্টি জগতের নিয়ম-শৃংখলায় তেমন কোন বিপর্যয় দেখা দেবে না।

—কোন নিরপরাধ লোককে হত্যা করা মহাপাপ।

—ক্ষমতার চাবি-কাঠি যাদের হাতে তারা যেটা সিদ্ধান্ত নেন সেটাই সত্য, আমরা নই। ডাক্তার ! রাষ্ট্রের নিরাপত্তা কিসে তা তাঁরাই বেশী জানেন। আমাকে উত্তেজিত করো না। তোমাকে জেলে ঢোকাতে অথবা কমপক্ষে অন্যত্র বদলী করাতে আমাকে বাধ্য করো না।

তার এ ধমকি সত্বেও ডাক্তার আক্ষেপের সাথে বলে উঠলো—হায় আফসোস।

উতওয়া তার দিকে এমনভাবে তাকালো যেন এই মুহূর্তে তার কোন গুরুত্বপূর্ণ কথা স্মরণ হয়েছে। তারপর বললো-ডাক্তার! তুমি হয়তো ভুলে গেছ, যখন তাকে শাস্তি দেয়া হচ্ছিলো, তুমি তাকে জানে বাঁচিয়ে রাখার কথা বলেছিলে। যাতে ভবিষ্যতে আমরা তার থেকে উপকৃত হতে পারি এবং সম্ভবত সে সুস্থ হয়ে উঠলে আবার নতুন করে এমন পদক্ষেপ নিলে সে সব কিছু স্বীকার করে ফেলবে।

—উতওয়া বেগ! আমি ভুলিনি।

—তা হলে এখন?

—আমি অনেক চিন্তা করেছি।

—কোন বিষয়ে?

—অর্থাৎ একটি অস্ত্রের জন্যে কেউ এভাবে তার জীবন কোরবানী করতে পারে না। যে ভীষণ শাস্তি সে ভোগ করেছে তাই-ই যথেষ্ট ছিলো তার থলের রহস্য প্রকাশ করার জন্যে। একারণে, আমার বিশ্বাস জন্মেছে, নতুন কিছু বলার তার নেই।

দ্রুত একজন সৈনিক উতওয়া বেগের দিকে এগিয়ে এসে একটি পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করে স্যালুট ঠুকলো। তারপর বললো—টেলিফোন! জনাব আফেন্দী!

এ রকম একটি টেলিফোনের প্রতীক্ষায় ছিলো উতওয়া বেগ। তাই সে মাহমুদ ও ডাক্তারকে ভুলে গিয়ে তাদের পেছনে ফেলে দ্রুত চলে গেল। ডাক্তার কিছুটা হাফ ছেড়ে বাঁচলো। তারপর সে মাহমুদের দিকে ফিরে তার বিবর্ণ চেহারা ও স্বচ্ছ চোখ দুটির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বিড় বিড় করে জিজ্ঞেস করলো—কাইফা হালুকা—তুমি কেমন আছ?

—আলহামদুলিল্লাহ। আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ, ডাক্তার!

—কেন?

—আমি আলোচনার কিছু শুনেছি। আর যা শুনিনি তাও বুঝতে পেরেছি। মাহমুদ বলছিলো, আর তার দুগণ্ড বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিলো।

ডাক্তার তার চেহারায় কঠিন গাম্ভীর্যের ভাব ফুটিয়ে অত্যন্ত কঠিন স্বরে জিজ্ঞেস করলো—কি শুনেছো?

মাহমুদ ওয়ার্ডের ভেতরে চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল। বললো—আমার দাদা (আল্লাহ তাঁর ওপর রহম করুন) ছিলেন সূফীদের একজন। আল্লার মুহাব্বত, জিকির ও ইবাদতের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করা সম্পর্কে কিছু কবিতা তিনি সব সময় আবৃত্তি করতেন। একবার তাঁকে আমি আবৃত্তি করতে শুনলাম—

'প্রেমিকদের অন্তরে আছে বিশেষ কিছু চোখ
চক্ষুস্মানরা যা দেখে না, দেখে তাই তারা।
আর তাদের আছে পলকহীন ডানা,
উড়ে যায় সৃষ্টি জগতের প্রভূর সাম্রাজ্যের দিকে।'

ডাক্তার তার একটি হাত অত্যন্ত ধীরে দরদের সাথে মাহমুদের কাঁধের ওপর রেখে বললো—মাহমুদ! তুমি একজন যুবক। তোমাকে একাধিক বছর জেল দেয়া

হলেও আজ হোক কাল হোক তুমি বের হয়ে এসে নতুনভাবে জীবন শুরু করতে পারবে। এ কারণে তোমার বেঁচে থাকা একান্ত প্রয়োজন।

মাহমুদ জিজ্ঞেস করলো—ডাক্তার সাহেব! আপনি কি বলতে চাচ্ছেন?

—অস্ত্র সম্পর্কে তোমার কিছু জানা থাকলে, তোমার জীবনের বিনিময়ে শিগগিরই তা বের করে দেয়া উচিত।

স্বচ্ছ দু'টি চোখ মেলে মাহমূদ বললো—প্রকৃত ঘটনা আপনিও তো জানেন।

—কিন্তু বেটা! তারা তোমাকে তো কিছুতেই বিশ্বাস করবে না।

—তা হলে আমি কি করতে আরি?

কিছুটা হতভম্বের মত মাথা নেড়ে ডাক্তার দুঃখ প্রকাশ করলো। তারপর ঠোঁট দু'টি একটু বাঁকা করে বললো—আমি তো জানি না।

—ডাক্তার সাহেব! ধরুন, যদি আপনি আমার স্থলে হতেন তাহলে কি করতেন? আমি কসম করে আপনাকে বলতে পারি, আমার পক্ষে সম্ভব হলে আমি বাইরে অস্ত্র খরিদ করে কোথাও লুকিয়ে রাখতাম। তারপর এ শাস্তির হাত থেকে বাঁচার জন্যে সেই অস্ত্রের কথা স্বীকার করে তাদের বের করে দিতাম। কিন্তু আমার তো সেই রাস্তা নেই।

ডাক্তার প্রায় কেঁদেই ফেলছিলো; কিন্তু নিজেকে সংবরণ করে নিয়ে নিজের দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটি কামড়াতে লাগলো। তারপর নিজের একখানা হাত মাহমুদের কাঁধে রেখে তার নগ্ন মাথার ওপর ঘষতে থাকলো। এরপর বের হয়ে যেতে যেতে বললো—রব্বুনা আমাকা—আমাদের রব আল্লাহ তোমার সহায়।

কম্পিত হস্তে উতওয়া বেগ টেলিফোনের রিসিভার তুলে বলে উঠলো—

হ্যালো…হ্যাঁ…বুঝেছি…কি বলছো, ইসকানদারিয়াতে? কোন হোটেলে? 'হোটেল মিসর'-এ? উফ্ কোন এলাকায় এ হোটেলটি? নিশ্চিত? বেশ বেশ। আবদুল মজীদ বেগকে আমার সালাম বলো ....আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। আর শোন…খুব ভাল করে শোন…হোটেলটির ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখ…শুনছো? মাআস সালামাহ—নিরাপদে থাক… আমি না আসা পর্যন্ত একটুও নড়াচড়া করবে না…উফ্ বাই বাই…।

রিসিভারটি রেখে দিলো উতওয়া। সে কিছুটা বিমর্ষ হলেও তাকে কিন্তু সৌভাগ্যবান মনে হচ্ছিলো। সে তার বাদামী কপালে ফুটে ওঠা বিন্দু বিন্দু ঘাম মুছতে লাগলো। তারপর সিগারেটে আগুন ধরিয়ে অত্যন্ত তৃপ্তি ও গর্বের সাথে জোরে জোরে টানতে থাকলো। কিছুক্ষণ পর অফিসের আলমারী থেকে একটি হুইস্কীর বোতল বের করে একটি গ্লাসে ঢেলে একেবারেই পূর্ণ করে নিলো। এমন সময় একজন তদন্ত অফিসার পেছন থেকে বলে উঠলো—কি তুমি একাই বুঝি…?

উতওয়া আর কথা শেষ করতে না দিয়ে বলে উঠলো—এস, এস, পান করো …আমি তো তোমাকে জানি,…কমিনা…বখিল…কুত্তার বাচ্চা—এরপর প্রচণ্ড হাসিতে তারা ফেটে পড়লো।

নাবিলার অবস্থান সম্পর্কে উতওয়া সব কিছু জেনে ফেলেছে। সে তার গোয়েন্দা-দের মাধ্যমে জেনেছে, নাবিলা ইসকানদারিয়ায় গেছে এবং সেখানে এক গোপন স্থানে অবস্থান করছে। উতওয়ার মন বলছে, এই খবিস মেয়েটি তার কাছ থেকে পালাতে চায়। সে আরো বুঝতে পেরেছে, চিকিৎসক ডাক্তারটি কিছুটা আনন্দ ফুর্তির কথা দ্বারা কমপক্ষে দু'টি সপ্তাহ নিরিবিলিতে কাটাবার প্রতি ইঙ্গিত করে-ছিলো। পরে ডাক্তারের সংগে তার কঠিন বোঝা-পড়া হবে। ইসকানদারিয়ায় সেনাবাহিনীর ইনটেলিজেন্সী বিভাগে তার বন্ধুদের সাথে যোগাযোগ করে বিষয়টি তাদের সাথে আলোচনা করেছে। তাদের কাছে বিষয়টি খুবই সামান্য। প্রতিটি হোটেলের মালিক বা ম্যানেজারকে তাদের হোটেলে অবস্থানকারীদের নাম-ঠিকানা জানাবার নির্দেশ দিলেই সহজে জানা যাবে........। এ ভাবে দু'তিন দিনও গেল না তারা পলাতক হরিনীটির অবস্থানস্থল উদঘাটন করে ফেলল। উতওয়া সিদ্ধান্ত নিলো আগামীকাল সকালের ডাকবাহী মেইল ট্রেনে রওনা দেবে। এরপর সেই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে তার ব্যক্তিগত 'কারে' যাবে বলে ঠিক করলো। রাষ্ট্রের উচ্চ ক্ষমতাসীনরা এ 'কারটি' তার সেবা, আনুগত্য ও কর্তব্যনিষ্ঠার স্বীকৃতি স্বরূপ তাকে উপহার দিয়েছে। কারটি সে নিজেই চালিয়ে যাবে বলে ঠিক করলো, যাতে দিনের বেলায় নাবিলাকে পাশে বসিয়ে আনন্দ-ফুর্তি করা যায় এবং তার সাথে সিনেমা ও হোটেল রেষ্টুরেণ্টে গিয়ে বিনিদ্র রজনীর ক্লান্তি দূর করা যায়।

—'আমি উতওয়া। প্রতিদান দেবে আল্লাহ...আমি তোমার পেছনে লেগে আছি আর সময়ও দীর্ঘ।' একথা বলতে বলতে উতওয়া তার বাদামী মোচ পাকাতে লাগলো। তারপর তার সহকারীকে ডেকে বললো—শোন! কাল আমি অফিসে আসবো না...কুকুরগুলির কথা তোমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। তাদের কেউ যদি আহত বা অসুস্থ হয় তাহলে আমি কাউকে রহম করবো না।

তার সহকারী বললো—আর জিজ্ঞাসাবাদ?

—যথারীতি চলতে থাকবে। আমি না আসা পর্যন্ত কোন কিছুই বন্ধ হবে না।

—আর অবশিষ্ট বন্দীরা?

—সারাদিনই তাদের সেলগুলির দরজা বন্ধ করে রাখবে।

তারা পেশাব-পায়খানা বা গোসলখানায় যেতে পারবে না?

আমার কথা খুব পরিস্কার...সেল থেকে বের হবে না। অর্ধেক দিন হুজরায় বসে থাকলে বন্দীদের এমন কিছু হবে না। তারপর অত্যন্ত বিদ্রুপের সাথে বললো— । আল্লার ইবাদাতের জন্যে তারা মসজিদে 'এতেকাফ' করতে তো খুবই ভালোবাসে

উতওয়া বের হলো রক্তবর্ণ প্রাঙ্গনের দিকে। একই দৃশ্য দীর্ঘকাল ধরেই অপরিবর্তিত ভাবে চলে আসছে। তবে মাঝে মধ্যে ব্যক্তির পরিবর্তন হয়ে থাকে। সে যেন কিছুই দেখতে পায় না। তার কল্পনায় ভেসে উঠছে বরফের মত সাদা দাঁত, নীল বর্ণের পানি, ইসকানদারিয়ার সুন্দর কার্নিশ রোড এবং অনুজ্জ্বল আলোর নীচে রক্তিম রাত্রিগুলি। যে কোন সমুদ্র সৈকত ও প্রাকৃতিক দৃশ্য থেকে

এগুলি খুবই মুনোমুগ্ধকর। সে কিছুটা আত্মতৃপ্তি ও আত্মপ্রত্যয় অনুভব করছে। যে সব ব্যাপক সুযোগ সুবিধে তার করায়ত্ব তা থেকেই তার এ আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি হয়। সে নাবিলার অবস্থানস্থল জানতে পেরেছে এবং খুব শিগগিরই হঠাৎ করে সে সেখানে পৌঁছে যাবে। তার ক্ষমতা, দৃষ্টি ও দু'বাহু দ্বারা তাকে বেষ্টন করে ফেলবে এবং চেপে চেপে তার রস বের করে ছাড়বে। যদি সে সক্ষম হতো তা হলে সে তাকে আগুনে পুড়িয়ে কাবাব করে নিত, যেমনটি করে থাকে বর্বর উপজাতীয় এলাকার কোন কোন গোত্রের লোকেরা। যদি সে মিশরী না হতো তাহলে অবশ্যই নরমাংস ভক্ষণকারীদের একজন হতো।

লোকেরা কোন প্রকার বাধা বন্ধনের পরোয়া করে না…কখনো নগ্ন অবস্থায় চলাফেরা করে…কখনো নরমাংস ভক্ষণ করে। যা ভাল লাগে তাই তারা করে… এটা কতই না সৌভাগ্য! একদিন সে এক সৈনিককে দেখতে পেল একজন কয়েদীকে শাস্তি দিচ্ছে,…হ্যাঁ, ঘটনাটি তার পুরোপুরিই স্মরণ আছে।

সৈনিকটির ডান হাতে যে চাবুক ছিল তাতে সে সন্তুষ্ট হলো না। এরপর উতওয়া এক অভিনব দৃশ্য অবলোকন করলো। সৈনিকটি মেডিকেলের ছাত্র 'মাহমুদ আশ-শাবী' এক বন্দীর একটি কান কামড়ে ধরে দাঁত দিয়ে চিবিয়ে ফেললো। উতওয়া সেদিন নিজেকে খুবই সৌভাগ্যবান মনে করেছিলো এবং সেই সৈনিকটির প্রতি ভীষণ খুশীও হয়েছিলো। তার দিকে এগিয়ে গিয়ে প্রতিদান স্বরূপ তাকে পঞ্চাশটি গুরুশ পুরস্কার, আর পদোন্নতির নির্দেশ দেয়। তাছাড়া তার বাহুতে একটি বিশেষ ফিতেও বেঁধে দেয়া হয়। এ ঘটনার পরের দিন বহু সৈনিক কান কর্তনকারীতে পরিণত হয়। মজার ব্যাপার হলো এ দিন উতওয়া ও তার সাথীরা খুবই হেসে ছিলো। পরিশেষে এরূপ আচরণ নিষিদ্ধ করে বলা হলো—সৈনিকবৃন্দ! তোমরা আমার কুকুরগুলির অধিকার ক্ষুন্ন করছো। দংশনের অনুমতি একমাত্র কুকুরকেই দেয়া হয়েছে। কেননা তাদের মত তোমরা এই আর্টে পারদর্শী নও অথবা তাদের মত স্বাদও তোমরা পাওনা। সন্ধ্যার উতওয়া বাসায় ফিরে এলো, যাতে ইসকানদারিয়ায় যাত্রার প্রস্তুতি নিতে পারে।

১১

নাবিলা হোটেলে তার কক্ষে বসে আছে। নিরবতা তার অন্তরকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সে গভীর ভাবে ঘুমিয়েছে এবং সূর্যোদয়ের পূর্বেই ফজরের নামায আদায় করে নিয়েছে। তারপর ফুল, (শিম জাতীয় সব্জি) পনির ও এক কাপ দুধ-চা দিয়ে সংক্ষিপ্ত নাস্তাও সেরে নিয়েছে। অতীতের দিনগুলি বিদায় নিয়েছে। সেগুলির স্বচ্ছতা কেউ আজ আর বিনষ্ট করতে পারবে না। সে কোন

প্রকার আবেগের বশবর্তী হয়ে কোন পদক্ষেপ নেয়নি। তবে সেই প্রথম দিনটিতে যখন সে রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের কাছে যা কিছু ঘটেছে তা জানিয়ে চিঠি লিখেছিল, সে দিন সত্যিই সে ভাবাবেগে পরিচালিত হয়েছিল। সে তার চিঠির সমাপ্তি টেনেছিল এই বলে—আপনার শাসনকালে এমনটি ঘটা অসম্ভব অর্থাৎ উচিত নয়...আপনিই তো অত্যাচার-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন, বাতিল রাজতান্ত্রিক শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছেন এবং সামাজিক ন্যায় বিচারের দিকে সুদুরপ্রসারী পদক্ষেপ নিয়েছেন, যা জনগন কর্তৃক প্রসংশিত হয়েছে। আপনার এ সব কাজের সাথে কিভাবে নিরপরাধদের জোর পূর্বক গ্রেফতার এবং জাতীর সন্তানদের ওপর অযৌক্তিক অত্যাচার উৎপীড়নের মিল হতে পারে? আমরা সকলেই তো আপনার ভাই, বোন, ছেলে বা মেয়ে। আর যদি কেউ রাষ্ট্রের নিরাপত্তা এবং দায়িত্বশীলদের জান মালের সংরক্ষণের নামে দমন-পীড়নের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করতে থাকে তাহলে আপনি তাদের এহেন কার্য-কলাপে সন্তুষ্ট হবেন না। আর এ ধরণের কাজ দ্বারা কেবল মাত্র ঘৃণা-বিদ্বেষ, ভয়-ভীতি, প্রতিভার দমন ও বাক-স্বাধীনতার কণ্ঠ রোধ করা হবে।......মহামান্য প্রেসিডেণ্ট, পরিশেষে আপনার প্রতি ভক্তি, ভালোবাসা নিবেদন করছি এবং আল্লাহ যেন আপনাকে তার সন্তুষ্টি ও মর্জি মোতাবেক কাজ করার তৌফিক দেন, আমি আমার অন্তরের গভীরতম স্থল থেকে এ দোয়াই করছি।'

পূর্বদিকের যে জানালাটি দিয়ে সূর্যের আলো এসে কামরাটি আলোকিত করে তুলছিল, নাবিলা সেই জানালাটি দিয়ে বাইরে তাকাল। নাবিলা তার চার পাশের সৌন্দর্য এবং সেখানে বিরাজমান নিরবতায় খুবই খুশি হচ্ছিল। সাধারণ গোয়েন্দা বিভাগের মাঝে সেই অন্ধকার জিন্দানখানা অপেক্ষা এ স্থানটি কতই না আনন্দ-দায়ক! অকস্মাৎ তার মানসপটে ভেসে উঠলো হতভাগিনী এক নারীর ছবি, যার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে এবং তার বিবর্ণ সুন্দর চেহারাটি ক্ষত ও আঘাতে ভরে গেছে।

অসহায়া সালওয়া! নাবিলা তার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে যেন তার পরিণতি দেখতে পাচ্ছে। হায়! যদি তার কাহিনীর কিছু কথাও প্রেসিডেন্টের কাছে লিখতাম। তার চোখে-মুখে একটা বিষণ্ণতার ছাপ ফুটে উঠল এবং ব্যথায় অন্তরটি ভরে গেল। সে সব কিছু ভোলার চেষ্টা করল এবং সকালের পত্রিকাটি টেনে নিল। প্রথম পৃষ্ঠায় যথারীতি প্রেসিডেন্টের ছবি এবং শ্রুতিমধুর গাল-ভরা বুলিতে ব্যানার হেডিংগুলি শোভা পাচ্ছে। তাছাড়া আরো আছে সামন্তবাদ, পুঁজিবাদ, ইহুদী-বাদ ও সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে প্রতিক্রিয়াশীলদের চক্রান্ত সম্পর্কে বিভিন্ন ধরণের প্রস্তাব, বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রাপ্ত সমর্থনসূচক তারবার্তা, ধারাবাহিক বিচার, ন্যাড়ামাথা আসামীদের ছবি, তাদের স্বীকারোক্তি, ষড়যন্ত্র ও ষড়যন্ত্র কারীদের বিরুদ্ধে জনগণের ক্রোধ সম্পর্কিত প্রবন্ধ এবং তথাকথিত প্রতিক্রিয়াশীল অন্যান্য আরব রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে অভিযোগ ও গালাগালি। পড়ার জন্যে নাবিলা

পাতা উল্টিয়ে কোন ছোটগল্প বা কবিতা তালাশ করলো। আঞ্চলিক ভাষায় একটি কবিতা দেখতে পেল যার বিষয় হলো, বিপ্লব ও বিপ্লবীদের প্রশস্তি। এমনকি, যে কার্টুন তার খুবই প্রিয়. তাতেও দেখতে পেল রাজনৈতিক বিষয় তর্থাৎ ফরাসী প্রেসিডেন্টের প্রতি আক্রমণাত্মক বিষয়। সে একটি পৃষ্ঠা উল্টিয়ে তার আজকের দিনটি কেমন যাবে তা দেখার জন্যে রাশিচক্রের উপর নজর বুলাতে লাগলো। তাতে এমনি ধরনের কয়েকটি ব্যাখ্যা দেখতে পেল—'আজ তুমি তোমার ভাগ্যের মুখোমুখি হবে...তোমাকে বঞ্চিত করে এমন কোন সুযোগই হাতছাড় করবে না।' নাবিলা অত্যন্ত অবজ্ঞাভরে নিচের ঠোঁটটি বাঁকালো। তারপর চক্রাকার সাজানো বিক্ষিপ্ত শব্দমালার প্রতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করার পর কলমটি উঠিয়ে নিয়ে অক্ষরগুলি মিলানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু খানিকটা পরিশ্রান্ত হয়ে তা ছেড়ে দিলো। চিন্তা করলো যে সিনেমা হলটিতে একটি বিখ্যাত বিদেশী বই চলছে, সেখানে যাবে এবং এটাই সিদ্ধান্ত নিলো. মনিং শো'তে যাবে। সাধারণত এটা বেশ নিরিবিলি থাকে। সেখান থেকে বের হয়ে সোজা যাবে 'রমল' ষ্টেশনে দুপুরের খাবার খেতে। স্থানটি ভীষণ জনাকীর্ণ, কর্মব্যস্ত ও প্রাণচাঞ্চল্যে ভরা। গাড়ীর সারি এবং প্রধান ট্রাম ষ্টেশনটি সর্বদা হকারদের বিভিন্ন ধরনের আওয়াজে মুখরিত। সেখানকার দেয়ালের পিলারগুলি নানা ধরনের পুস্তকের চিত্তাকর্ষক মলাটে সুশোভিত। নাবিলার হাতে এখন বেশী সময় নেই। এ কারণে খুব মনোযোগ দিয়ে অত্যন্ত নিপুণভাবে বাইরে বের হবার পোশাক পড়তে লাগলো। আর তার চিত্তাকর্ষক চেহারাটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আরো পরিপাটি করে নিলো।

বাতাস বেশ ঠাণ্ডা। এ জন্যে সে মাথায় স্কার্ফ, পায়ে লম্বা মোজা শরীরে লাল পশমী ব্লাউজ ও লম্বা হাতাওয়ালা ঢিলাঢালা জামা পরেছে। এমন সময় দরজায় টোকা দেয়ার খট্খট শব্দ হলো, আয়না থেকে মুখ না সরিয়েই সে বললো—ভিতরে এসো।

তার দৃঢ় বিশ্বাস হোটেলের পরিচালক খালি ট্রে ও কাপ-পিরিচ নিতে এসেছে। দরজা খুলতেই আয়নার প্রতিবিম্ব দেখে মুহূর্তেই সে যেন থ' মেরে গেল। ঘটনার আকস্মিকতায় অত্যন্ত অস্থিরচিত্তে সে বলে উঠলো—কে! উতওয়া?

খুশীর চোটে হো হো করে হেসে উঠল উতওয়া।

আইনামা তাকুনু ইউদরিককুমুল মাওতু অলাওকুনতুম ফী বুরুজিম মুশাইয়াদাহ—যেখানেই তোমরা থাকনা কেন মৃত্যুর হাত থেকে নিস্তার নেই, তা সে শক্ত কোন লৌহ সিন্দুকই হোক না কেন।

তাকে দেখে নাবিলার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। ভীতিগ্রস্থভাবে তার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলো—নাউযুবিল্লাহ।

দরজা বন্ধ করে ভিতরের দিকে এগোতে এগোতে উতওয়া বললো—নিশ্চয় মধুর আকস্মিক ঘটনা। তোমার প্রিয়তমকে স্বাগত জানাবে না? আমার উপস্থিতি কি তোমার কাছে অবাঞ্ছিত? উতওয়ার হাত থেকে পালানো

খোদ শয়তানেরও বাইরে। আমার আগমনে নিশ্চয়ই তুমি উৎফুল্ল...একটি সেকেণ্ডের বিলম্বও ভীষণ পীড়াদায়ক—একথা বলতে বলতে সে নাবিলাকে তার বাহু বন্ধনে আবদ্ধ করে ফেললো। তারপর নাবিলার দিকে ঝুঁকে পড়ে তাকে চুমু দেয়ার চেষ্টা করতেই অত্যন্ত শান্তভাবে তাকে সরিয়ে দিয়ে নাবিলা তার বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে বললো—একটু বিশ্রাম নাও, চা পান করো।

একটা বিষন্নতার ছাপ উতওয়ার চেহারায় ফুটে উঠলো—সে বললো—তোমার এ ভঙ্গিমা ভীষণ কষ্টদায়ক।

—অপরাধ, উতওয়া।

—স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে কোনো অপরাধ আছে?

—আমরা স্বামী-স্ত্রী নই।

—এসব কথা শোনার ধৈর্য আমার নেই। সুদূর কায়রো থেকে এ তামাশার জন্যে আমি আসিনি। নাবিলা তার দিকে ফিরে বললো—আমার ঠিকানা তুমি কেমন করে জানলে? কাউকে তো আমি ঠিকানা জানাইনি?

—আমার অন্তরই আমাকে বলে দিয়েছে।

—সন্দিগ্ধভাবে নাবিলা প্রশ্ন করলো—তোমার অন্তর?

—হ্যাঁ, প্রিয়া।

—লোকেরা তো বলে থাকে তোমার নাকি অন্তরই নেই?

—তোমাকে ভাল না বাসলে কখনই আমি আসতাম না।

—কিন্তু তোমার অন্তর তোমার সাথে আসেনি।

—তা হলে কি এসেছে?

—একটা পৈচাশিক লালসা, যা তোমার দেহকে সর্বক্ষণ উত্তেজিত করছে।

—অন্তর তো সামষ্টিক রক্ত-মাংশেরই একটি অংশ।

—এর বস্তুগত ব্যাখ্যাই সবটুকু নয়।

—তুমি কি প্রকৃত সত্য থেকে পালাতে চাও?

নাবিলা তার দৃষ্টিকে বহুদূরে নিক্ষেপ করে বিড় বিড় করে বললো—সৃষ্টিগত দিক দিয়ে সব অন্তরই যদি সমান হয় তা হলে ভালো ও মন্দ কি জন্যে? আর কেনই বা তার একটি হয় প্রেমিক, আর অন্যটি হয় হিংসুক?

অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে উতওয়া বললো—একটি অন্তরে একই সাথে দু'টি বিপরীত ধর্মী গুণ থাকতে পারে।

—উতওয়া! একটি মাত্র বস্তু সম্পর্কেই কি তা সম্ভব?

—তা আমি জানি না।

—প্রকৃত সত্যের ছিবড়ে ছাড়া তুমি কিছুই জান না।

—আমি দর্শন বুঝি না।

উতওয়া তার সব শক্তি একত্রিত করে নাবিলাকে তার বুকের সাথে জোরে

জড়িয়ে ধরে বললো—মান্ধাতা আমলের পুরানো বস্তাপচা দর্শন আজ আমি তোমাকে ভুলিয়ে দেব। আমরা বিশ শতকের মানুষ।

নাবিলা তার বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়াতে গিয়ে ব্যর্থ হলো। উতওয়ার শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ থেকে নাবিলা বুঝতে পারলো উতওয়ার ঠোঁট তার মুখের কাছে এগিয়ে আসছে, তার বাহু দু'টি তাকে লোহার বেড়ীর মত নির্দয়-ভাবে বেষ্টন করে রেখেছে। তার ঠোঁট দু'টি নাবিলার ঠোঁটকে এমন করে স্পর্শ করলো, যেন তার দম বন্ধ হবার উপক্রম হলো। নাবিলা বিড়ালের ন্যায় পড়ে থেকে একটু দম নিয়ে দু'হাত গুটিয়ে সজোরে উতওয়ার বাদামী রংয়ের মুখে আঘাত করলো। সে তার বাহু বেষ্টনী খুলে নিয়ে একটু দূরে সরে হাসতে হাসতে বললো—শয়তানী, ও অসভ্য কাজে আমি অভ্যস্ত।

—তুমি মানুষকে সম্মান দিতে জান না।

—সম্মানের সাথে এর আবার সম্পর্ক কি ?

—আমাকে একটু একা থাকতে দাও।

—না তা হবে না।

—জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে আমি আত্মহত্যা করবো।

লালায় উতওয়ার মুখ ভরে যাচ্ছে, সে বললো—তা তো খুবই রোমাঞ্চকর হবে।

রাগে নাবিলা চিৎকার করে উঠলো—কুকুর কোথাকার !

—তোমার যা ইচ্ছে তাই বলতে পারো।

—জোরপূর্বক আমাকে তুমি লাভ করতে পারবে না।

—কিভাবে তাহলে পেতে পারি ?

—ভদ্র ও মার্জিত ব্যবহার দ্বারা।

—সকল প্রচেষ্টাই তো আমার ব্যর্থ হয়েছে, প্রিয়া !

—কারণ, তোমার চিন্তা-ভাবনা তো সভ্য মানুষের মত নয়।

—সভ্যতা তো আর তোমাদের ধ্যান ধারণার সাইজ মত নয়।

উতওয়া সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে জানালার ধারে একটি চেয়ারে গিয়ে বসলো। ধুঁয়ার এক বিরাট কুণ্ডলী ছাড়তে ছাড়তে সে বললো—তা হলে প্রথমেই আমাদের আক্‌দ হতে হবে, এ কথার ওপর তুমি অটল ?

নাবিলা কোন উত্তর না দিয়ে তার ব্যাগটি খুঁজতে লাগলো। তারপর কি একটা ছোট্ট জিনিস তাতে ঢোকাতে ঢোকাতে সে উতওয়াকে বলতে শুনলো—উতওয়াকে কেউ আঘাত করলে তাকে খুব কঠিন মূল্যই দিতে হয়।

—আর কেউ আমাকে জোর করে পেতে চাইলে, সে আমার লাশই পাবে।

—প্রিয়া ! তুমি তো আমারই......আর যে জিনিসের মালিক আমরা নই, কেবল সে ক্ষেত্রেই জোর করা হয়।

—আমি তো তোমার কেনা দাসী নই।

—ভালোবাসার নামেই তুমি আমার।

—ভালবাসা তো জোর-জবরদস্তি ও হাইজ্যাকের মাধ্যমে হয় না।

এর দ্বারা আমি বুঝতে পারছি, তুমি আর আমাকে ভালোবাসবে না।

নাবিলা কিছুক্ষণ চুপ থেকে ডাকলো—উতওয়া?

—হ্যাঁ, প্রিয়া!

—তোমার নিকট আমার আরজু...মানসিক দিক দিয়ে আমি অত্যন্ত ক্ষত বিক্ষত।...আমাদের পরস্পরের সাথে সাক্ষাতের উপযোগী সময় এটা নয়। আল্লার ওয়াস্তে সুস্থ হয়ে উঠা পর্যন্ত আমাকে একাকী থাকতে দাও। তোমার আচরণ দ্বারা তুমি আমাকে খুশি করছো, এই বিশ্বাসের বলেই তুমি আমার ওপর অত্যাচার করছো...দশটি দিন এমন বেশী কিছু নয়।

এর অর্থ হলো, 'হুনায়েনের ন্যায় হতাশ হয়ে আমি কায়রো ফিরে যাই... অথচ আমি তো ধারণা করেছিলাম, শিগগিরই আমি আক্কা জয় করবো' (একটি আরবী প্রবাদ। অর্থাৎ আমি বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যাব?)—বললো উতওয়া।

পরিবেশটাকে কিছুটা হালকা করার জন্যে নাবিলা বললো—আক্কা? বহু আগেই তো ইহুদীরা—দখল করে নিয়েছে......সেখানকার নামনিশানা ও মানুষ সবই পরিবর্তন হয়ে গেছে।

—তোমাকে জয় করা অপেক্ষা তা জয় করা খুবই সহজ।

—উতওয়া! ভদ্রতা শেখ।

উচ্চস্বরে হো হো করে উতওয়া এমনভাবে হেসে উঠলো যে তার চোখ দু'টি সম্পূর্ণ ভিতরে বসে গেল। নাবিলা বললো—এখনই আমি বের হবো।

—কোথায়?

—সিনেমায়...তুমি যদি আমার সাথে যাও তাহলে তো হুনায়েনের মত নিরাশ হয়ে ফিরবে না।

—তোমাকে তো বলেছি, আমার মত ব্যক্তিদের কোন সাধারণ অনুষ্ঠানে যাওয়া উচিত নয়।

নাবিলা অনুভব করলো, উতওয়ার মধ্যে পদমর্যাদা বোধটি খুবই টনটনে। আর সে মানসিকভাবে গভীরভাবে আহত। তাই নাবিলা এর সমাধানের চিন্তা করে একটু হাসলো। তারপর উতওয়ার নিকট গিয়ে তার একটি হাত ধরে বলতে লাগলো—মর্ণিংশোতে তুমি আমার সাথে যাবে। তারপর হেসে বললো—তুমি না হয় স্কুলের ছেলেদের মতই করলে, যারা স্কুল থেকে পালিয়ে সিনেমায় যায়। উতওয়া! তুমি সরকার ও রাষ্ট্রীয় নির্দেশের নামে আমার এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করবে না বলে আশা করি। নাবিলার ফেরেশতার ন্যায় পবিত্র মুখমণ্ডল এবং তার মুখে বিরাজমান মধুর ও চিন্তাক্লিষ্ট হাসির দিকে উতওয়া তাকালো। হঠাৎ তার মধ্যে একটা ভাবান্তর ঘটলো এবং বিড় বিড় করে বললো—আমি তোমার সাথে যাব তোমাকে পরীক্ষা করবো।

—উতওয়া ! তোমাকে ধন্যবাদ ।

উতওয়া আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, তার মুখের এক কোণে সিগারেট চেপে ধরে রেখে এবং একটি হাত তার চুল ও পাকানো মোচের মধ্যে ঘুরাতে ঘুরাতে বললো দুঃখ ! নাবিলা তার পিছে পিছে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে উতওয়া মালওয়ানীকে। আর সেও নির্লজ্জের মত তার পিছে পিছে ঘুরছে ।

উতওয়ারা এই অনুভূতি দুর করার উদ্দেশ্যে নাবিলা বললো—তুমি ড্রামা পছন্দ করো না ?

—ড্রামা আবার কি ?

—খুবই উত্তেজনাপূর্ণ ও বেদনাদায়ক কাহিনী যা মানুষকে কাঁদিয়ে দেয় ।

অত্যন্ত অবজ্ঞার সাথে উতওয়া বলে উঠলো—প্রতিদিনই তো আমি এ অবস্থার মধ্যে কাটাই ।

—না, আজকের যে দৃশ্যটি আমরা দেখবো তা এক নতুন ধরনের ।

—কি রকম ?

—এ দৃশ্যের মধ্যে প্রতিটি মানুষই নিজেকে দেখতে পায় ।

—আমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে যে নিজেকে চেনে না ?

—হ্যাঁ, আমাদের প্রত্যেকেই । আমরা তো নিজেদের ধোকা দিয়ে থাকি ।

—প্রিয়তমা ! আমি কোন বিষয়ের গভীরে খতিয়ে দেখার চেষ্টা করি না। প্রতিটি জিনিসের বাহ্যিক দিকটাই আমি দেখে থাকি । আর এটাই আমি যথেষ্ট বলে মনে করি ।

উতওয়ার একটি বাহু ধরে একটু দরদের ভাব প্রকাশ করে নাবিলা বললো—গভীরতা তোমার সামনে অসংখ্য রহস্য ও নতুনত্বে পরিপূর্ণ এক অভিনব বিশ্বের দ্বার উন্মুক্ত করে দেবে ।

—বাজে কথা । যে বিশ্বে এই গভীরতার বাস সেটাই হলো প্রকৃত সত্য ।

—তার মানে শতকরা নব্বই জনও সত্য জানেনা ।

রাগত দৃষ্টিতে উতওয়া তার দিকে তাকিয়ে বললো—এত সব কষ্ট কি জন্য ? দুনিয়াটাকে আমরা সহজভাবে গ্রহণ করতে পারি না কেন ?

—গভীরতা ও সত্যের দ্বারাই মানুষের স্থান নির্ধারিত হয়ে থাকে ।

—ভুল সিদ্ধান্ত ।

আল্লাহ বলেন—'ওয়া ফী আনফুসিকুম আফালা তুবসিরূন ।' তোমাদের নিজেদের মধ্যেই রয়েছে, তোমরা কি দেখ না ? তেমনিভাবে তিনি আমাদের চতুষ্পার্শের পরিদৃশ্যমান জগত সম্পর্কেও চিন্তা ও অনুধ্যানের আহবান জানিয়েছেন যদি এই চিন্তা ও অনুধ্যানে আমাদের কোন কল্যাণ না থাকতো তাহলে উর্ধ জগত আমাদের সেদিকে আহবান জানাতো না ।

বিড় বিড় করে উতওয়া বললো—আমাদের বাস তো পৃথিবীতে ।

—আমরা কেন উপরের দিকে যেতে চাই না ?

—আমাদের তো ডানা নাই।

—আছে, ডানা আছে।

উতওয়া হো হো করে হেসে উঠে বললো—আমরা সিনেমায় যাব...আর আমি কায়রোয় ফিরে গিয়ে আমার বন্ধুদের বলবো, আমি সিনেমায় গিয়েছিলাম। তখন তারা আমাকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে থাকবে।

নাবিলা তার ভ্যানিটি ব্যাগটি নিতে নিতে বললো—আমাদের দু'জনের কাজের সাথে তোমার বন্ধুদের কি সম্পর্ক?

তারা তো আমার বন্ধু। তাছাড়া তারা বুদ্ধিমান, তাদের দৃষ্টিতে জীবনটা হলো সরকারের আদেশ-নিষেধ কার্যকরী করা, নিজের দায়িত্ব পালন করা, যুদ্ধ করা ও উপভোগ করা।

নাবিলা বলতে চাচ্ছিলো, তা হলে তারা তো হিংস্র জন্তুর একটি দল মাত্র। কিন্তু সে চিন্তা করে দেখলো, যে সম্পর্ক সে গড়ে তুলেছে, এ কথা দ্বারা তা বিনষ্ট হবে, তাই, তা আর বললো না। সে উতওয়ার হৃদয় আকর্ষণের জন্য নাটকীয় ভঙ্গিতে বললো—তা হলে এখন সিনেমায় যাওয়া যাক।

১২

এমন ধরণের আচরণ সহ্য করতে উতওয়া অভ্যস্থ নয়। সম্মানিত মহাক্ষমতাশালী বাগদত্তার সাথে এমন টালবাহানামূলক আচরণ কোন মেয়ে করতে পারে তা উতওয়ার কল্পনারও বাইরে। ক্ষমতার বিভিন্ন স্থানে অধিষ্ঠিত তার মত ব্যক্তিবর্গকে সে দেখেছে, তাদের কামনা-বাসনা সংগে সংগেই পূরণ হয়ে গেছে। তার মনে আছে, কোন এক চিত্রতারকা তাদের কোন একজনের কাছে অবাধ্যতা প্রকাশ করে। সে কারণে জোরপূর্বক তার শ্লীলতাহানি করা হয়। তাদের এ বর্বরতার কাছে আত্মসমর্পণ ছাড়া মেয়েটির আর কোন পথই ছিল না। এমনি ধরণের বহু কাহিনী ও গল্প তার জানা। আর বহু কিছুইতো সে নিজের চোখেই দেখেছে। বেশী দুরেই বা তাকে যেতে হবে কেন? তাদের অনেকেই তো যৌন-বিকৃতিতে আক্রান্ত এমন কি তার প্রতিও তারা এ অভিযোগ আরোপ করে থাকে। এ সব কিছু শাসন ক্ষেত্রে তাদের যোগ্যতার ব্যাপারে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে না। সে জন্যে শুধুমাত্র সরকারের প্রতি নিষ্ঠাবান হলেই যথেষ্ট। তারপর তাদের যা খুশী তাই করতে পারে। চুরি করা, ঘুষ নেয়া, অন্যের সম্পত্তি জোর জবরদস্তি দখল করা, জেলখানার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা ব্যবসা করা যা তাদের ভাষায় 'আল-আমলাহ্ আস-সা'বাহ' (কঠিন অন্যায় কাজ) নামে পরিচিত, অথবা তাদের বিশেষ বৈঠক সমূহে ভীষণ কামোদ্দীপক নগ্ন ছায়া-ছবির ফিল্ম দেখতে তাদের প্রতি কোন বিধি-নিষেধ নেই। আর এসব ছবিতে তারা যে সব অশ্লীলতা

দেখে থাকে তা নিজেরা বাস্তবায়িত করতে একটুও ইতস্তত করে না। আর বেশী দূরেই বা আমরা যাব কেন? তারা তো শাসকদের শত্রুদেরকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করে, অথবা দেশের অভ্যন্তরে বা বিদেশে তাদেরকে অতর্কিত আক্রমণ করে থাকে। কখনো কখনো অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার সাথে তাদেরকে অপহরণের পরিকল্পনা করা হয়। তারপর তাদের ডিপলোম্যাটিক ব্যাগে ভরে দেশে পাঠাবার জন্য বুক করা হয়।

ধর্ম ও মানবতার প্রতি কোনরূপ ভ্রুক্ষেপ ছাড়াই দেশ ও বিদেশের মাটিতে কত কিছুই না প্রতিদিন ঘটছে। এসব কিছু খুবই জনপ্রিয় কাজে পরিণত হয়েছে। শাসকদের প্রতি নিষ্ঠা ও প্রাণ উৎসর্গের কঠিন মূল্য হল এসব কিছু। তবে সেখানে লোকদের ছোট্ট একটা দল আছে, যারা এই ভুল পদ্ধতিকে ঘৃণা করে, এসব কাজে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। এসব ক্ষেত্রে তারা দুর্বল ঈমানের পরিচয় দিয়ে থাকে অর্থাৎ এসব কাজকে তারা অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে। কত অভিনব কাণ্ডকারখানা তাদের চোখের সামনেই ঘটে থাকে। কোন রকম টু শব্দটি না করে তারা স্থান ত্যাগ করে। তাদের প্রতি সরকারের যে নির্দেশ আসে তা তারা কোন প্রকার বাড়াবাড়ি না করেই কার্যকরী করে থাকে। এসব (ন্যায়-নিষ্ঠ) অফিসারদের একজন উতওয়ার উপস্থিতিতেই একজন ইখওয়ানী সদস্যকে জিজ্ঞাসাবাদ করছিল। সেই অফিসারটির হাতে ছিল তসবীর ছড়া আর মুখে 'আসতাগফিরুল্লাহ'। আর সেই হতভাগ্য আসামীটির পিঠে ক্রমাগত আঘাত বর্ষণ করে চলছিল। সে চিৎকার করে করে করুণা ভিক্ষা করছিল। কিন্তু কোথায় করুণা। অফিসারটি শুধু বললো—আরে বেটা! স্বীকার করে এ শাস্তি থেকে প্রাণ বাঁচা। এদের অন্তরে দয়া নেই। স্বীকার না করলে তারা তোমাকে ছাড়বে না।

—বেগ সাহেব! আপনি জানেন, আমি কিছুই গোপন করছি না।

তসবী হাতে নেককার অফিসারটি মাথা দুলিয়ে বলল—আমি কিছুই জানি না। তোমার এ ব্যাপারে আমার কোন সম্পর্ক নেই। তুমি যা বলবে আমি শুধু তাই লিখবো।

—আমি মজলুম! আপনি আমাকে তাদের হাত থেকে বাঁচান।

—স্বীকার করে তুমি নিজেই নিজেকে বাঁচাতে পারে।

উতওয়ার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেছে। যা কিছুই হোক না কেন, তাকে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে। কোন কোন পদস্থ ব্যক্তির ন্যায় সেও নাবিলাকে অপহরণের চিন্তা করল। কিন্তু এ ব্যাপারে সে সকলের থেকে দুর্বল; কারণ অন্য সকলের থেকে সে হচ্ছে অধস্তন। তার ভয় হচ্ছে, ব্যাপারটি প্রকাশ হয়ে গেলে তার এই মারাত্মক পদটি থেকে তাকে অপসারণ করা হলে সে মারা যাবে, যেমন মাছ পানি থেকে তোলা হলে মারা যায়। এ কারনে সিদ্ধান্ত নিয়েছে নাবিলাকে সে বিয়ে করবে এক সপ্তাহ, একমাস অথবা কয়েক মাসের জন্যে। তারপর তার কামনা ও পিপাসার নিবৃত্তির পর তাকে নিকৃষ্ট বস্তুর ন্যায় রাস্তায় নিক্ষেপ করবে। সব কিছুতেই খুব তাড়াতাড়ি বিরক্তি ধরে যায়। যে কোন পুরুষ বা নারীর

সাথেই দীর্ঘদিন কাটানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। অবশ্য এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, এটাকে নিজের অঙ্কিত নকশা থেকে প্রত্যাবর্তন বলা যায়। কিন্তু জীবনটাকেই তো সূচনা ও পিছুহটা বলা যায়। ফিলিস্তিনের যুদ্ধের সময় সে এটা শিখেছে। আর সৈনিক জীবন তো এ কথাই বলে থাকে। ইসকানদারিয়ায় সে নাবিলার সাথে সিনেমায় গেল। নাবিলা তো গভীর মনোযোগ সহকারে ফিল্ম দেখছিল। উতওয়া এক সময় নাবিলার হাত ধরল। তাতে সে কোন বাঁধা দিল না। কিছুটা সাহস পেয়ে সে নাবিলার হাতে একটা চুমু দিল। নাবিলা তার দু'টি চোখ মেলে তার দিকে তাকাল। সে চোখের দৃষ্টি ছিল যেমন জলজলে তেমনি তীক্ষ্ণ ও স্বচ্ছ। তারপর আবার সে ছবি দেখতে মনোযোগী হল, যা তার সমস্ত অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। উতওয়া অনুভব করলো, নাবিলার হাতটি বরফের মত ঠাণ্ডা। তাতে যেন জীবন বা প্রাণ নেই। তা যেন মৃত ব্যক্তির হাতেরই মত। উতওয়া তার চেয়ারে বসে একটু ইতস্তত করল। এক সময় পর্দার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল ; কিন্তু নায়ক-নায়িকার উত্তেজনাপূর্ণ কথা-বার্তার কিছুই সে বুঝল না। কেবলমাত্র সুন্দরী নর্তকী ছাড়া আর কোন কিছুর প্রতি তার দৃষ্টি ছিল না। এ কারণে সময় খুব কষ্টেই অতিবাহিত হচ্ছিল তার। ভিতরে ভিতরে খুবই জলছিল ; আর কামনা করছিল খুব শিগগিরই যেন ফিল্মটি শেষ হয়। আবার সে নাবিলার দিকে তাকাল। কাহিনীর ধারাবাহিকতার প্রতি গভীর মনোযোগ থাকার কারণে আশে-পাশের কোন কিছুর প্রতি নাবিলার কোন খেয়াল ছিল না। এক সময় উতয়া বলল—এ ছবির মধ্যে এমন কি আছে, যা তোমাকে মুগ্ধ করেছে?

এই মাত্র স্বপ্ন দেখেছে এমনভাবে নাবিলা তার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল—কি বলছো তুমি, উতওয়া?

—কাহিনীটি সম্পূর্ণই একেবারে বাজে।

—কি রকম? এর বিষয়বস্তু তো খুবই উন্নত...তুমি কি দেখছ না?

—আমার মাথা ব্যথা করছে।

—আমার কাছে এসপাইরিন আছে—নাবিলা তার ব্যাগটি খুলে বলল।

—তোমার কষ্ট করতে হবে না। এখান থেকে বের হলেই আমি সুস্থ হয়ে উঠবো। এখানে আমার যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে।

অবাক দৃষ্টিতে নাবিলা তার দিকে চেয়ে বলল—এ ছবিটি অস্কার পুরস্কার ছাড়াও আরো দশটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার লাভের গৌরব অর্জন করেছে।

কিছুটা অবজ্ঞার সাথে কাঁধ দুলিয়ে উতওয়া বলল—বিদেশীদেরকে যা মুগ্ধ করে অনেক সময় তা আমাকে মুগ্ধ করে না।

—কিন্তু সেখানে তো কিছু উন্নত মূল্যবোধ আছে; সে সম্পর্কে কোন মানুষই দ্বিমত পোষণ করে না।

নাবিলা পুনরায় চিত্তাকর্ষক ফিল্মটির দৃশ্য দেখতে লাগল। আর উতওয়া কল্পনায় তার প্রিয় জগত সামরিক কারাগারে ফিরে গেল। কুকুরগুলির কথা তার

স্মরণ হল, তাদের জন্য সে পেরেশান। তবে তাদের প্রতি অবহেলা করার দুঃসা-হস কেউ করবে না। অবরুদ্ধ ফটকের অভ্যন্তরে বন্দীদের কথাও তার স্মরণ হল। নিজের অন্তরেই সে অনুভব করে, তদন্তকারী অফিসাররা তার উপস্থিত ছাড়া তাদের দায়িত্ব পুরাপুরিভাবে পালন করে না। এ কারণে তার দুশ্চিন্তা আরো বেড়ে গেছে…তার উচিত নাবিলার সাথে দুপুরের আহার সেরেই খুব তাড়াতাড়ি চলে যাওয়া। এখান থেকে সে নিজের বাড়ীতে না গিয়ে সরাসরি সামরিক কারাগারে গিয়ে কাজকর্মের তদারক করে নিশ্চিত হবে। অফিসের অভ্যন্তরে বসে সে নিজেকে খুবই সৌভাগ্যবান মনে করবে।

নাবিলার দেহের স্পর্শ লেগে উতওয়া তার কল্পনা থেকে সম্বিত ফিরে পেল। নাবিলার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে এবং কান্নায় তার কণ্ঠরোধ হয়ে আসছে। এ দেখে উতওয়া বড় দিশেহারা হয়ে পড়ল। ভীতিগ্রস্থভাবে সে বলল—কি হয়েছে?

—এটা একটি ভীতিজনক দৃশ্য।

—আমি বুঝলাম না।

—তুমি কি দেখনি, বিদ্রোহীরা তাদের প্রেমিককে কিভাবে হত্যা করল?

—এতে এমন কি হয়েছে? প্রতিদিনই তো কত মানুষ মরছে।

—সে ছিল খুবই শরীফ ও সত্যবাদী। তার প্রেমিকাকে সে ভীষণ ভালো-বাসতো সমাজের মধ্যমনি হিসেবে বসবাস করত। সকলেই তাঁকে সম্মান করত।

উতওয়া নাবিলার হাত ধরে বলতে লাগল—এ হচ্ছে কাল্পনিক কাহিনী।

— কিন্তু এর ঘটনাবলী তো কথা বলে। জীবনের বাস্তবতাকে প্রকাশ করে।

—এসব ব্যাপারে হচ্ছে শান্তনার জন্য।

— শিষ্টাচার শিক্ষার জন্যেও।

—প্রিয়া! সিনেমা হচ্ছে একটা ব্যবসা। তোমাদের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে হালকা কিছু আনন্দ দান করে।

—সব সময় নয়।

—উতওয়া হঠাৎ দাঁড়িয়ে দৃঢ় স্বরে বলল—চলো আমরা যাই।

—কি ভাবে? কাহিনী তো এখনো শেষ হয়নি।

—নায়ক তো মারা গেছে।

— উতওয়া! মৃত্যুই শেষ নয়—নায়ক এখনো আছে।

—হ্যাঁ, আছে দাফনের জন্যে।

কক্ষনো নয়। জনগণ ক্ষেপে যাবে। দেখ, দেখ, তারা অপরাধীদের ঘিরে ফেলেছে…কি আমি তোমাকে বলিনি? কাহিনী এখনো শেষ হয়নি। দৈহিক দিক দিয়ে নায়ক মৃত্যুবরণ করেছে ঠিকই, কিন্তু তার চিন্তাদর্শন জীবিত থেকে তার মতই কাজ করে চলেছে। দেখ, দেখ, তারা অপরাধীদের ধরে হেয় ও লাঞ্ছিত অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছে। দেখ এটাই প্রকৃত মৃত্যু।

উতওয়া আবার বসে পড়লো এবং একটু বিরক্তি সহকারে নাবিলার একটি হাত ধরে বলল—নাবিলা ! তুমি কি পাগল হয়েছ ? লোকেরা তোমার দিকে তাকাচ্ছে।

—দেখ, এই সেই নায়িকা।

—বল, বিধবা।

—শহীদ স্বামীর পর সেই ঝাণ্ডা হাতে তুলে নিয়েছে।

—নাবিলা মাথা ঠিক রাখো। এমনটি কখনো হয় না। শিগগিরই তুমি তার জন্যে অন্য একজন পুরুষ খুঁজতে থাকবে। পুরুষ ছাড়া নারী, বিশেষত আমেরিকায় কখনো বাঁচতে পারে না।

—তুমি কাহিনীটি মোটেই বোঝনি। ফিল্মের পর্দার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে নাবিলা একথা বলল।

উতওয়া হেসে উঠে বিড় বিড় করে বলল—কোন কাহিনীর কেবলমাত্র প্রথমাংশ দেখেই আমি পুরো ঘটনাটি আঁচ করতে পারি।

—কাহিনী তো আসলে কিছুই না। ঘটনার নির্দেশনাই হচ্ছে গুরুত্বপুর্ণ।

—ঘটনার নির্দেশনা বলতে তুমি কি বোঝাচ্ছো ?

নাবিলা তার এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না। সম্মুখের পর্দার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে দেখতে লাগল। আর উতওয়া তারই পাশে কাহিনীর শেষ ও সমাপ্তি বাক্য প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত বসে থাকতে বাধ্য হল। ধৈর্য ধরা ও ক্রোধ সংবরণ করা ছাড়া আর উপায় কি ? তার মতে নারী হল শিশুর মতো। সামান্য জিনিস ও অলীক কল্পকাহিনী নিয়ে বড় বেশী মাতামাতি করে। এ কারণে শয্যা-সৌন্দর্য স্ফূর্তি ছাড়া আর কোন কাজেই তারা আসে না। যাদের ধারণা, তাদেরও কিছু ভূমিকা ও উদ্দেশ্য আছে, তারা ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত। ভোগ ও আনন্দ উল্লাস ছাড়া আর কিছুই তাদের উদ্দেশ্য নয়। গ্রামে সে লোকমুখে শুনেছে, 'মেয়েদের একটি পাজর ভাংলে দু'টি পাজর গজায়।' বাস্তবেও তাই। নারী বড় অভিনব সৃষ্টি, সময় সময় তাদের বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে। উতওয়ার মতে একমাত্র চাবুকই সকল অস্পষ্টতা ও অবোধগম্যতা দুর করতে পারে। রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত করতে পারে কেবলমাত্র যন্ত্রণা, আর খুলতে পারে সকল অজানার আবরণ। যন্ত্রণা মৃত্যু থেকেও শক্তিশালী।

বেলা প্রায় একটা বেজে গেছে। তারা দু'জন 'মুহাত্তাতুর রমল' ময়দানে হাঁটছে। এটাই ইসকানদারিয়ার সব চেয়ে নাম করা ময়দান। উতওয়া তার সুন্দর কালো রঙ্গের ও সোনালী ফ্রেমের চশমাটি চোখে পরার ইচ্ছা করল। অত্যন্ত দৃপ্ত পদে ও গর্ব ভরে হেঁটে নাবিলার পাশে গেল। যখন সে দেখল নাবিলা দ্রুত পায়ে হেঁটে জনসমাবেশে প্রবেশ করছে, তখন সে বললো—শান্ত ও গুরুগম্ভীরভাবে তোমার চলা উচিত।

—আমরা তো রাস্তায়……।

—রাস্তাও কিছু শিষ্টাচার আমাদের প্রতি আরোপ করে, আমাদের তা মেনে চলা উচিত।

নাবিলা তার কথার কোন উত্তর না দিয়ে হাত দিয়ে একটি নিম্ন শ্রেণীর হোটেলের দিকে ইঙ্গিত করে বলল—দেখ, এই, এখানেই প্রতিদিন দুপুরে আমি খাই।

ঘৃণা ও অবজ্ঞার সাথে উতওয়া বলল—এটা তোমার উপযুক্ত কাজ নয়।

নাবিলা এ ব্যাপারে তর্ক-বিতর্কের কোন প্রয়োজন অনুভব করল না। সে শুধু বলল—অন্য যে কোন স্থানে আমাকে নিয়ে চল।

নাবিলাকে সংগে করে যে হোটেলে সে গেয়েছিল, একটি প্রথম শ্রেণীর হোটেল। অনুপম ডেকোরেশন, ছাদ থেকে ঝুলানো সুন্দর ঝাড়বাতি এবং দরজা চৌকাঠ অত্যন্ত সুশৃংখল ও সুনিপুণভাবে সাজানো। সেখানে বসা লোকদের অধিকাংশই বিদেশী ও শহরের কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তি। প্রবেশ ও নির্গমন পথ থেকে দূরে একটি বড় পিলারের দিকে মোড় নিল উতওয়া। তারপর তারা দু'জনেই একটি ছোট্ট টেবিলের পাশে গিয়ে বসল। ওয়েটার খাদ্য তালিকা নিয়ে এসে প্রথমেই নাবিলার সামনে ধরল এবং সে তার পছন্দমত খাদ্য নির্বাচন করল। তারপর উতওয়া নির্বাচন করল। যাবার আগে ওয়েটার প্রশ্ন করল—বেগ সাহেব! পানীয়?

—অবশ্যই.........হুইস্কি।

কিছুটা অলসতা ও অনিচ্ছুকভাবে নাবিলা খাচ্ছে। তার দেখা কাহিনীটি সম্পর্কে সর্বদা চিন্তা করছে, আর স্মরণ করছে প্রতিটি মুহূর্ত সালওয়ার কথা, কাটা-ছেঁড়া, ও ক্ষত-বিক্ষত, বিবর্ণ চেহারাটির কথা। সাধারণ গোয়েন্দা ভবনে হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের পাল নখ ও দাঁত দিয়ে প্রতি মুহূর্ত তাকে আহত করছে। তার সেই রক্তাক্ত দৃশ্য সর্বক্ষণ তার অন্তরাত্মাকে কাঁপিয়ে দেয়। এক সময় সে উতওয়ার দিকে আড় চোখে তাকিয়ে দেখল, সে কাটাচামচ ও ছুরি দিয়ে গোশত কেটে কেটে গোগ্রাসে গিলছে এবং মাঝে মাঝে পিয়ালায় মদ ঢেলে উদরপুর্তি করছে। উতওয়া থেকে থেকে জিজ্ঞেস করছে নাবিলাকে—তুমি পান করছো না?

—শুধুমাত্র পানি—নাবিলার একই জবাব।

—এটাও তো পানি। প্রতিদিন তুমি যদি দু'পেয়ালা হুইস্কি পান কর তা হলে তোমার সব রোগই সেরে যাবে এবং তোমার অন্তর সৌভাগ্য ও খুশীতে পূর্ণ হয়ে যাবে।

উতওয়ার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো নাবিলা। তারপর নিজেকে সংবরণ করে নিল। মুচকি হাসি দিয়ে উতওয়া বলল-তোমার মাথায় কি ঘুরপাক খাচ্ছে?

—তুমি একজন পুরুষ মানুষ, আগামী দিনের কোন চিন্তাই যার মাথায় নেই।

—এ ছাড়াও আমার অনেক কাজ আছে যা এ সব চিন্তা থেকে আমাকে বিরত রাখে।

—তোমার আবেগ ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে শাসন ক্ষেত্রে ভীষণ ক্ষমতাশালী ব্যক্তির ভূমিকা পালন করতে পার।

—তারা কি বলে না, ইন্নাল মুস্তাকবিলা বিইয়াদিল্লাহ—নিশ্চয় ভবিষ্যত আল্লার হাতে?

– হ্যাঁ বলে।

—যেহেতু আমাদের হাতে না, তাই আমরা সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করি না।

নাবিলা বলল – এখানে তুমি যেন চিরকালই বসবাস করবে এভাবে দুনিয়াতে কাজ কর। বিদ্রুপের ভঙ্গিতে উতওয়া নাবিলার কথার সমাপ্তি টানল—আর আগামী কালই তুমি যেন মৃত্যুবরণ করবে, এভাবে তুমি আখেরাতের জন্যে আমল কর।

নাবিলা বলল—হ্যাঁ এ রূপই।

—আমি মৃত্যুর ভয় করি না।

—কিন্তু উতওয়া! এটা তো বাস্তব সত্য।

—এটা আমাদের বিষয়ের গণ্ডিতে পড়ে না।

হঠাৎ নাবিলা চিবানো বন্ধ করে বলে উঠলো—তোমার কি আল্লার ওপর ঈমান নেই?

উতওয়া কিছুক্ষণ চুপ থাকলো। তারপর ক্ষনিক চোখ দু'টি বন্ধ করে রইল। নাবিলা উতওয়ার হাত দুটি মুঠ করে ধরে রেখেছিল। উতওয়ার হাতে ছিল কাটা চামচ ও ছুরি। উতওয়া হেসে উঠে বলল—তা কি সত্যিই?

—তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাওনি।

—প্রিয়া। সত্যিই যদি আল্লাহ থাকতো, তাহলে ষ্টালিন বিজয়ী হত না, আর হাসানুল বান্নাও নিহত হত না।

নাবিলার অংগুলিগুলির অগ্রভাগ মৃদু কাঁপতে লাগল। সে চামচ দিয়ে অবশিষ্ট তরকারী টুকু টানতে টানতে বলল—মনে হচ্ছে মদ তোমার মাথা বিগড়ে দিয়েছে। উতওয়া গোগ্রাসে খেতে খেতে বলল—বাস্তবিকই এ সব ব্যাপারে আমি কখনো চিন্তা করি না।

—কিন্তু এটাতো মৌলিক বিষয়।

—না, অন্তত আমার ক্ষেত্রে।

কিছুক্ষণ নিরবতা বিরাজ করল। তারপর উতওয়া বলতে লাগল—তা সত্বেও আমার অন্তরে প্রশান্তি বিরাজমান। আমার পিতা ছিলেন একজন নেককার ও ঈমানদার ব্যক্তি। আল্লার সত্তা তাঁর সিফাত ও আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে অনেক কিছুই আমরা শিখেছি। অনেক বছর পর্যন্ত এ বিষয়ে কোন তর্ক-বিতর্কে অবতীর্ণ হইনি, তা সত্বেও আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ আছেন।

নাবিলা বলল—কিন্তু আল্লার ওপর ঈমান তো তার আদেশ-নিষেধের পূর্ণ অনুসরণ দাবী করে।

এটা হচ্ছে অন্য ব্যাপার। সাধারণভাবে কোন আসমানী গ্রন্থেই হুইস্কির নাম

ধরে হারাম ঘোষণা করা হয়নি—একথা বলে উতওয়া হাসতে লাগল। তারপর আর এক পিয়ালা পূর্ণ করে তার অর্ধেকটুকু পান করেছে, এমন সময় হঠাৎ একজন লোক তাদের সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর বিনয়ের সাথে সালাম বিনিময়ের পর বলল—মহামান্য বেগ সাহেব! কোন আদেশ আছে কি?

কিছুটা মলিনভাবে উতওয়া বলল—ধন্যবাদ, আবদুল মজিদ বেগকে আমার সালাম পেঁাছে দিও।

লোকটি বিনয়ে ঝুঁকে গেল, তার নজর ছিল তার পায়ের দু'টি পাতার ওপর। তারপর সে ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে গেল। নাবিলার চোখ দু'টি তাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছিল। তার মনে হল, কিছুদিন পূর্বে যারা তাকে বাড়ী থেকে ধরে গোয়েন্দা ভবনে নিয়ে গিয়েছিল এ লোকটি যেন তাদেরই মত। এ অবশ্য তাদের একজন নয়, তবে তাদের মত ভাব ভঙ্গিমা এরও। নাবিলা প্রশ্ন করল—লোকটি কে

—আমাদের একজন গোয়েন্দা।

—সম্ভবত এ ব্যক্তিই আমার ঠিকানা তোমাকে জানিয়েছে।

আনন্দে উতওয়া হো হো করে হেসে উঠে বলল—যত চেষ্টাই তুমি করনা কেন, আমার সাম্রাজ্যের বেষ্টনী থেকে কখনই বের হতে পারবে না।

কিছুটা চ্যালেঞ্জের সুরে নাবিলা বলল—তোমার ক্ষুদ্র জগত অপেক্ষা আল্লার সাম্রাজ্য অধিকতর প্রশস্ত।

—যত চেষ্টাই করনা কেন এবং যেখানেই যাওনা কেন, এভাবে তুমি আমার অঙ্গুলির মাঝখানেই থাকবে—একথা বলতে বলতে সে হাত দ্বারা ইঙ্গিত করল।

মস্তবড় একটা ঢেকুর তুলে উতওয়া দু'হাত দিয়ে তালি বাজাল। ওয়েটার ছুটে এল। সাদা, পরিষ্কার একটি রুমাল দিয়ে ঠেঁাট দু'টি মুছতে মুছতে জিজ্ঞেস করল—কত হয়েছে?

ওয়েটার ছোট্ট এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিল। উতওয়া তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে মানিব্যাগ বের করতে করতে বলল—চৌদ্দ গিনি মাত্র?

উতওয়া তার মানিব্যাগ থেকে পনেরটি গিনি বের করে গালিচার উপর ছেড়ে দিয়ে বলল—বাকীটা তোমার বখশীশ।

আনন্দে ওয়েটার বলে উঠল—আল্লাহ আপনার ও মেম সাহেবের আয়ু দরাষ করে দিন। ওয়েটার চলে যেতেই নাবিলা বলে উঠল—একবেলা আহারের খরচ আমার পূর্ণ একমাসের বেতনের সমান।

গর্বে উতওরার হৃদয়টা পূর্ণ হয়ে গেল। তার হাসির চোটে তার পেট হেলে-দুলে উঠছিল। খুশিতে বাগ বাগ হয়ে নাবিলার হাত শক্তভাবে ধরে নে বলল—মিলিয়ন গিনি তোমার জুতার তলে বিছিয়ে দেব। দুনিয়ার সকল ধন ভাণ্ডার অপেক্ষা তুমি আমার নিকট অধিক মূল্যবান।

নাবিলা তার ভ্যানিটি ব্যাগটি নিতে নিতে বিড় বিড় করে বলল—কৃতজ্ঞ।

নাবিলা গাড়ীতে উতওয়ার পাশেই বসল। হোটেলের দিকে গাড়ীটি ছুটে চলল। ফটকের কাছাকাছি গিয়ে উতওয়া নাবিলাকে লক্ষ্য করে বলল— এক সপ্তাহের বেশী আমি সহ্য করতে পারবো না। তোমার প্রতীক্ষায় আমি থাকবো···তোমার ফিরে আসার দুই কি তিন দিন বাদেই আমরা আকদ করব আর এ শাস্তির পরিসমাপ্তি ঘটাব। এককভাবে তোমাকেই আমি চাই···বাই ···বাই···।

গাড়ীটি জোরে শব্দ করে উতওয়াকে নিয়ে চলে গেল। দুরে রাস্তার উপর চলমান গাড়ীটির দিকে তাকিয়ে রইল নাবিলা। যতক্ষণ না তা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেল সেদিকে তাকিয়েই রইল। ভেতরে প্রবেশ করতে গিয়ে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। তারপর ফটকের দিকে পিছন ফিরে আবার রাস্তার দিকে হাঁটতে লাগল। সে প্রবলভাবে অনুভব করল মানুষের সাথে মিশে তাদের সাথে আলাপ করার এবং তার মনে যে দ্বন্দ্ব, দুশ্চিন্তা ও অশান্তি বিরাজ করছে তাকে দূরে নিক্ষেপ করার তাগিদ।

১৩

দীর্ঘ দিন হয়ে গেছে তাদের বন্দী জীবন শুরু হয়েছে। জেলখানার বাইরে ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রীদের চিন্তায় ভীষণ মানসিক পেরেশানী ভোগ করছে তারা। সাক্ষাত তো দুরের কথা, সরকারী কর্মকর্তাদের পরীক্ষা নিরীক্ষার পরও সাধারণ চিঠি-পত্র পর্যন্ত তাদের নিকট পৌঁছবার অনুমতি নেই। বন্দীদের একটা বিরাট অংশ স্বাধীন পেশাজীবি মানুষ। কেউ কেউ বিভিন্ন শর্ত ও চুক্তি মোতাবেক নানাবিধ জিনিস সরবরাহ, গৃহ নির্মাণ ইত্যাদি কাজ করে থাকে। কেউ কেউ ছোট খাট দোকানের মালিক। তাদের দোকানের দরজা সিল করে দেয়া হয়েছে। ফলে তাদের পরিবার অনাহারে কাটাচ্ছে। আর মুষ্টিমেয় কিছু সরকারী কর্মচারী আছে, যাদের এখনো বিচারকের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়নি, তাদের বেতন দেয়া হচ্ছে কোন আত্মীয়ের হাতে অথরাইজ লেটারের ভিত্তিতে। এছাড়া অধি-কাংশই হচ্ছে, সাধারণ ছোট খাট পেশার মানুষ। এরা সবাই কিংকর্তব্যবিমুঢ়। কি করবে তা ভেবে পাচ্ছে না। বন্দীরা নিজ নিজ পারিবারিক ব্যাপারে পরামর্শ দান করে চিঠি-পত্র পাঠাইবার অনুমতি দানের জন্যে সামরিক কারাগারের প্রশাস-নিক কার্যালয়ে বহুবার ধর্ণা দিয়েছে। কিন্তু কেউ-ই তাদের কথায় কর্ণপাত করেনি। বন্দীরা এমন কোন সরাসরি মাধ্যম খুঁজে পায়নি যার দ্বারা তারা তাদের আকাংখা বাস্তবায়িত করতে পারে। অবশেষে, গোপনে চোরা পথে তারা তাদের পরিবার পরিজনের কাছে চিঠি-পত্র পাঠাবার চিন্তা করল। কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব? তারা ত থাকে বদ্ধ সেলের অভ্যন্তরে, কঠিন অনুসন্ধানের রক্তাক্ত প্রাঙ্গনে অথবা প্রাত্যহিক শাস্তিমুলক প্যারেডের সারিতে। সৈনিকরা তাদের সাথে কোন বন্দীকে

কথা বলার বা কোন বিষয়ে সামান্য তর্কেরও সুযোগ দেয় না। সৈনিক ও বন্দীদের মাঝের সম্পর্ক হল আদেশ দান ও সাথে সাথে তা প্রতিপালন। আদেশ পালনে সামান্য ত্রুটির অর্থ হল যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। অনেক সময় তা মৃত্যুদণ্ডে গিয়ে দাঁড়ায়। কতবারই ত এমনি ঘটেছে।

কবি ইউসুফ বললেন—বন্ধুগণ! সম্পত্তির উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আমার এক জটিল মামলা কোর্টে ঝুলছে। তার শুনানীর দিনও প্রায় এসে গেল। আমি কি করব তা ভেবে পাচ্ছিনে।

বন্দী 'রেযেক ইবরাহীম' আইন কলেজের ছাত্র। সে বললো—আইনত আপনাকে আদালতে উপস্থিত করতে তারা বাধ্য।

কবি ইউসুফ জোরে হেসে বলল—রেযেক! এখানে আইন সম্পর্কে বলার ব্যাপারে সতর্ক হও।

ফিলিস্তিনী বন্ধু আবদুল হামিদ আন-নাজ্জার বললো—আলহামদুলিল্লাহ ......আমার দেশ, বাড়ী-ঘর এবং বাগ-বাগিচা ইয়াহুদীরা দখল করে নিয়েছে... কঠোর একটি খাটিয়া যার ওপর আমি ঘুমাতাম, একটি বালিশ একটি তোষক ও সামান্য কিছু বই-পত্র ছাড়া আর কিছু আমি পিছনে রেখে আসিনি। আমাদের মিসরীয় ভাই অথবা জাতিসংঘের তরফ থেকে সামান্য যা কিছু সাহায্য দেয়া হয় তা ছাড়া আর কোন আয় আমার নেই। তোমরা মিসরীরা যেমন বলে থাক—এ প্রসাদ থেকে বাতাস কী এমন উড়িয়ে নেবে?

প্রাক্তন সৈনিক অফিসার মা'রূফ আল-হাদারী' সেলের এক প্রান্তে একটি খুঁটির ধারে বসেছিল। পবিত্র কুরআনে যে আয়াতগুলি তার মুখস্ত ছিল—গভীর মনোনিবেশ সহকারে তিলাওয়াত করছিল, আর মাঝে মাঝে উঠে দাঁড়িয়ে নফল নামাজ আদায় করছিল। সবাই তাকে সম্মান করত, বিশেষ করে আবদুল হামীদ আন-নাজ্জার। কেননা, মা'রূফ ছিল ফিলিস্তিন যুদ্ধের বীর যোদ্ধাদের একজন। ১৯৪৮ সালে তার কুরবানী ও বীরত্ব সম্পর্কে মিসরের প্রথম শ্রেণীর পত্রিকাগুলিতে অনেক কিছুই লেখা হয়েছে। তা সত্বেও লোকটি স্বল্পভাষী, অত্যন্ত বিনয়ী, নিষ্ঠাবান ও দয়ালু।

সে বলল—আমরা তো নিজেদের প্রাণ হাতে তুলে নিয়েছি। যে ব্যক্তি নিজের প্রাণ কুরবাণী করতে পারে সে ধন-সম্পদ, জমি-জমা অথবা পৃথিবীর সব কিছু গেলেও ভীত হয় না। সব কিছুই ত ক্ষণস্থায়ী। আমাদের সকল বিষয় আল্লার ওপর সোপর্দ করা উচিত—তাতে যা হয় তা হোক।

একথার প্রতিবাদে কবি ইউসুফ বলল—এটা সত্যি কথা। কিন্তু যাদের দেখা-শুনার দায়িত্ব আমাদের ওপর, তাঁদের কার ওপর ছেড়ে দিই?

ওয়া মাই ইয়াত্তাকিল্লাহা ইয়াজআল্লাহু মাখরাজ—'যে আল্লাহকে ভয় করে তিনি তার জন্যে কোন পন্থা তৈরী করে দেন'—উত্তর দিল মারূফ।

আবদুল হামীদ হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল—শুনলাম, একজন সৈনিক পাঁচ গিনির বিনিময়ে আমাদের চিঠি-পত্র গোপনে বাড়ীতে পৌঁছানো ও তার উত্তর এনে দিতে রাজী।

ইউসুফ বলল—পাঁচ গিনি? এটা ত খুব বেশী। যাই হোক, আমি প্রস্তুত। এ ছাড়া বিকল্প কোন পথ ত নেই। বাইরে আমি একজনের কাছে সত্তর গিনি পাব। আমার বাড়ীর লোকদের তা জানাতে হবে, যাতে তার কাছ থেকে আদায় করে নিতে পারে।

শেখ আবদুল হামীদ আন-নাজ্জার প্রয়োজনীয় যোগাযোগের দায়িত্ব গ্রহণ করল। সত্যিই সে সেই সৈনিককে খুঁজে বের করল। তার সাথে কথা হল, 'কুরী' নামক একজন বন্দীর হাতে চিঠি ও পয়সা দেয়া হবে। আর এই কুরী' ছিল একজন ইয়াহুদী। পাশের একটি সেলে একাকী থাকত। অফিসার ও সৈনিকদের কামরা পরিস্কার এবং তাদের চা নাস্তা তৈরীর জন্যে তার বাইরে যাবার অনুমতি ছিল। এ কারণে দিনের বেশীর ভাগ সময় তাকে সেলের বাইরে কোথাও না কোথাও পাওয়া যেত। 'কুরী' ছিল এক অভিনব ব্যক্তি। সুরা ইয়াসীন ও আরো কয়েকটি ছোট সুরা তার মুখস্থ। সে তার সেলের দরজায় ভিতরের দিকে একজন ইসরাইলী চিত্রতারকার ছবি এঁকে তার পাশে হিব্রু ভাষায় কয়েকটি বাক্য লিখে রেখেছিল। ইখওয়ানীদের হাতে তা ধরা পড়ে। ফিলিস্তিনের একজন প্রাক্তন মুজাহিদ তাকে এমন শিক্ষাই দিল যা তার আজীবন মনে থাকবে। ধোলাই দিয়ে তাকে রক্তাক্ত করে ছাড়ল। কর্তব্যরত সৈনিকটি এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে প্রাক্তন মুজাহিদটির ওপর প্রতিশোধ নিতে থাকলে সে প্রাণে বাঁচে। এরপর ব্যাপারটি জটিল হয়ে পড়ল। সকলের ওপর মুসিবতের পাহাড় নেমে এল। যাই হোক, অবশেষে 'কুরী' চিঠি-পত্র ও পয়সা সৈনিকটির কাছে পৌঁছাতে রাজী হল। সৈনিকটি চুক্তি ভঙ্গ করে। আর সে ছিল নিতান্ত বোকা। সে চিঠিগুলি নিয়ে কেন ডাকটিকেট না লাগিয়েই আল-আব্বাসাহ পল্লী থেকে একটি ডাকবাক্সে ফেলে দেয়। ডাক পিয়নের দৃষ্টিতে তা ধরা পড়ে। আর সে সময় ডাকপিয়নের ওপর কড়া নজর রাখা হচ্ছিল। তারা একটি চিঠি খুলেই বুঝতে পারল এগুলি সামরিক কারাগার থেকে ছাড়া হয়েছে। এরপর তাড়াতাড়ি তারা অন্য চিঠিগুলিও খুলে ফেলল। খুবই দুঃখের বিষয়, সংগে সংগে তারা সামরিক কারাগার, গোয়েন্দা বিভাগ ও সাধারণ অনুসন্ধান বিভাগকে জানিয়ে দিল। চিঠি লেখকের সম্বন্ধে ভয়াবহ অনুসন্ধান চালানো হল। কোড়ার আঘাত ও শাস্তির নানা প্রকার কলা-কৌশল তাদের পূর্ণ স্বীকারোক্তি আদায় করে নিল। কুরী ও তার সাথে সেই সৈনিক এবং পত্র লেখকদের সকলকে রক্তাক্ত প্রাঙ্গনের দিকে হাকিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। সে দিনটি ছিল সাংঘাতিক কঠিন দিন। ঘটনাচক্রে সে দিনটি ছিল আবার ঈদের দিন। তাদের সকলের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। কবি ইউসুফ, শায়খ আবদুল হামীদ আন-নাজ্জার, রেযেক ইবরাহীম, মারুফ আল-

হাদারী প্রমুখও ছিলেন তাদের মধ্যে। এর জন্যে তাদের বড় মূল্য দিতে হয়েছিল। এর কিছু দিন পরে সরকার অবশ্যই বন্দীদের খোলা চিঠি লেখার অনুমতি দেয়। সে চিঠি আট লাইনের বেশী দীর্ঘ হবে না, নির্দিষ্ট কতকগুলি বাক্যেই তা হতে হবে। তবে বাড়ী থেকে কোন জিনিস চেয়ে পাঠাবার প্রয়োজন হলে সংক্ষিপ্ত কথায় তা লিখে নির্দিষ্ট সেনা অফিসারকে তা দেখাতে হবে।

যাই হোক বিপদ কেটে গেলে 'কুরী' তার সেলে ফিরে এল। এবার কিন্তু সেল থেকে বের হবার অনুমতি তার আর রইল না। কবি ইউসুফের কামরাটি হাসপাতালের গুদাম ঘরের রূপ ধারণ করে। মারের চোটে তারা সবাই বিছানায় পড়ে কঁকাচ্ছে, কাতরাচ্ছে। ক্ষত ও কাটাছেঁড়া সত্বেও শায়খ আবদুল হামীদ আননাজ্জার ছিলেন এদের মধ্যে সর্বাধিক উৎফুল্ল। এক টুকরো তুলা হাতে একটি লাল ক্ষতের ওপর ঘষতে ঘষতে বিড় বিড় করে তিনি বললেন—বন্ধুরা, সবই তার প্রতিদান। ব্যথিত হয়ো না। তোমরাই প্রথম ও শেষ দল নও। চিঠি লেখার কোন প্রয়োজনই আমার ছিল না, কিন্তু ছোঁয়াচে ব্যাধির ন্যায় আমাকে সংক্রমিত করে, যেমন সংক্রামিত হয়েছিল আমাদের ভাই মা'রুফ।

মুচকি হেসে মা'রুফ বলল—বাড়ীতে চিঠি লেখার প্রতি আমি তেমন উৎসুক ছিলাম না। তবে আমাদের চতুর্দিকে জুলুম ও জোর-জবরদস্তির যে সুকঠিন প্রাচীর তারা খাড়া করছে তা ভেঙ্গে ফেলাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। তোমরা তাকে ছোটখাট বিদ্রোহ ও বলতে পার। তোমরা ত জান, আমি আত্মসমর্পনের বিরোধী।

শায়খ আবদুল হামীদ জোরে হেসে উঠল। কবি ইউসুফ তার প্রতিবাদ করে বলে উঠল—হাসছ কেন?

—হাসছি এ জন্যে যে, তুমি শুধু গুরুত্বপূর্ণ একখানি চিঠিই পাওনি; বরং তার সাথে চমৎকার কয়েক পংক্তি কবিতাও পাঠিয়েছিল। আর প্রতিটি পংক্তির বিনিময়ে তুমি লাভ করেছ তিনটি করে চাবুক। তুমি যে তোমার বিখ্যাত ও সুদীর্ঘ গীতি কবিতাটি লিখে পাঠাওনি সে জন্যে আল্লার শোকর। তাহলে ত তারা তোমার চামড়া তুলে নিত। আর এখনো পর্যন্ত তোমার ওপর শাস্তি চলতে থাকত।

তাদের শরীরে প্রচণ্ড ব্যথা সত্বেও তারা সকলে হো হো করে হেসে উঠলো। তারপর একটু রসের সুরে আবদুল হামীদ বলল—আমাদের ভাই রেযেক, আল্লাহ তাকে মাফ করুন, গ্রেফতারের আইনগত ভিত্তি সম্পর্কে এক লম্বা চওড়া স্মারকপত্র লিখেছিল। এটাকে সে এটর্নি জেনারেলের হাতে পৌঁছাতে চেয়েছিল।

একথা শুনে রেযেকের চেহারা লাল ও চোখ দুটি জলজল করে উঠল। অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সে বলল—কালিমাত হাককিন ওয়াজিবু আন তুকা-ল-'সত্যি বলা অবশ্য কর্তব্য।' এ কথার পর বন্দী অফিসার মা'রুক বলে উঠল এটর্নি জেনারেলের কথা ছেড়ে দাও। সে মুক্ত হয়েও কিন্তু বড় জেলে বন্দী।

কিছু তুলো রেযেকের ব্যবহারের জন্যে তার হাতে দিতে দিতে শায়খ আবদুল

হামীদ আবার বলতে লাগলেন-হতভাগ্য 'কুরী' ! আগুনে সঁ্যাকা বিড়ালের মতন সে কঁকাচ্ছে। 'বাসর শয্যার সাথে বেঁধে তাকে চাবুকের আঘাতে তুলো ধোনা করা হচ্ছিল। আর চিৎকার করে বলছিল 'পাপী ইস্রায়ীল ধ্বংস হোক, ইবনে জুরিয়ুন নিপাত যাক, আমি মিসরী, আমায় দয়া করুন।'

ইউসুফ তার 'নুন' অন্তমিল বিশিষ্ট কবিতা অথবা তার সেই বিখ্যাত গীতি কবিতার কিছু শ্লোক আবৃত্তি করতে শুরু করল। অন্তরে গেঁথে নেয়ার উদ্দেশ্যে অন্য ইখওয়ানীরাও তার সুরে সুর মিলিয়ে তা আওড়াতে লেগে গেল।

বন্দীদের দলন-পীড়ন এখানেই কিন্তু ক্ষান্ত হল না, অফিসার ও সৈনিকরা মিলে ভয়াবহ তল্লাশী অভিযান শুরু করে দিল। তাদের কথিত বেতার যন্ত্র উদ্ধারের উদ্দেশ্যে সাবান, রুটি বা কাপড় চোপড় সবই ছিঁড়ে কেটে তছনছ করে ছাড়ল। কারণ হল, বন্দীদের প্রতি যেদিন এ অত্যাচার উৎপীড়ন চলছিল ঘটনাক্রমে সে দিনই একটি আন্তর্জাতিক বেতার মাধ্যমে সামরিক কারাগারের এ ভয়াবহ পরিস্থিতির খবর প্রচার করা হয়। এ তল্লাশীতে যাদের কাছে এক টুকরো কাগজ বা কয়েক সেন্টিমিটারে দীর্ঘ একটি কাঠপেন্সিল পাওয়া গেল, তাদের সে-দিন সে কি মারাত্মক দুর্দশা !

এভাবে ঈদের দিনটি অতিবাহিত হল সর্বাধিক দুঃখের দিন হিসেবে। খাওয়া-দাওয়ার কোন নাম নেই, ঘুমও নেই, এমন কি এ সম্পর্কে মত বিনিময়ের কারো কোন সুন্দর অনুভূতিও নেই।

অশ্রু, ব্যথা, ক্ষত এবং নানা প্রকার স্মৃতির মিশ্রণে প্রতিটি মুহূর্ত অতিক্রম করছিল তারা এবং প্রত্যেকের অন্তরে এক গভীর বেদনার সঞ্চার করছিল। এসব সত্ত্বেও আল্লার অনুগ্রহে এ হতভাগ্যদের অন্তরে এক প্রকার প্রশান্তি বিরাজমান ছিল। তবে এই ভীতি, গ্লানি ও অস্বস্তিকর পরিবেশ কারাগারের প্রতিটি কোণে এমন এক ভয়াবহ নিরবতা সৃষ্টি করেছিল যা বাস্তিল দুর্গের ভয়াবহতাকেও হার মানিয়ে ছিল। মারুফ বলল—লাইসাল ঈদু লিমান লুবিসাল জাদীদ, ওয়ালা-কিন্নালঈদু লিমানখা-ফা ইয়াওমাল অয়ীদ—যারা নতুন জামা কাপড় পড়েছে তাদের জন্যে ঈদ নয়, যারা শেষ বিচার দিনকে ভয় করে প্রকৃত পক্ষে তাদের জন্যে ঈদ।

মুচকি হেসে শায়খ আবদুল হামীদ মন্তব্য করল– আলহামদুলিল্লাহ ! তাহলে ত আমরা সব সময় ঈদের মধ্যেই আছি।

রেযেক ইবরাহীম হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। তার পাতলা লিকলিকে গৌরবর্ণের হাত দু'খানা লম্বা করে উপরের দিকে উঠাল। বাঁশের চটা দিয়ে ঘন করে ঘেরা ছোট্ট জানালার দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত বিমর্ষভাবে কবি মুতানাব্বির সেই বিখ্যাত কাসিদাটি আবৃত্তি করতে লাগল। সে কবিতার দু'টি পংক্তি হল এরূপ—'ঈদ ! কি নিয়ে আবার তুমি ফিরে এলে/হে ঈদ ! যা নিয়ে গিয়েছিলে, তাই ?/না নতুন কিছু আছে তোমার মাঝে/আর বন্ধুরা ! তাদের সামনে ত বিস্তীর্ণ নির্জন প্রান্তর,/ কতই না ভাল হত, যদি থাকত তোমার সামনে ধ্বংসের পর ধ্বংস।'

তার বিনম্র ও ধৈর্যশীল চোখের পানিতে গণ্ডদ্বয় ভিজে গেল। আবদুল হামীদ চেষ্টা করল এই বিষাদময় পরিবেশ দূর করার জন্যে। সে একটু উৎফুল্লতার ভান করে বলল—রেযেক তুমি কাঁদছ? তুমি না একজন মহান আদর্শবাদী। আইনজ্ঞ।

ভাঙ্গা গলায় রেযেক বলল—আমাদের এ অশ্রু সত্যের মিহরাবে নামাজের ন্যায় মূল্যবান। আমার এ কান্না ভয়ের কারণে নয়। তবে অক্ষমতার মুখেই শুধু আমি চিল্লাচিল্লি করি। অক্ষমতা এক জঘন্য বন্দীদশা। আমাকে যদি তারা কোন যুদ্ধে পাঠাতো, আর সেখানে আমি মারা যেতাম, তাহলে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করতাম।

দরজায় চাবি ঘোরানোর শব্দে হঠাৎ নিরবতা নেমে এল। একজন সৈনিক উপস্থিত হল। তার চোখ-মুখ থেকে যেন ক্রোধ ঝড়ে পড়ছিল। তারা সকলেই উঠে দাঁড়াল এবং তাদেরকে যেভাবে শিক্ষা দেয়া হয়েছে সে অনুযায়ী সামরিক কায়দায় তারা স্যালুট জানাল। তখন সমস্বরে তারা চীৎকার করে বলে উঠল—

তামাম ইয়া আফিন্দাম—ধন্যবাদ আফিন্দী। সৈনিকটি বলল। একে তোমাদের মাঝে রাখ। সবাই চোখ উঠিয়ে তাকাল। একজন যুবক প্রবেশ করল। নগ্ন ক্ষত-বিক্ষত শরীর। ছোট্ট, সরু একটা পায়জামা ছাড়া তার শরীরে আর কোন পোশাক নেই। তার শরীরে জঘন্য ধরণের শাস্তির চিহ্ন স্পষ্ট। একটি ছেঁড়া-কাটা তোষক বগল দাবা করে দুর্বল ও ক্ষীণপদে সে এগুচ্ছিল। এছাড়া আর কোন কিছু তার কাছে নেই। দরজা বন্ধ করা হলে অত্যন্ত দুর্বল ও কাঁপা গলায় সে বলল—আস্‌সালামু আলাইকুম।

—ওয়া আলাইকুম আসসাম।

প্রত্যেকেই একটু সরে সরে তাকে জায়গা করে দিল। মা'রুফ তার হাত থেকে তোষকটি নিতে নিতে বিড়বিড় করে বলল—আজরওয়া আফিয়াহ্‌ ইয়া আখী—প্রতিদান, ক্ষমা—হে বন্ধু!

সে শুকরিয়া জ্ঞাপন করতে করতে মাথা নাড়ল। তারপর বসে দম নিতে থাকল। দুই তিন মিনিট নিরবতা। তারপর নতুন মেহমান নিজের পরিচয় দিয়ে বলল—আপনাদের ভাই মাহমুদ সাকার। মানিয়াতুল বান্‌দারাহ্‌ থেকে এসেছি।

মা'রুফ বলল—আহলান বিকা—স্বাগতম।

রেযেক ইবরাহীমের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেল। তাড়াতাড়ি সে প্রশ্ন করল—তোমার ঘটনাটি কি?

—কিছুই না।

আবদুল হামিদ তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল—রেযেক তুমি একটু শান্ত হও। তাকে দম নিতে দাও।

মাহমুদ একটু মুচকি হাসল। এ হাসিতে তার বিষন্ন চেহারাটি উজ্জল হয়ে উঠল। সে বলল—আপনাদের কাছে আসতে পেরে আমি নিজেকে যে কতবড় সৌভাগ্যবান মনে করছি, তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। কোড়ার আঘাতের

চেয়ে একাকী নিঃসঙ্গ বন্দীদশা আমার কাছে ছিল অধিক যন্ত্রণাদায়ক। আমি যে কথা বলার জন্যে কাউকে কাছে পেলাম, এটা আল্লার বিরাট অনুগ্রহ। এখন আপনারাই আমার শান্তনা, ব্যথা ও ভালোবাসা, যদি আমি আপনাদের মাঝে মারা যাই, সেটাই হবে আমার চরম শান্তি ও আনন্দ।

রেযেক তার ঠোঁট দু'টি চেটে নিয়ে বলল—তারা তোমাকে ভীষণ কষ্ট দিয়েছে।

—আল্লার রাস্তায় এসব কিছুই না। প্রথম দিকেই কেবল কোড়ার আঘাত অনুভব করতাম। পরে আর তা তেমন তীব্রভাবে অনুভূত হত না। আমি নিজেকে পুরোপুরি সঁপে দিয়েছি। আমার আর কি-ই বা করার আছে? সেটা এমন কয়েকটি মুহূর্ত, যখন তুমি তোমার চারপাশে তাকালে এক আল্লা ছাড়া আর কাউকে দেখতে পাবে না। আর সে সময়ই তুমি তাঁর নৈকট্য লাভ করবে। তোমার ডাকে তিনি সাড়া দেবেন। তুমি তাঁর কাছে শেকায়েত করবে, তোমার অন্তরে প্রশান্তি নেমে আসবে। সম্ভবত এটাই জীবনের প্রিয়তম মুহূর্ত, সত্যিকারের এটাই নির্জন, নিরিবিলি ও ইতেকাফের মুহূর্ত। যদিও শয়তানরা চাবুক হাতে তোমাকে ঘিরে থাকে।

বাঁশীর উচ্চ শব্দ শোনা গেল। আবার নিরবতা নেমে এল। একজন সৈনিকের গলার আওয়াজ তাদের কানে এল। দূর থেকে সে চীৎকার করে বলছে— তা'ঈনের জন্যে প্রতিটি সেল থেকে দু'জন করে।

'তাঈন' বলতে বন্দীদের জন্যে নির্ধারিত খাবারকে তারা বুঝে থাকে। আবদুল হামীদ ও রেযেক লাফ দিয়ে উঠল। তাদের দু'জনের সাথে মারুফও। কিন্তু আবদুল হামিদ তাকে বলল ভাই মা'রুফ! তুমি থাক। আল্লার নামে বলছি, তুমি যাবে না। এরপর মা'রুফের নিজ স্থানে ফিরে আসা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

তা'ঈনের জন্যে খাওয়াটা ছিল নিজের সত্তাকে এক প্রকার অস্বীকৃতি ও কুরবানীর নামান্তর। যারা খাবার বা অন্য কিছু আনার জন্যে যেত তাদের চাবুকের আঘাত অবশ্যই সইতে হত। এ কারণে বৃদ্ধ ও রোগীদের যেতে দেয়া হত না। বন্দীদের মাঝে এটা একটা ঐক্যমত বা অলিখিত নিয়মে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। মা'রুফ বড় কষ্ট পেত। কারণ তার সাথীরা তাকে এ কাজটিতে যেতে দিত না। সে অনেক সময় যাওয়ার জন্যে বাড়াবাড়ি করত। তার দাবী হল, সেও তাদের একজন। অন্যেরা যে দুর্ভোগ পোহাবে, তারও তার অংশীদার হওরা উচিত। দায়িত্ব ও পরিণতির জন্যে তারা সকলেই ত সমঅংশীদার। সে মনে করে, অত্যাচার ও নিপীড়ন ত তাদেরকে আল্লার নিকটবর্তী করে দিচ্ছে। এর মাধ্যমেই ত আল্লাহ তার বান্দাদেরকে পরীক্ষা করেন। এরপর রেযেক আবার বলতে থাকল— ভাই মাহমুদ! তুমি কি গোপন ষড়যন্ত্রকারীদের নেতাদের কেউ?

মুচকি হেসে মাহমুদ বলল—আমি তোমারই মত। কিন্তু রেযেক তো অনেক রেযেক।

মনে হচ্ছে তোমার রেযেক অনেক।

—হাযা মিন ফাদলিল্লাহ। আমি নিজে ত কোন কিছু গোপন করিনা। আর তারা আমার সাথে এমনটি করছেই বা কেন, তাও আমি বুঝে উঠতে পারছিনে। তোমার কি মনে হয়, আমার জানা নেই এমন কোন অপরাধ আমি করেছি? অবশেষে আমি নিজেকে শান্তনা দিয়েছি কোন জিনিসকে দর্শন শাস্ত্রের ন্যায় চুলচেরা ব্যাখ্যা কর না। এমনটি করলে পাগল হয়ে যাবে। এখানে কোন কথা নেই, নেই মানবতা, নেই নিয়মনীতি, আর নেই কোন আইন কানুন।

ডালের বাটির চারপাশে লোকেরা হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। তারা আগ্রহের সাথে খাচেছ। কিন্তু কতক্ষণ! কিছুক্ষণের মধ্যেই রুটি শেষ হয়ে যাবে, আর বাটিও যাবে শুন্য হয়ে।

আবদুল হামিদ গমগম করে বলল—আমার পেটে এখনো খিদে রয়েছে, একটা রুটিতে কি পেট ভরে? অত্যন্ত শক্ত গলায় রেযেক বলে উঠল—ভাই, আল্লার প্রশংসা করো, খিদে থাকলে সুস্থ থাকবে।

আবদুল হামিদ তার জিহবা দিয়ে ঠোঁট দু'টি ভিজিয়ে নিয়ে বলল—ইস, আমি যদি ওদের সাথে থাকতে পারতাম।

রেযেক প্রশ্ন করল—কাদের সাথে?

—ডাঃ আজমী ও কুকুরগুলির সাথে।

সবাই হেসে উঠল, আর সেই সাথে মাহমুদও।

১৪

উতওয়ার আচার আচরণে নাবিলা মাঝে মাঝে হতভম্ব হয়ে যায়। উতওয়া এক অভিনব ধরণের মানুষ। নাবিলা সারা জীবনে এমন লোক আর দু'টি দেখেনি। বুঝা যায়, উতওয়া এত ব্যাপক ক্ষমতার মালিক, যা নাবিলার চিন্তার বাইরে। তা না হলে উতওয়া নাবিলার অবস্থান জানল কি করে? আর যেদিন নাবিলাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল সেদিন উতওয়া পাপিষ্ঠদের নর্দমা থেকে কি ভাবেই বা তাকে বের করে নিয়ে এসেছিল? তাছাড়া এত অর্থই বা উতওয়াকে জোগায় কে? নাবিলা দেখেছে উতওয়ার মানি ব্যাগটি টাকার নোটে ভরা। পরে সে আরো জেনেছে, টাকার ব্যাপারে উতওয়া বড়ই উদাসীন। নাবিলার হোটেল ভাড়া বাবদ বিশ গিনি উতওয়াই ত দিয়ে দিয়েছে। প্রথম প্রথম সত্যিই নাবিলা উতওয়ার সম্পর্কে চিন্তা করে বিস্মিত হয়ে যেত—যখন নাবিলা তাকে ভালোবাসত এবং তাকে বিয়ে করার আশা করত। আর আজ এমন এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে, নাবিলা উতওয়াকে মোটেই বরদাশত করতে পারে না, কেবল ভয় করে। এ পরিবর্তন কোন কল্যাণ বয়ে আনেনি। নাবিলার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে, তার সাথে জীবনযাপন করা অসম্ভব। কিন্তু সে উতওয়ার বেষ্টনী থেকে বের হবে

কি করে? উতওয়া নিজে জামিন হয়ে নাবিলাকে তাদের হাত থেকে ছাড়িয়ে এনেছে। এ দিকটি ত উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। তাছাড়া ইচছা করলে উতওয়া নাবিলা এবং তার পরিবারবর্গকে আবার কোন বিপদে ফেলে দিতে পারে। যেহেতু তার হাতে রয়েছে বিপুল ক্ষমতা, রয়েছে ক্ষমতার উচ্চ পর্যায়ের লোকদের সাথে গভীর সম্পর্ক। তাছাড়া তার মাথায় রয়েছে এমন সব ধ্বংসাত্মক চিন্তাদর্শন, যা নাবিলাকে ক্ষমা করবে না। তাই বুদ্ধিমত্তা, ধৈর্য ও বিচক্ষণতার প্রয়োজন।

ইস্পাত ছাড়া লোহা কাটা যায় না। ইসকানদারিয়ায় পৌঁছে নাবিলা যে শান্তিটুকু পেয়েছিল, এখন তা আর পাচেছ না। হোটেল তাকে আকর্ষণ করছে না। অন্য একটি নিরাপদ অবস্থান অবশ্যই তাকে খুঁজতে হবে। যে কোন মূহুর্তে উতওয়া এখানে আবার এসে পড়তে পারে। তাই সে হোটেল থেকে বাকী পয়সা ফেরত নিয়ে এবং মাঝ রাতে হোটেল ছেড়ে 'মুহরিম বেগ' পল্লীতে তার এক বান্ধবীর কাছে গিয়ে উঠল। বাকী ছুটিটুকু এখানে কাটাবে বলে সিদ্ধান্ত নিল। বান্ধবীর কাছে গিয়ে সত্যিই নাবিলা শান্তি পেয়েছিল। একটি নির্মল আনন্দে নাবিলার দিনগুলি কেটে গেল। অতীতের তিক্ত স্মৃতি এবং থেকে থেকে ভেসে আসা ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা তার আনন্দ মাঝে মাঝে ম্লান করে দিয়েছে অবশ্য। এ ভাবেই তার কায়রোয় আসার সময় ঘনিয়ে এল।

বাড়ী ফিরেই নাবিলা উতওয়াকে দেখতে পেল। নাবিলার মা নাবিলাকে জড়িয়ে ধরে মাথায় ও মুখে চুমু দিতে লাগল। তার আব্বাও তার মাথায় চুমু দিয়ে তার নিরাপত্তার জন্য দোয়া করল। আর পরিবারের অন্য সদস্য ও শিশুরা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বিভিন্নভাবে তাদের আবেগ—অনুভূতি প্রকাশ করতে থাকল। নাবিলা এই অকৃত্রিম ভালোবাসার মধ্যে ডুবে গিয়ে আকাংখা ও সন্তুষ্টির স্বপ্ন দেখতে লাগল। আর উতওয়া? সে ঠায় বসে বসে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে এই চিত্তাকর্ষক দৃশ্য উপভোগ করতে থাকল। সবশেষে নাবিলা উতওয়ার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল—কায়ফা হালুকা ইয়া উতওয়া—উতওয়া কেমন আছ?

উতওয়া এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলের মধ্যে ঢুকিয়ে চিবুকের নীচে ঠেস দিয়ে বসেছিল। এ অবস্থায় সে উত্তর দিল—তুমি যেমনটি দেখছ...দীর্ঘ প্রতীক্ষায় আমি ক্লান্ত। বিশেষ করে দ্বিতীয়বার ইসকানদারিয়ার হোটেলে তোমাকে না পেয়ে। অবশ্যই তুমি মানসিক দিক দিয়ে অসুস্থ। এ অবস্থায় এত দীর্ঘ সময় তোমার কোন খোঁজ খবর না নেওয়া সমীচিন মনে করিনি।

—'দুঃখিত' বলে নাবিলা মাথা ঝাঁকাল।

—আমার থেকে পালানোর জন্য সব সময় চেষ্টা করে গেলে। এর কারণ কি, তা আমি জানতে পারলাম না।

—উতওয়া! এমনটি ভেব না। আমি ত ভবিষ্যৎ জানিনে। যদি জানতাম তুমি যাবে, তাহলে অবশ্যই তোমার প্রতিক্ষায় থাকতাম।

উতওয়া তার দিকে দীর্ঘক্ষণ রাগত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে উঠল—জানবে।

—তুমি খুবই সন্দেহপরায়ণ ! কিভাবে জানব।

—বুদ্ধি দিয়ে।

নাবিলা বুঝতে পারল তার প্রতি উতওয়ার বিশ্বাস ও সন্তুষ্টি পুনরায় ফিরিয়ে পাবার লক্ষ্যে কিছু একটা করা দরকার। নিরবে ক্ষণিক চিন্তা করেই তার কাছে এগিয়ে গেল। পাশে দাঁড়িয়ে কাঁধে একটি হাত রেখে নাবিলা বলল—আজ রাতে আমরা কোথায় বেড়াতে যাব ?

উতওয়া চাপা আনন্দে ফেটে পড়ল। মুচকি হাসি দিয়ে বলল—অবশ্যই আমরা সিনেমায় যাব না।

—তা আমি জানি।

উতওয়া বলল—'মিনা হাউস' হোটেলে আজ চমৎকার একটি অনুষ্ঠান আছে।

নাবিলা আবার হোটেল বেশী পসন্দ করবে না। সুন্দরী স্ফূর্তিবাজ নারী তাদের রাত্রি জাগরণের অশ্লীল বেশ-ভুষা, পরিকল্পিত কার্যকলাপ, অনুজ্জ্বল বাতি, মদের পিয়ালা ইত্যাদিতে সে শিগগিরই বিরক্ত হয়ে পড়বে। ধনাঢ্য ব্যক্তিরা অবলীলাক্রমে বড় বড় নোটের বাণ্ডিল ছুঁড়তে থাকবে বিছানো গালিচার ওপর। এর হেতু কি, তা সে কিছুই বুঝবে না। তবে সে তার আন্তরিক ঘৃণা ও বিরক্তির সাথে তা উপলব্ধি করবে। এ অবস্থা থেকে বাঁচার কোন পরিকল্পনা ও উপায় বের করা দরকার। নাবিলার কাছে যদি পুরাপুরি বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে, আর সে যদি তার কাছে নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হতে পারে, তাহলেই কেবল সেই বিরক্তির হাত থেকে নিস্কৃতি পাওয়া সম্ভব। উতওয়ার মাথায় এ সব চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল। সে বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল—আমরা এক্ষুণি বেরিয়ে পড়িনা কেন ?

নাবিলার মা বললেন—সফরের ক্লান্তি দুর করার জন্য একটু বিশ্রাম করা প্রয়োজন। তোমরা তো সন্ধ্যায়ও যেতে পারো। নাবিলার মা অবাক হয়ে গেলেন, যখন তিনি শুনলেন তার মেয়ে বলছে—না, মা আমরা এখনই যেতে চাই। উতওয়া আমাকে খুবই ভয় করছে।

উতওয়া গোঁফের তলে একটা লম্বা হাসি দিল। এ সময় নাবিলার মা বল-লেন—কিন্তু……

উতওয়া তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল—আম্মা ! আবার 'কিন্তু' কেন ?

মা খানিকটা বিনয়, এবং স্নেহের স্বর মিশিয়ে মাথাটা ঝুঁকিয়ে বললেন—না, কিছু না।

একটু ব্যাখ্যা করে নাবিলা বলল—আগামীকালই আমি স্কুলে যাব। অনেক কাজ পড়ে আছে। দায়িত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা ঠিক নয়। যতটুকু ক্ষতি হয়ে গেছে তা পুষিয়ে নেয়া দরকার। এ কারণেই এক্ষুণি বের হওয়া চাই।

উতওয়া বলল—এই স্কুলটি হচ্ছে গলায় বেঁধে যাওয়া কাঁটার মত। এটা ছেড়ে দাও না কেন ?

—সময় এলেই হবে !

উতওয়ার পাশে বসে তার সুদৃশ্য মূল্যবান গাড়ীতে কয়েক মিনিট চলার পর নাবিলা ডাকল—উতওয়া !

—প্রিয়তমা !

—তোমার কাছে আমার একটি অনুরোধ আছে, কথা দাও তা কি পূরণ করবে?

—তোমার কোন অনুরোধ কি আমি ফেলতে পারি ?

—তুমি কি কসম করে বলছ ?

—তোমার জীবনের শপথ ।

নাবিলা তার একটি বাহু উতওয়ার ঘাড়ের পাশে রেখে বলল—আমি একটু সালওয়ার সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই । বন্দীনি আমার সাথে ছিল ।

উতওয়া অবাক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল—এ মুহূর্তে আবার তার কথা স্মরণ হল কেন ?

নাবিলা চাইল উতওয়াকে একটু ফুলাতে । তাই সে বলল—আমি তার কাছে অঙ্গীকার করেছিলাম । তাকে বলেছিলাম আমার ভাবী বর একজন বড় কর্মকর্তা । কিন্তু সে তা বিশ্বাস করেনি ।

উতওয়া হেসে ফেটে পড়ল । তারপর বলল—এটা এক প্রকার গর্ব ও অহংকার । আমি তা জানি । বেশ ভালো কথা, আমরা প্রথমেই সামরিক কারাগারে যাব ।

নাবিলা জিজ্ঞেস করল—সে কি এখনো সেখানে আছে ?

—সেখানে না গিয়ে, সে এখন কোথায় আছে তা আমরা জানতে পারব না ।

—সে ত সাধারণ অনুসন্ধান বিভাগে ।

—ওটা হচ্ছে অস্থায়ীভাবে থাকার স্থান । বন্দীরা সেখানে অল্প সময়ই থাকে ।

উতওয়া তার গাড়ী চালিয়ে সদর দরজা পেরিয়ে গেল । সৈনিকরা তাদের ভারী বুট দিয়ে মাটিতে আঘাত করে হাত উঠিয়ে স্যালুট মারছে । ফটাফট দরজা খুলে যাচ্ছে, বিউগল বেজে উঠছে । অবাক বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে নাবিলা সব কিছু তাকিয়ে দেখছে । তার অন্তরটা দুরু দুরু করছে, তাকে সে ভালোবেসে ফেলেছে । এমন একটি দিন যায় না যে দিন তাকে সে স্মরণ করে না ।

কারাগার প্রাঙ্গনে গাড়ী পেঁছিলে নাবিলা যা দেখল তাতে ভীষণ ব্যথা পেল সে । তার যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না । একজন মানুষের পা উপরের দিকে আর মাথা নিচের দিকে করে বাঁধা । একজন সৈনিক একটি রশির এক প্রান্ত ধরে টেনে তাকে উপরে উঠিয়ে আবার ছেড়ে দিচ্ছে । হতভাগ্য লোকটির মাথা নিচের দিকে নামতে নামতে হাউজের পানিতে ডুবে যাচ্ছে । তার নিঃশ্বাস পানির ভেতর থেকে বুড় বুড় করে উঠে আসছে । মনে হল, সে দম আটকে মরে গেছে । নাবিলা জোরে চিৎকার করে উঠল—এ আবার কি ? লোকটি ত মারা যাবে ।

অত্যন্ত কঠিন সুরে উতওয়া বলে উঠল—চুপ কর—আমাদের আতংকিত কর না । সম্ভবত সে স্বীকার করছে না ।

—এটা ত পশুত্ব । এ কি তুমি সমর্থন কর ?

—এটা ত আমারই নির্দেশ।

—মুসতাহীল—অসম্ভব।

ব্যাপারটি দেশের নিরাপত্তার সাথে জড়িত। মিসর আজ চার দিক থেকে শত্রু বেষ্টিত।

বড় আঙ্গিনাটির দিকে নাবিলা দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখতে পেল আর এক লোমহর্ষক দৃশ্য। মানুষের পা ও উরু চাবুকের আঘাতে জর্জরিত করা হচ্ছে। চিৎকার, কান্নাকাটি আর আহাজারিতে জায়গাটি মুখরিত। নগ্ন শরীর থেকে লাল রক্ত গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। নাবিলা কিছুক্ষণ সে দিকে তাকিয়ে থাকার পর হঠাৎ মুখ থুবড়ে পড়ে গেল।

উতওয়া তাকে তুলে নিয়ে অফিস ঘরের দিকে যেতে যেতে হো হো করে হেসে বলতে লাগল—মেয়েরা বড় দুর্বল।

ডাক্তার ডাকা হল। ওদিকে কুকুরগুলি ঘেউ ঘেউ করছে, সাদা দাঁত দিয়ে মানুষকে কামড়াচ্ছে, ছিঁড়ছে।

উতওয়া সব কিছু বন্ধ করার নির্দেশ দিল, পিনপতন নীরবতা নেমে এল। সৈনিকরা চলে গেল। সন্ধানী অফিসার ও কয়েদীরা নিজ নিজ স্থানে থাকল। একটি ইনজেকশন পুশ করার কয়েক মিনিট পরেই নাবিলা জ্ঞান ফিরে পেল। তার চার দিকে সে দেখতে পেল, বহু চোখ তাকে ঘিরে রয়েছে। আস্তে আস্তে সে বলল—তোমরা কি করছ?

উতওয়া জবাব দিল—এমনটি সব সময় ঘটে থাকে। প্রতিটি যুগে প্রতিটি স্থানে। নাবিলার বুক থেকে দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। হায়রে মানুষ!

উতওয়া জোরে হেসে উঠে বলল—এ কথাটি তুমি কোন ফিল্ম থেকে শুনেছ?

—উতওয়া! এখানে তুমি থাক কেন? তুমি যে সব সৈনিকের কমাণ্ডার তাদের কাজ কি এই? একথা বলতে বলতে নাবিলা জোরে উতওয়ার একটি বাহু মুঠ করে ধরল।

সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল—অবশ্যই। সৈনিকরা আজ দেশ চালায়। যুদ্ধ করে। নিরাপত্তা ও শান্তি শৃংখলা রক্ষা করে। মিসরের জনজীবনের প্রতিটি দিকই ত তারা দেখাশুনা করে থাকে। তুমি কি বিপ্লবের কথা শোননি?

বিস্ময়ের সুরে নাবিলা বলল—বিপ্লব!

—হ্যাঁ। প্রতিটি জিনিসের ব্যাপক পরিবর্তনই হল বিপ্লব। অতীতের লোকেরা যে ভুল করেছে আমরা তা সংশোধন করব।

রক্তাক্ত আঙ্গিনায় যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের দিকে হাত দিয়ে ইশারা করে নাবিলা বলল—এরাই কি পূর্বেকার শাসকবৃন্দ নয়?

—হ্যাঁ, এরা তারাই। কিন্তু তারা প্রতিবাদ করে।

—তাতে এমন কি হয়েছে?

—হয়েছে ধোকা বাজি, হয়েছে দেশের ধ্বংস।

—এ কথা কে বলেছে, উতওয়া ?

—আমরা।

—তোমরা কারা ?

—জাতিকে রক্ষায় নিয়োজিত জাতির সূর্যসন্তান।

—এ হতভাগ্যরাও ত জাতির সন্তান।

নাবিলার একটি হাত ধরে তাতে একটু মৃদু চাপ দিয়ে উতওয়া বলল—তুমি ছাড়া অন্য কেউ যদি এ কথা বলত তাহলে তাকে আমি যবেহ করে ফেলতাম। কারও সামনে আর কখনো এ কথা বলবে না। তোমার ভাগ্য ভাল যে, অন্যরা চলে গেছে। ফলে আমরা এ পরিবেশটি পেয়েছি। এ ধরণের ধ্বংসাত্মক মতামত প্রচারের ব্যাপারে সতর্ক হও।

নাবিলা চোখ বুজে চুপ করে বসে থাকল। উতওয়ার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল—কিছু পান করবে।

মুতাশাক্কিরাহ—শুকরিয়া। আমার খারাপ লাগছে। আমাকে এখান থেকে নিয়ে চল।

—কি হল ? সালওয়াকে দেখবে না ? নাবিলা বলল—কোথায় সে ?

—একটু অপেক্ষা কর।

ব্যাপারটি জানার জন্য উতওয়া বের হয়ে গেল। খোলা দরজা দিয়ে নাবিলা তাকিয়ে দেখতে পেল, মাটিতে চোখ রেখে মাথা নিচু করে কয়েদীরা দাঁড়িয়ে আছে। ব্যথা-বেদনা ও আহাজারিই হচ্ছে তাদের ছায়া। কেউ কেউ মাটিতে অসাড় হয়ে পড়ে আছে। বিড় বিড় করে নাবিলা বলে উঠল, 'ইয়া ইলাহী ! এটা কি ভালোবাসা, স্বাধীনতাও উন্নতির পথ হতে পারে ? কোন পাগলও কি এমন কথা বলতে পারে ? কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি তা বিশাস করতে পারে ? মনে হচ্ছে ষড়যন্ত্রের একটা বিস্তীর্ণ জাল এখানে তৈরী করা হচ্ছে। জাতীর প্রাণ সত্তার ধ্বংস ছাড়া এ দিয়ে আর কোন উদ্দেশ্য সাধন হতে পারে না। এভাবে জাতিকে মহান মুল্যবোধগুলির অস্বীকৃতির প্রতি ঠেলে দেয়া হচ্ছে। হায় আল্লাহ ! আর আমি এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আমি ত আগামী দিনের নতুন জাতিকে ইতিহাস পড়াই। তাদের স্বাধীনতা, ন্যায় বিচার ও বীরত্বের কথা শিক্ষা দিই। বিপ্লব ও তার উজ্জ্বল ঐতিহাসিক ভূমিকার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠি। আমি কী অপরাধ করেছিলাম ! এরপর আমি কি আবার ক্লাশে দাঁড়িয়ে একই ভূমিকা পালন করতে পারব ? বিরাট এক আশার জগতে বাস করছিলাম। আমার চোখের ঘুম চলে গেছে। আজকের এদিনটির পরে আমি কি আর ঘুমোতে পারব ? পত্র-পত্রিকা মিথ্যা লেখে, শিল্পীরা মিথ্যা বলে, রেডিও মানুষকে ধোকা দেয়, শাসকরা মিথ্যা বলে। অধিকাংশ মানুষই পথ হারিয়ে হতভম্বের মত ঘুরে বেড়ায়, যেন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলেছে। এ বিরাট বেদনাদায়ক মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার জগতে তারা সকলে যেন আন্দাজ ও অনুমানের মধ্যে বাস করছে।

সালওয়াকে আর কখনো দেখতে পাবেনা। একথা বলতে বলতে উতওয়া এসে ঢুকল। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে নাবিলা উঠে দাঁড়িয়ে বলল—সে কি মারা গেছে?

—না তাকে ছেড়ে দিয়েছে—এই তার ঠিকানা। একথা বলে উতওয়া তার সামনে ছোট্ট এক টুকরো কাগজ মেলে ধরল। নাবিলা কাগজখানি হাতে নিয়েই পড়তে লাগল। এরপর উতওয়া বলল—দেখ, তার সাথে আবার যেন দেখা করতে যেও না। নাবিলা মাথা উঁচু করে প্রশ্ন করল—কেন?

—তাকে নজরবন্দী অবস্থায় রাখা হয়েছে।

—তার মানে?

—তার মানে হচ্ছে, যারা তার সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করবে, তারা নিজে-দের ওপর বিপদ ও সন্দেহ ডেকে আনবে। তাদের গ্রেফতার করা হতে পারে।

নাবিলা যেন চিন্তা করতে করতে মাথা ঝাঁকাল। তারপর ভ্যানিটি ব্যাগটি খুলে তাতে কাগজখানা ঢুকাতে ঢুকাতে বলল—কিন্তু,আমি যখন উতওয়ার বাগদত্তা, তখন কেউ আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না।

এ কথায় উতওয়া খুশি হয়ে বলল—অবশ্যই। তবে তাদের আমি বলব, তুমি আমাদের একজন সাহায্যকারী।

—অর্থাৎ তুমি কি বুঝতে চাচ্ছ?

—আমি বলতে চাচ্ছি, তুমি আমাদেরই একজন গোয়েন্দা।

—তোমার যা খুশি তা তুমি তাদের বলতে পার।

নাবিলার একটি কাঁধ ধরে উতওয়া বলল—ব্যাপারটি এত সহজে হবে না। এর জন্যে তোমাকে যথেষ্ট মূল্য দিতে হবে। তোমার কাধে বিরাট এক দায়িত্ব চাপান হবে। নাবিলা বলল—কী সে দায়িত্ব?

তোমার ও সালওয়ার মাঝে যে সব কথাবার্তা হবে, তার একটা রিপোর্ট তোমাকে লিখতে হবে। তাহলেই তুমি প্রেসিডেন্টের সেবক, গোয়েন্দা সার্কেলের একজন বলে বিবেচিত হবে।

নাবিলা তার দিকে অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল—তোমার স্ত্রী 'জাসুস-গিরি' করুক, এটাই কি তুমি চাও?

উতওয়া হো হো করে হেসে উঠে বলল—এর মাধ্যমেই তুমি দেশের সেবায় একটি পবিত্র দায়িত্ব পালন করবে। এটা কোন জাসুসী নয়। আর নামেই বা কি আসে যায়। আমাদের দৃষ্টিতে এটা একটা পবিত্র কাজ।

খোলা দরজা পথে রক্তবর্ণ আঙ্গিনার দিকে নাবিলা তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লোকেরা আধা উলঙ্গ অবস্থায় রোদে দাঁড়িয়ে, এটা ত ইতিহাসের একটা রক্তভেজা পাতা। এ পাতার হরফগুলি লিখিত হয়েছে কলিজা-ঝরা রক্ত ও চোখের অশ্রু বিন্দু দিয়ে। এসব কথা যখন নাবিলা চিন্তা করছে তখন সে উতওয়াকে বলতে শুনল—প্রথম প্রথম কাজটি অভিনবও অস্বাভাবিক বলে মনে হয়। তোমার কাছে কষ্টকরও মনে হবে। কারণ, তুমি ত এ ধরণের কাজে অভ্যস্ত নও। তাছাড়া

তোমার কাছে এটা নৈতিকতাবিরোধী নিকৃষ্ট কাজ বলেও মনে হবে। হ্যাঁ.. আমরা সকলেই প্রথম প্রথম এমনটি ছিলাম। তবে কালের বিবর্তনই এ চিন্তা পাল্টে দিয়েছে। আর তোমারও দেবে। যখন এ প্রত্যয় জন্মাবে যে, রাষ্ট্র ও প্রেসিডেণ্টের খেদমতের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছ, তখন তুমি নিজেকে অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী মনে করতে থাকবে।

নাবিলা ভ্যানিটি ব্যাগটি হাতে নিল। চোখের পানিতে তার গণ্ডদ্বয় ভিজছে। সে তা লুকোতে লুকোতে বলল—চল। ঘুম পাচ্ছে।

—মিনা হাউজ?

—আগামী কাল ছাড়া আর সম্ভব নয়।

—কেবল সব সময় মত পাল্টাও। এজন্যেই রাগ হয়।

—আশা করি অনুরোধ রাখবে।

—রাখব। তবে তোমার অনুরোধের কারণে নয়। বরং আজ রাতে উচ্চপর্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক আছে সেখানে আমার উপস্থিত থাকা অত্যন্ত জরুরী।

চোখের পানির মত সামান্য একটু বৃষ্টি হয়েছে। মনে হচ্ছে মেঘ যেন ব্যথ্যা বিচ্ছেদ আর বিদায়ের যন্ত্রনায় কাতর। রাস্তায় মানুষের ভিড়। তারা যেন বৃষ্টি এবং ঠাণ্ডা থেকে পালাচ্ছে। নাবিলা চিন্তা করছে সালওয়ার কথা। চুপে চুপে কাঁদছে, আর ভীত-চকিত দু'টি চোখ মেলে তাকাচ্ছে। সে চিন্তা করছে ওপরের দিকে পা উঠিয়ে ঝুলিয়ে রাখা লোকটির কথা। সে ঝুলে আছে অক্ষম অনুগত হয়ে আর তার ফোলা দু'টি চোখের সামনেই মৃত্যুকে দেখছে। কুকুরগুলি তার পাশ দিয়ে ক্ষিপ্ত গতিতে হাঁটাচলা করছে, যেমন দায়িত্ব পালনকারী সৈনিকরা করে থাকে। নাবিলা বৃষ্টিভেজা জানালার ভেতর দিয়ে আকাশের দিকে তাকাল। অস্পষ্টতার কারণে পরিষ্কারভাবে কিছুই বুঝা গেল না। এমনকি কোন উজ্জল আশার আলোও দেখতে পেল না সে।

১৫

বাড়ীতে ফেরার পর নাবিলার মা তাকে যে কথা শুনাল তা ছিল খুবই অপ্রত্যাশিত। নাবিলার মা জানাল, প্রজাতন্ত্রী প্রাসাদের এক জরুরী চিঠিতে তাকে ডেকে পাঠান হয়েছে। প্রেসিডেণ্টের কাছে সে যে বিশেষ চিঠিটি পাঠিয়েছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে তার বক্তব্য শোনার জন্যে তাকে জরুরীভাবে তলব করা হয়েছে। নাবিলা শংকিত হয়ে পড়ল। মনে হচ্ছে, এ চিঠি পাঠানোর ব্যাপারে এখন সে অনুতপ্ত। সব কিছু ত সে একটা আবেগ ও রাগের বশবর্তী হয়ে লিখে-ছিল। কি বিপদ! সে কি তা হলে দ্বিতীয়বার কোন চক্রান্তের জালে জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছে? তার ত এত কিছু সহ্য করার শক্তি নেই। সে কি আবার উতওয়ার সাথে

যোগাযো করবে, যাতে সে তার পাশে থাকতে পারে? নাবিলা এখন তার প্রয়োজন অত্যন্ত তীব্রভাবে অনুভব করছে! মনে হচ্ছে, উতওয়ার মত লোকেরা তার জীবনের একটি প্রয়োজনীয় জিনিসে পরিণত হয়েছে। তা না হলে সমস্যার শেষ নেই। কমপক্ষে বেইজ্জতি ও চাকুরী যাবার ভয় ত আছেই। কিন্তু না, যাই কিছু ঘটুক না কেন, উতওয়াকে সে জানাবে না। সাহসিকতার সাথে সে সব কিছুর মোকাবিলা করবে। তাতে যা হবার তাই হবে। সে ত দেশেরই একজন নাগরিক। এমন একটি ভুল পদক্ষেপ তার দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে, যাতে সরকার ও জনগণের কোন কল্যাণ নেই বলে সে মনে করেছে। আর সেটাই সে সত্য আমানতদারী ও দেশের কল্যাণের অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী প্রেসিডেন্টের কাছে তুলে ধরেছে। দেশের প্রতিটি মানুষ যদি প্রাণের ভয়ে চুপ করে থাকে এবং সবাই যদি সম্ভাব্য বিপদ থেকে নিজেকে বাঁচাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে ব্যাপারটি ক্রমান্বয়ে অবনতির দিকেই যেতে থাকবে। এ ভাবে একের পর এক ভূল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। অবশেষে তা এমন একটি ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটাবে, যার পরিণতি একমাত্র আল্লাই ভাল জানেন। আর এ চিন্তাই তাকে তার একাজের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সহায়তা করেছে। সে যে ঠিক কাজ করেছে, এ ব্যাপারে তার কোন সন্দেহ নেই। নাবিলা তার মাকে বলল—আমি ফিরে আসার পর পরই আমাকে কেন জানালে না?

—উতওয়া ছিল। তার সামনে বলা ভাল মনে করিনি।

—এখন এর সমাধান কি?

মা বললেন—তারা টেলিফোন নম্বর দিয়ে গেছে। যোগাযোগ করে সাক্ষাতের সময় নির্ধারণ করতে বলেছে।

নাবিলা টেলিফোন নম্বর নিল। তারপর রিসিভার উঠিয়ে নম্বর ঘুরাতে লাগল। অপর প্রান্তের সাড়া পেয়ে নিজের পরিচয় দিল। তাদের কাছ থেকে জানতে পেল তার সাক্ষাতের সময় সকাল এগারটা।

নাবিলার আব্বা ভীত হয়ে বললেন—মা! এসব কিছু করার তোমার কোন প্রয়োজন ছিল না। আমি মনে করছি, সময় পেরিয়ে যাবার পূর্বেই উতওয়াকে ব্যাপারটি খুলে বলা উচিত।

একটু শক্ত সুরে নাবিলা বলে উঠল—আমি তা মনে করি না।

—কেন, মা! ক'দিন আগেই কি সে তোমাকে ছাড়িয়ে আনেনি?

—হাঁ, সে ছাড়িয়ে এনেছে। তবে, হয় এবার আমি নিজেকে নিজেই ছাড়াব, না হয় এমন যাওয়া যাব যে আর ফিরব না। আমি ভয় পাব কেন? আমি ত কোন অপরাধ করিনি, আববা!

আরে বেটি! কেবল মাত্র একটু সন্দেহের ভিত্তিতেই আজকাল কত মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে।

আমি একটি ভয়াবহ ব্যাপার প্রকাশ করে দেব। প্রমাণ পেশ করতে আমার

কোন কষ্ট হবে না। নাবিলার আববা একটু তিক্তহাসি হেসে বললেন—প্রমাণ?

—হ্যাঁ! সাধারণ গোয়েন্দা ভবন অথবা সামরিক কারাগারে মানবতা কি ভাবে পদদলিত হচ্ছে, তা দেখতে যাওয়া দায়িত্বশীলদের অবশ্য কর্তব্য।

স্নেহের সাথে নাবিলার মাথায় হাত রেখে তার আববা বললেন—উপরের নির্দেশ ছাড়াই জল্লাদরা এমনটি করছে, তাই কি তুমি বিশ্বাস কর।

—উপরের নির্দেশে করছে একথা বিশ্বাস করা কষ্টকর।

একটু আক্ষেপের সুরে তার আববা বলে উঠলেন—আল্লাহ ইমাম মুহাম্মাদ আবদুহুর ওপর রহম করুন। তিনি বলেছিলেন—সিয়াসাত (রাজনীতি) এবং এ ধাতু থেকে নির্গত যতগুলি শব্দ আছে সবগুলির ওপর আল্লার লা'নত বর্ষিত হোক। যথাঃ সা-সিন (শাসক), যাসুস (শাসন কাজ পরিচালনা করা ইত্যাদি।

নাবিলা একটু জোর দিয়ে বলল—কম্যুনিস্ট বিশ্বের মত আমরা ত আর লৌহ-কারার অন্তরালে বাস করি না।

এ সব নাম ও প্রতীকের কথা ছেড়ে দাও। আজ এখানে যা চলছে তা জুলু-মের চুড়ান্ত পর্যায়। পৃথিবীর কোথাও এর কোন নজীর নেই।

অশ্রু ভেজা চোখে নাবিলার মা বললেন—ইয়া আল্লা! আমরা ত এক প্রকার নিরিবিলিতেই ছিলাম। আমাদের উপরে এ মুসিবত চাপিয়ে দিলে কেন?

একটু নরম সুরে নাবিলার আববা বললেন- এটা আল্লার ইচ্ছা ও ফয়সালা। তাঁর ফয়সালার বিরুদ্ধে আমরা কিছুই করতে পারিনে।

নাবিলা তার কামরার দিকে গেল। যদিও সে বিশ্রামের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল, তবুও একবার বইয়ের তাক, পাঠ-পরিকল্পনার খাতা ও গানের ক্যাসেট-গুলির প্রতি অত্যন্ত বিমর্ষভাবে তাকাল। ডাক্তারের কথা মনে পড়ল। সংগে সংগে টেলিফোনের দিকে এগিয়ে রিং করল। ডাক্তার সালেম তার কনসালটিং রুমেই ছিল। তার কণ্ঠস্বরে স্পষ্টই বুঝা গেল নাবিলার ফিরে আসায় সে খুশী হয়েছে। এক নিঃশ্বাসে সে নাবিলার শারীরিক ও মানসিক অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। অবশেষে নাবিলা তখনই তার সাথে দেখা করার ব্যাপারে একমত হল। নাবিলা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিল। সে বসতে, ঘুমাতে, স্থিরভাবে কিছু পড়তে অথবা গান শুনতে সক্ষম ছিল না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে ডাক্তার সালেমের কনসালটিং রুমের দিকে যাত্রা করল। নাবিলার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে ডাক্তায় বলে উঠল—হামদান লিল্লাহি 'আলা সালামাতিকে - তোমার সুস্থতার জন্যে আল্লাহর প্রশংসা। তোমার অবস্থার বেশ উন্নতি হয়েছে।

নাবিলা ডাক্তারের মুখোমুখি বসত। তার একটি আংগুল দিয়ে ভ্যানিটি ব্যাগের হ্যাণ্ডেল নাড়তে নাড়তে উত্তর দিল—আমার মনে হয় না।

বাহ্যিক অবস্থা দেখেই বুঝা যাচ্ছে, তুমি আগের চেয়ে ভাল আছ।

নানা সমস্যা এখনো আমার শ্বাসরোধের উপক্রম করছে।

সান্ত্বনার সুরে ডাক্তার বলল—সব কিছুকেই বাস্তব বলে গ্রহণ করে জীবন যাপন করা উচিত। নাবিলা বিস্ময়ের সথে উত্তর দিল—এটা কি এর চিকিৎসা?

—ভদ্রে! ঔষধের দোকানেও কিছু কিছু ট্যাবলেট পাওয়া যায় না।

—বিদেশ থেকে আমি তা আনতে পারি।

—আমি ডাক্তারীট্যাবলেটের কথা বলছি না।

—ডাক্তার! তা হলে আপনি কিসের কথা বলছেন?

—মানসিক শান্তি। এটা বেচাও যায় না, কেনাও যায় না।

নাবিলা মাথা ঝাঁকাল এবং ডাক্তার যেদিকে ইঙ্গিত করছে তা বুঝতে পারল।

ডাক্তার সালেম তার আগের কথার জের টেনে বলল—আল্লাহ তায়ালা কিছু কিছু জিনিস সৃষ্টি করেছেন যাতে সবার সমান অধিকার। যেমন—পানি, বাতাস ইত্যাদি। কিন্তু কোন শাসক তাদের ভাণ্ডারের দরজা বন্ধ করে দেয় এবং মানুষকে জেলে ভরে তাদের অধিকার ছিনিয়ে নেয়।

রাগের সুরে নাবিলা বলল—এটা জুলুম, অপরের অধিকার হরণ ও আল্লার অধিকারে হস্তক্ষেপ।

—একটু চুপ কর। দেয়ালেরও কান আছে। একথা বলতে বলতে ডাক্তার হাত দিয়ে ইশারা করল। চাপা গলায় নাবিলা বলল—আমরা চুপ করব কেন? মানুষ যদি চুপ করেই থাকত তাহলে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের দ্বারা জেলখানা ভরে যেত না।

সামরিক কারাগারে নাবিলার দেখা ভয়াবহ দৃশ্য, সেখানে উতওয়ার কার্য-কলাপ এবং গত দুসপ্তাহ ধরে যে কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা সে করেছে নাবিলা তা বর্ণনা করতে থাকল। এরপর কাঁদ কাঁদ স্বরে বলল—আমি কখনো বিয়ে করব না। শংকিতভাবে ডাক্তার নাবিলার দিকে তাকিয়ে বলল—এরজন্য খুব চড়া মূল্যই তোমাকে দিতে হবে।

—যদি আমার জীবনও চলে যায়, তবুও না।

—এটা মৃত্যু থেকেও ভয়ংকর।

এতক্ষণ ডাক্তার যেন নাবিলার মনোভাব পরীক্ষা করে দেখছিল। নিরবে কিছু চিন্তা করে ডাক্তার মুখ খুলল। বলল—আমার কাছে এর সমাধান আছে।

নাবিলা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ডাক্তারের কাছে এগিয়ে গেল। তারপর ডাক্তারের পরিস্কার ধবধবে কোটের কলার চেপে ধরে অনুরোধের সুরে বলল—তা কী, আমাকে একটু বলুন না?

ডাক্তার তার ডান হাতের আংগুল দিয়ে টেথিসকোপটি নাড়তে নাড়তে বলল-চলে যাওয়া। নাবিলা জানতে চাইল—কোথায় ডাক্তার?

—দেশের বাইরে। কিছুকালের জন্যে বিদেশে চলে গেলে তোমার বর্তমানের এ বিপর্যস্ত মানসিক অবস্থা দূর হয়ে প্রশান্তি ফিরে আসবে। আর উতওয়ার হাত থেকেও রক্ষা পাবে।

নাবিলা কামরার অভ্যন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। জানালার ফাঁক দিয়ে দূরে সুউচ্চ অট্টালিকা, মসজিদের মিনার, গম্বুজ কারখানার কালো ধোঁয়ার পাইপ ও দিগন্তবিস্তৃত নীল আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল—এটা একটা উত্তম চিন্তা।

—কিন্তু সে ক্ষেত্রেও চিন্তা করার মত কিছু ব্যাপার আছে।

—সেগুলি কী?

—প্রথমত তোমার কর্মকর্তার এবং দ্বিতীয়ত নিরাপত্তা অফিসের সম্মতি প্রয়োজন। নাবিলা জানতে চাইল—সত্যিই এগুলি সমস্যা?

ডাক্তার তার এক হাতের আংগুল অন্য হাতের আংগুলে প্রবেশ করাতে করাতে বলল—তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয়পত্র নেই?

—কেন?

—যদি তোমার পরিচয়পত্র থাকে, তাহলে, তুমি 'কর্মচারী' একথাটি না লিখেই পাসপোর্ট বের করতে পারবে। পেশার ঘরে 'ছাত্রী' কথাটি লিখবে। পাসপোর্ট অফিসে আমার এক বন্ধু আছে, তিনি তোমাকে সবরকম সাহায্য করবেন।

আনন্দের সাথে নাবিলা বলে উঠল—দারুণ চিন্তা! উচ্চ শিক্ষার জন্যে একখানা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয়পত্র আছে।

—নিরাপত্তা বিভাগ যদি তোমার ভ্রমণে কোন রকম বাঁধা সৃষ্টি না করে তা হলে সম্ভব হবে।

—আমার বিশ্বাস, উতওয়া এ ব্যাপারে সব পথই বন্ধ করে দেবে।

ডাক্তার সালেম বললেন—কুয়েতে আমার এক আত্মীয় আছেন। তার দ্বারা তোমার একটা ভিজিটভিসার ব্যবস্থা করা সম্ভব। আর সেখানে তিনি তোমার একটি কাজেরও ব্যবস্থা করে দিতে পারেন।

নাবিলা ব্যাপারটির বিভিন্ন দিক চিন্তা-ভাবনা করে দেখছিল। এ সময় সে ডাক্তার সালেমের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। তিনি সতর্ক করে দিয়ে বললেন—তবে ব্যাপারটি যেন কেউ না জানে। এমন কি বাড়ীর কেউ ও না।

মাথা নেড়ে নাবিলা সম্মতি জানাল।

ডাক্তার আবার বলল—এই বেদনাদায়ক ও অস্থির পরিবেশে তুমি কখনো তোমার এই মানসিক অশান্তি থেকে মুক্তি পাবে না। তোমার চিকিৎসা হল বিদেশ চলে যাওয়া। বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তন উচিত হবে না। তবে......

নরম স্বরে নাবিলা ডাক্তারের কথার সমাপ্তি টানল—তবে অবস্থার যদি পরিবর্তন হয়।

মাথা দুলিয়ে হতাশা প্রকাশ করে নাবিলা বলল—মনে হচ্ছে, পরিবর্তন সুদূর পরাহত। তারা সব কিছুর ওপর আধিপত্য বিস্তার করে ফেলেছে। গোটা দেশটিই তাদের বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে।

উন্মুক্ত জানালা দিয়ে কায়রো শহরের দিকে একনজর তাকিয়ে নাবিলা আবার বলতে লাগল—প্রাসাদে এবং সালওয়ার কাছে না যাওয়া পর্যন্ত আমি দেশের বাইরে

যাব না। এরপর নাবিলা ডাক্তারের কাছে খুলে বলল প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠানো তার চিঠির বিষয়বস্তু, আগামীকালের সাক্ষাতকার, হতভাগী সালওয়ার সাথে সাক্ষাতের প্রয়োজনের কথা। যাকে অতি সম্প্রতি মুক্তি দেয়া হয়েছে। ডাক্তার তাকে এসব কিছু না করার জন্যে সতর্ক করে দিল এবং তাকে উতওয়ার আস্থা অর্জনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলল। যাতে সে তার প্লান কার্যকরী করে এই বিষাক্ত নর্দমা থেকে পরি াণ পেতে পারে। এ ভাবে ডাক্তার যখন নাবিলাকে উপদেশ দিচ্ছে, তখন নাবিলার মাথায় একটি প্রশ্ন জাগল—ডাক্তার! আপনিও কেন আমার সাথে দেশ ত্যাগ করছেন না?

—আমার পক্ষে তা অসম্ভব। আমার কিছু ওজর আছে।

—আপনার কি জীবনের ভয় নেই?

একটা অর্থপূর্ণ হাসি দিয়ে ডাক্তার বলল—ভাল কথা। যদি দেশের ভদ্র ও স্বাধীনচেতা লোকেরা দেশ ত্যাগ করে তাহলে দেশটির কি অবস্থা হবে? দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের পাশে ঁাড়াবার আর কেউ থাকবে না। চিকিৎসা ও চিকিৎসা বহির্ভূত দায়িত্ব পালনের জন্যেই আমি এখানে আছি। তুমি হয়ত জান না, আমার এক ভাইকে কঠোর শ্রম সহ আজীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেয়া হয়েছে।

বিস্ময়ের সুরে নাবিলা বলল—আপনার ভাই!

—হ্যাঁ, পরিবারের সকলেই কিছু না কিছু অত্যাচার ও লাঞ্ছনা ভোগ করেছে।

নাবিলার কাছে ডাক্তারকে এখন মৃত্যু, ভয় ও শাসকদের প্রচণ্ড ক্ষমতা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী রূপকথার নায়কের মত মনে হল। তার দৃঢ় প্রত্যয় জম্মাল, জনগণের এ বাহ্যিক আত্মসমর্পণ ছাইয়ের তলায় আগুন লুকিয়ে থাকার মতই। যার লেলিহান শিখা যে কোন মুহূর্তে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠতে পারে। নাবিলা একটু জোর দিয়েই বলল—আমি দেশ ত্যাগ করব না।

ডাক্তার একটু নিকটে গিয়ে বলল - অসম্ভব।

—তা হলে আপনি থাকবেন কেন?

—প্রত্যেকেরই একটা স্বতন্ত্র স্থান ও ভূমিকা আছে।

—আমার ভূমিকা বুঝি পালানো?

—কক্ষনো না। বিদেশে তুমি এমন লোকদের পাবে যারা তোমাকে স্বাধীনতার জন্য রাতদিন কাজ করলেও বাধা দেবেনা। তোমার থাকবে অর্থ, কলম ও আন্দোলনের স্বাধীনতা। কোন প্রকার দলন-পীড়ন ও ভয়ভীতি থাকবেনা। প্রত্যেকেই নিজ নিজ কাজ করবে। আমরা এখানে আর তোমরা ওখানে এভাবেই কাজ ভাগা-ভাগি হওয়া প্রয়োজন। বুঝলে?

—হ্যাঁ, বলে নাবিলা মাথা ঝাঁকাল।

কিছুক্ষণ নিরব থেকে নাবিলা বলল—স্বল্প হোক বা দীর্ঘ হোক, কিছুকাল পরেই তুমি মিসরে ফিরে আসবে। তখন তুমি দেখতে পাবে মিসরের আকাশে সবুজ পতাকা পত্ পত্ করে উড়ছে। আর সে পতাকায় সোনালী হরফে লেখা

রয়েছে উদ্‌খুলু মিসরা ইনশাআল্লাহ আমিনীন—আল্লার ইচ্ছায় শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে মিসরে প্রবেশ কর।

অনুচ্চকণ্ঠে নাবিলা বলল—এখনই আমি দেশ ত্যাগ করতে চাই। কল্পনায় আমি এখন স্বাধীনতা, ভালোবাসা ও শান্তিতে পরিপূর্ণ এক বিশ্বকে দেখতে পাচ্ছি, সেখানে নেই কোন শত্রুতা, নেই চাবুক ও কুকুর। আর সেখানে নেই উতওয়া ও বন্দীরা। সেটা হচ্ছে, গোলাপ ও নানা ধরনের ফুল, মিষ্টিকথা ও সম্মানের দীপ্তিতে আলোকিত এক স্বপ্নের জগত।

—কিন্তু তুমি যেন গোলাপী স্বপ্নে বিভোর হয়ে যেও না। তোমার ওপর যে বিরাট কর্তব্য রয়েছে, তা স্মরণ রেখো। তোমার স্বদেশের মাটিতে লক্ষ লক্ষ মানুষকে ছাগল-ভেড়ার মত বরং তার থেকে নিকৃষ্টভাবে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ানো হচ্ছে।

—আমি তা জানি।

—যেমন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে কেবল দোয়া ও সালাতের দ্বারাই জয়লাভ করেননি। বরং কাজ, জিহাদ, ঘাম ও রক্তের দ্বারা......

আবার জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখতে দেখতে নাবিলা বলল—ইতিহাস! তা আমি পাঠ করতাম মিষ্টি-মধুর আবেগ জড়িত গল্পের মত। তার ঘটণাবলী পাঠ করে পুলকিত হতাম। আর এখন! আমার বিশ্বাস জন্মেছে, ইতিহাস হচ্ছে অন্য বস্তু। তা হচ্ছে জীবন্ত, প্রজ্বলিত এক অভিজ্ঞতা। যুগের পরিবর্তনে যার লেলিহান শিখা কখনো নিভবে না। ইতিহাস ত নিরবে ঘটে যাওয়া ধারাবাহিক ঘটনাবলীর আধার নয়।' বরং তা হচ্ছে, তিক্ত-রক্তাক্ত সংঘর্ষ, কিছু ভূমিকা ও ফলাফল। আর জীবনের বাস্তবতার আমূল পরিবর্তন।

রোগীরা অপেক্ষা করছে—এ কথা বলতে বলতে ডাক্তার হেসে উঠল।

—আমি এখুনি যাচ্ছি। আপনার অনেক মূল্যবান সময় আমি নষ্ট করলাম। তবে আপনার খুশি হওয়াই উচিত। কারণ আপনি ত আমাকে উৎকৃষ্ট দাওয়াই পেশ করেছেন।

—এমনটিই আমি কামনা করি।

নাবিলা ফিরে এল। ডাক্তারের ডিসপেনসারী থেকে সে নতুন মানুষ হিসেবে বের হল। ব্যথা-বেদনা ও শাস্তির অভিজ্ঞতা সে লাভ করেছে। এর পরই ত সে এই নতুন রূপে নতুন অবস্থায় এসে পৌঁচেছে। নাবিলা ভীত হবে কেন? সর্বাধিক মৃত্যুই তার জন্যে অপেক্ষা করতে পারে। এর বেশী কিছুত না। সে এখন মৃত্যুকে পরোয়া করে না। সে এখন নিজকে আবিষ্কার করেছে, চলার পথও চিনেছে। জীবনে সে যা কিছু অর্জন করেছে, তার মধ্যে এটাই সর্বোত্তম।

নাবিলা দরজায় টোকা দিল। মিনিট দু'য়েক পর তার চেনা চেনা একটি চেহারা সামনে এল। এ সেই সালওয়া। তার সেই ক্ষত ও কাটা ছেঁড়া সেরে

গেছে। তার সেই সুন্দর চেহারা পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও সন্তুষ্টচিত্ততার এক উজ্জ্বল পৃষ্ঠার রূপ লাভ করেছে। চোখে তার আনন্দাশ্রু ঝরতে থাকলেও শংকিত-ভাবে বলে উঠল—তুমি? এবং দ্রুত নাবিলাকে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়ে সালওয়া পুনরায় বলতে লাগল—আমার কাছে এসে বিরাট ভুল করেছ।

—কেন?

—বাড়ীর ওপর তারা সর্বক্ষণই নজর রাখে।

—আমি সতর্কই ছিলাম। বাড়ীর আশে-পাশে পাহারারত এমন কাউকে দেখতে পেলাম না।

তুমি ত সরলমনা। মুদি দোকানদার আমার ওপর নজর রখে। ধোপাও। কে জানে, আমার কোন প্রতিবেশীও এ কাজে লিপ্ত থাকতে পারে। আমি কারো সাথে সাক্ষাত করতে যাই না, আবার কারো সাক্ষাতও দিই না। একথা বলতে বলতে সালওয়া উঠে দাঁড়াল।

নাবিলা বলল—ব্যাপারটি আল্লার ওপরই ছেড়ে দিন। সাবের কেমন আছে?

—ঘুমোচ্ছে।

—আর আপনার স্বামী?

—তার কোন চিঠিপত্র পাই না। আমার কাছে প্রেরিত তার চিঠি ও চেকগুলি সম্ভবত সরকার আটক করেছে।

—আপনি তাঁর কাছে চলে যান না কেন?

—এটাই সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল।

—কোন অধিকারে?

—তাদের প্রশ্ন করে এমন বুকের পাটা কার আছে?

—আপনি তা হলে এখন কি ভাবে চলছেন?

মানুষের বাড়ীতে কাজ করি। কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করি, ঝাড় দেই, রান্না করি বা এ জাতীয় অন্য কিছু।

বাকরুদ্ধ গলায় নাবিলা বলল—এটা তাদের ভীষণ অপরাধ।

মনের দুঃখে সালওয়া কেঁদে উঠে বলল—শুধু এতটুকু নয়। যেখানেই আমি যাই না কেন, তারা আমার পিছু লেগে থাকে। কোন বাড়ীতে কাজ করতে গেলে, আমাকে তাড়িয়ে দেবার জন্যে বাড়ীর লোকদের তারা উৎসাহিত করে। আমি বুঝিনা সরকার আমার কাছে কি চায়? আমি ত সরকারের প্রতিপক্ষও নই।

নাবিলা তার হাত ব্যাগটি খুলে কিছু টাকা বের করে বলল—এগুলি ধরুন।

—অসম্ভব।

এগুলি আপনার নিতেই হবে। আজ থেকে মনে কোন সংকোচ রাখবেন না। এ মুহূর্ত থেকে আমি আপনার দায়িত্ব গ্রহণ করলাম।

টাকাগুলি ফিরিয়ে দিতে দিতে সালওয়া বলল—তুমি আমাকে বুঝতে পারছ না। যখন তখন তারা আমার ঘরে তল্লাশী চালায়। আমার কাছে এ টাকা পেলে সন্দেহ করবে—নিশ্চয় কোন ইখওয়ানী আমাকে সাহায্য করছে।

নাবিলা বলল—তাতে কি হয়েছে? মানুষ ত একে অপরকে সাহায্য করেই থাকে।

একটু শুষ্ক হাসি দিয়ে সালওয়া বলল—খুব শিগগিরই তারা আমাকে এ অর্থের সূত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। যদি আমি তাদের না বলি তাহলে আমার পিঠে চাবুকের আঘাত পড়তে থাকবে। আমি একজন দুর্বল নারী, দীর্ঘক্ষণ চাবুকের আঘাত সহ্য করতে পারব না। তোমার নাম প্রকাশ করে তোমাকে বিপদের সম্মুখীন করে তুলব। তোমার নিজের ওপর, আর সেই সাথে আমার উপর রহম কর।

নাবিলা টাকাগুলি আবার তাকে ফিরিয়ে দিল।

—আমার নাম প্রকাশ করবেন, কোন রকম দ্বিধা করবেন না। খুব শিগগিরই আমি দেশ ত্যাগ করছি। আমার কাছে পৌঁছতে তারা সক্ষম হবে না। আমি দেশ ত্যাগের পরই আপনার ব্যাপারে এমন ভাবে চিন্তা-ভাবনা করব যাতে তারা সন্দেহ করতে না পারে, নিশ্চিন্ত থাকুন।

সালওয়া টাকাগুলি গ্রহণ করল। তখন তার চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি ঝরছে। প্রবল আবেগে নাবিলাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল—তারা আমাকে মুক্তি দিয়েছে কেন, তা কি জান? যাতে তারা আমার প্রতিটি পদক্ষেপ অনুসরণ করতে পারে এবং আমি ও আমার স্বামীর মধ্যকার কোন রকম যোগাযোগের সূত্র আবিস্কার করতে পারে। সৎ ওকল্যাণকামী লোকদের ধরার ফাঁদ হিসেবে তারা আমাকে ব্যবহার করছে। তারা দেশটিকে জঙ্গলে পরিণত করে ধ্বংস করতে চায়। আল্লাহ তাদের শুভবুদ্ধি দান করুন!

নাবিলা বাড়ীতে ফিরে এল এই ভাঙ্গা মন ও দুর্বল শরীর নিয়ে। তখন তার ভীষণ ঘুম পাচ্ছিল।

১৬

পেছনের দিনগুলিতে একটির পর একটি করে যে ঘটনাগুলি ঘটে গেল নাবিলা সে সম্পর্কে চিন্তা করছিল। এই ঘটনাগুলি তার চোখের পর্দা সরিয়ে দিয়েছে। তার সম্পর্কে বলা যায়, সে ছিল উদাসীন। চার পাশে কি ঘটছে তা তার জানা ছিল না। সে কাজ করত, খেত, পান করত, ঘুমাত, বই পড়ত, গান শুনত। আর জীবন ও ভালোবাসার জন্যে তার হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত রাখত। কোন রকম ব্যথা-বেদনা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব সে কখনো অনুভব করেনি। তার জীবনটি ছিল শান্ত, সুন্দর। এর স্বাচ্ছন্দ কিছুতেই কখনো বিনষ্ট হয়নি। যে দিন থেকে উতওয়ার সাথে পরিচয় হয়েছে সে দিন থেকেই সব কিছু আগাগোড়া ওলটপালট হয়ে গেল। সে অতি অভিনব, স্বতন্ত্র এক বিশ্ব আবিস্কার করল। সে বিশ্বের রূপ রাত্রিকালীন বিশ্বের ন্যায়। সেখানে আছে দুর্বোধ্যতা, ধোকাবাজি, ভীতি ও যন্ত্রণাদায়ক স্বপ্ন।

নাবিলা তার অতীতের উদাসীনতার মধ্যেই যে সুখী ছিল, এ ব্যাপারে কোন

সন্দেহ নেই। এরপর সে স্থিরতার অর্থ হারিয়ে ফেলল। আর দুশ্চিন্তা, মানসিক শান্তি ও অন্তর্দ্বন্দ্ব যে কী তা উপলব্ধি করল। এক নতুন যুগের সাথে পরিচিত তাকে নতুন জীবে পরিনত করেছে এবং তাকে বহু দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছে, যা পূর্বে ভুলেও তার অন্তরে একবারও উদয় হয়নি। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, যা কিছু ঘটে গেছে তার জন্যে সে মোটেও অনুতপ্ত বা দুঃখিত নয়। সে এটাকে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার মূল্য বলে গণ্য করে। অভিজ্ঞতা খুবই তিক্ত। তবে তা উপকারী, চিত্তাকর্ষক ও আনন্দদায়কও বটে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যে জিনিসটি তাকে পীড়া দিচ্ছে তা হচ্ছে, এ কঠিন অভিজ্ঞতায় তার পরিবারের অন্যরাও জড়িয়ে পড়েছে। তার অসুস্থ মাতা, বৃদ্ধ পিতা এবং প্রেম প্রীতি ও শান্তিতে পরিপূর্ণ তার সুখী পরিবারকে সাহায্য করতে সে যারপরনাই উদগ্রীব। আজ রাতে সে নিজেই উতওয়াকে হত্যার কথা চিন্তা করল।

দীর্ঘক্ষণ এব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সংগ্রহ করল। রাতের একটা দীর্ঘ সময় এ বিষয়টি গভীরভাবে খতিয়ে দেখে কাটিয়ে দিল। কারণ সামরিক কারাগারে বেড়াতে গিয়ে সে উপলব্ধি করেছে, উতওয়া ও তার বন্ধুরা নিছক একটি সংঘবদ্ধ হত্যাকারী দল। মানবতা ও মায়া মমতার লেশ মাত্র তাদের মধ্যে নেই। এর পেছনে যত কথা ও কারণই দর্শান হোক না কেন। যদি ধরে নেয়া হয়, ইখওয়ানুল মুসলিমীন অপরাধী, আর এমনটি ধরে নেয়া হবে অন্যায় তা সত্বেও যদি তাই ধরে নেয়া হয় তাহলে তাদের সাথে এমন নিকৃষ্ট আচরণ কোন মতেই ন্যায়সঙ্গত হতে পারে না। অনুরূপ আচরণ ঔপনিবেশিক ইংরেজের আমলে অথবা বিকৃত আন্তর্জাতিক ইয়াহুদীবাদের তথা কোন যুগেই জাতি তার অতীত ইতিহাসে প্রত্যক্ষ করেনি। দেশের সন্তানদের সাথে তারা এরূপ জঘন্য আচরণ কিভাবে করতে পারে, তা চিন্তারও বাইরে। অবশেষে তার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে, এক বা একাধিক ব্যাক্তিকে হত্যা করে বর্তমান বাস্তবতার কিছু মাত্র পরিবর্তন করা যাবে না। বর্তমান শাসন ব্যবস্থার মাথা থেকে পা পর্যন্ত জুলমের পথ ধরেছে। দৈহিক ও মানসিক উৎপীড়ন তার একটি পদ্ধতিমাত্র। আর এ ধরনের ব্যবস্থা হাজারো বরং লাখো নিরীহ ভদ্রলোকদের ব্যাপারে নানা ধরনের অপরাধ করতে বাধ্য করে।

ভাল-মন্দ এবং ন্যায়বিচার ও জুলুমের মধ্যে সংঘর্ষ চিরন্তন। হাবিল-কাবিলের যুগ থেকেই এ বিবাদ চলে আসছে। কোথাও মহামারী দেখা দিলে সেখানকার কেউ রেহাই পায় না। তবে সার্বিক পরিবর্তন হচ্ছে একমাত্র কার্যকর শক্তি যা জীবনকে নতুন করে আলোর মুখ দেখাতে পারে। উতওয়া তো বিদেশ থেকে আনা একটা প্রাণহীন অস্ত্রের মত। জুলুম অত্যাচার নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী অথবা তার অভীষ্ট লক্ষ্য হাসিলের হাতিয়ার হিসেবে তাকে ব্যবহার করে থাকে? মৃত্যু ও ধ্বংসের এসব হিংস্র হাত যদি কেটে দেয়া যায়, সৎ ও পূণ্যবানদের হৃদয়ে তাদের বিষাক্ত নিশ্বাস পৌঁছান যদি বন্ধ করা যায়, তা হলে অন্যায়-অত্যাচার দুর হবে, অত্যাচারীর তখত ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাবে। সকল প্রকার বাতিল শাসনের

ভিতও ধ্বসে পড়বে। নাবিলা ইতিহাস থেকে যা জেনেছে, তাতে বুঝেছে, প্রত্যেক বাতিল পন্থাতর মধ্যেই তার পতন ও ধ্বংসের কারণ লুকিয়ে থাকে। অন্যায়, অসত্যও একটি শক্তি, কিছু কথা......একটি সংগঠন। শক্তি, বাক্য ও সংগঠনের অস্ত্র ছাড়া তাকে পরাভুত করা যাবে না। কিন্তু এ ভয়াবহ প্লাবন তার সকল অন্যায় ও অপরাধসহ অত্যন্ত বিস্ময়কর দ্রুততার সাথে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। বর্তমান মুহূর্তে এই ভয়াবহ বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়। এমনটিই তার অন্তর বলছে।

নাবিলা বিছানায় শায়িত ছিল। লাফিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে বসল। অথচ এখন তার বিশ্রাম ও নিরিবিলিতে থাকার একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু এখন তাকে শক্ত হতে হবে এবং প্রজাতন্ত্রী প্রাসাদের নির্ধারিত সাক্ষাতকারেও যেতে হবে। এ সময়ে তাকে বিচক্ষণতা, নম্রতা ও ধৈর্যের পরিচয় দিতে হবে, নইলে তার নিজের জন্যেই নানা সমস্যায় জট পাকিয়ে যাবে এবং তার ভবিষ্যৎ গতিবিধির ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হবে। আর দেশত্যাগে ব্যর্থ হয়ে চিরদিনের জন্যে তাকে ইবলিসের কারাগারে বন্দী হয়ে থাকতে হবে। আর উতওয়া সেখানে তাকে হিংস্র জন্তুর ন্যায় খামচে-কামড়ে খেতে থাকবে। এভাবে তার ভবিষ্যতে উজ্জল স্বপ্ন ও সকল আকাংখা ধ্বংশ হয়ে যাবে। নির্ধারিত সময়ের পনের মিনিট অগেই নাবিলা সখানে গিয়ে পেঁছিল। একজন লোক সেখানে তাকে স্বাগত জানিয়ে জিজ্ঞেস করল—আচ্ছা তুমি কি জন্য এসেছ?

—আমি প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই।

—এ ভাবে মাত্র এক বার এসেই?

—তিনি ত জাতির নেতা, আর আমি সেই জাতিরই একজন। তাছাড়া তিনি ত বলেছেন, তার দরজা সর্বদাই উন্মুক্ত।

—লোকটি বলল কথাতো ঠিকই......কিন্তু........।

—কিন্তু আবার কি?

—আমি প্রথমেই কারণ জানতে চাই।

—কারণ আমি তাকেই বলব।

—বেশ ভাল কথা, তুমি কি জন্য দেখা করতে চাও তা যতক্ষণ না কাগজে লিখে দেবে, আর আমি তা তার কাছে ভিতরে পাঠিয়ে দেব ততক্ষণ তুমি তার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবে না। এরকমই নির্দেশ রয়েছে। এটা পালন না করলে দেখা হবে না।

সাথে সাথে নাবিলা এক টুকরো কাগজ বের করে প্রেসিডেন্টকে সে যা বলতে চায় সংক্ষেপে তা লিখে ফেলল। লোকটা কাগজখানা হাতে নিয়ে গভীরভাবে পড়ার পর বলল—তুমি বলছ যে তুমি বিপ্লব ও প্রেসিডেন্টের প্রতি নিষ্ঠাবান।

অবশ্যই।

—প্রেসিডেন্টের প্রতি তোমার নিষ্ঠা থাকলে একটি বিষয়ে তোমার আস্থা রাখা উচিত।

—তা কি ?

—তাঁর সঠিক নেতৃত্বের প্রতি তোমার আস্থা রাখা এবং কোন রকম উচ্চ বাচ্য না করেই তা মেনে নেয়া উচিত।

—কিন্তু আমি বিশ্বাস করি প্রেসিডেন্টের নির্দেশাবলী ভুল ভাবে অত্যন্ত বাড়াবাড়িমূলক পন্থায় বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

একটু মৃদু হেসে লোকটি বলল—এমনটি করতে কেউ সাহস পায় না।

—কিন্তু সর্বদাই ত ঘটছে। সামরিক কারাগারে কি আপনি কখনো গেছেন ? সাধারণ গোয়েন্দা ভবনে কি কখনো প্রবেশ করেছেন।

—অবশ্যই আমরা ত সব সময়ই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে থাকি।

—তাহলে সেখানে যা কিছু ঘটছে তা আপনাদের জানা আছে।

—নিশ্চয়ই।

কিছুটা বিস্ময়ের দৃষ্টিতে নাবিলা তার দিকে তাকাল। লোকটি বলতে লাগল—তোমার অবগতির জন্যে বলতে হচ্ছে, প্রেসিডেণ্ট অত্যন্ত মনোযোগের সাথে তোমার পত্রটি পাঠ করেছেন এবং তার কয়েকটি লাইনের নীচে লাল কালির দাগও দিয়েছেন। তাঁর কাছে লেখা কোন একটি চিঠিও তিনি অবহেলা করেন না। প্রতিটি মতামত যা তিনি পড়েন বা শোনেন, আন্তরিকভাবে তা গ্রহণ করেন এবং তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতেই তা থেকে ফায়দা হাসিল করেন। ইখওয়ানুল মুসলিমীনের উদ্দেশ্য কি ছিল তা তুমি জান না। তারা চেয়েছিল প্রেসিডেণ্টকে হত্যা, দেশের ধ্বংস, ক্ষমতা দখল, অন্ধ সাম্প্রদায়িকতা, জড়তা ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে। তুমি কি কামনা করো ইউরোপ আমেরিকা বা রাশিয়া—এদের কেউ দেশের শাসন ক্ষমতা দখল করুক ? তাদের সাফল্যের অর্থই হল মাতৃভূমির পরাধীনতা—আর সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হাতে একবার পড়লে আর রক্ষা নেই। আমাদের যে হত্যার ষড়যন্ত্র করে তার সাথে কোমল ব্যবহার করা ত কোন যুক্তিসঙ্গত কাজ নয়।

—নাবিলা বলল—তাহলে তারা সামরিক আদালতের পরিবর্তে সাধারণ আদালতে বিচার করে না কেন ?

—গৃহযুদ্ধের সময় অথবা দেশের নিরাপত্তা সংকটের সম্মুখীন হলে বেসামরিক আদালতে তুমি বিচারের আশা করতে পার না।

—দেশে ত কোন গৃহযুদ্ধ নেই।

আমরা দমন করে ফেলেছি। গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত ছিল না।

—কিন্তু, কিন্তু নিরপরাধ ব্যক্তিও শাস্তি পাচ্ছে। আমি নিজেই এমন কয়েক জনকে জানি।

—হ্যাঁ, তা হতে পারে। কারণ এধরনের একটি বিপর্যয় কিছু নিরপরাধ মানুষকে নাড়া দেবেই। তবে খুব শিগগিরই ব্যাপারটি পরিস্কার হয়ে যাবে।

নাবিলা তার আসনে একটু নড়ে চড়ে বসল এবং তার এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলের মধ্যে ঢুকিয়ে একটু চাপ দিতে দিতে বলল—তাহলে আমরা তাদের মতামত ও চিন্তাধারার সমালোচনা করি না কেন?

—দৃশ্যত তাদের চিন্তাধারা ও মতামত গ্রহণযোগ্য। তারা চায় ইসলামী শরী-য়তের বাস্তবায়ন। আর কেউই তা অস্বীকার করতে পারে না।

—তাহলে তারা ত সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

—ব্যাপারটি এতটুকুই নয়। এমন আরো কিছু দিক আছে যে সম্পর্কে উদাসীন হওয়া উচিত নয়।

—সেগুলি কি আমি জানতে পারি?

মৃদুহেসে লোকটি জবাব দিল—আসল ঝগড়া ত তা নয়।

—তাহলে ঝগড়াটি কী?

—সশস্ত্র বিদ্রোহ। কোন কারণেই আমরা তা বরদাশত করতে পারি না। এ কারণে আমরা তাদের ভুল পদ্ধতি অথবা বলতে পার, তাদের আন্দোলনের রাজ-নৈতিক দিকটি প্রতিহত করছি। আমরা সবাই ত মুসলমান। তাই না?

লোকটির কথার মধ্যে যে মিথ্যা ও বিকৃতি ছিল নাবিলা তা বুঝতে পারল। সে জানে ইখওয়ানের আচরণে শক্রতামূলক কোন কিছু প্রথমে প্রকাশ পায়নি। সে আরো জানে ইখওয়ানের সাথে পূর্বে প্রেসিডেণ্টের সম্পর্ক ছিল এবং তারাও বিপ্লবীদের হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করেছে। এমন কি বিপ্লবী পরিষদের কিছু প্রভাবশালী নেতা ছিল ইখওয়ানের সদস্য। এই সহযোগিতার ভিত্তি ছিল জাতীয় স্বাধীনতা ও খোদায়ী বিধান অনুযায়ী দেশ শাসন ও পরিচালনার লক্ষ্যে পথ উম্মুক্ত করা। যাতে সবার জন্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু বিপ্লব তাদের ধোকা দিয়েছে, বার বার তাদের বন্দী করে কণ্ঠরোধ করেছে, তাদের রুজী-রোজ-গারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল তারা বুনেছে। তদন্তে যেমন প্রমাণ হয়েছে, মুনশিয়ার ঘটনা সম্পর্কে 'মুরশিদে আম' কিছুই জানতেন না তেমনিভাবে অন্যান্য শাখা সংগঠন ও নেতৃবর্গও এ সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। ঘটনাটি কতিপয় লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সরকার প্রকৃত ঘটনা উদঘাটন না করেই খুব তাড়াহুড়োর মাধ্যমে বিচার করে তাদের শাস্তি দেয়। ঘটনাটি সম্পর্কে বিরাট এক অস্পষ্টতা ও সন্দেহের ধূম্রজাল সৃষ্টি করা হল। বাস্তবিকই, যখন একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী এ ঘটনার জন্যে দায়ী তখন এত ব্যাপক পৈশাচিক হামলার কোন অর্থই ছিল না। আর এত মারপিট ও ধরপাকড় করা হয়েছে যা মিসরের বুকেই শুধু নয় বরং সারা মুসলিম বিশ্বে সত্য ও স্বাধীনতার স্তম্ভ প্রকম্পিত করে তোলে। এ ব্যাপারে মিসরের শাসকরা যে নজীরবিহীন কঠোর ও নির্মম পদক্ষেপ গ্রহণ করে, স্বাধীন বিশ্বের প্রতিটি সংবাদপত্র ও রেডিও তার প্রতি ঘৃণা ও ধিককার

জানায়। তাছাড়া এ ব্যাপারে ইখওয়ানের চিন্তা ও মতামত পর্যালোচনারও অনুমতি দেয়া হয়নি। এভাবে দোষী ব্যক্তি তার মতামত প্রকাশের সুযোগ পেল না।

নাবিলা সবকিছুই বুঝতে পারল বরং একটু বেশীই বুঝল। তবে সে অনুভব করল, তার নিজের এবং এ সব মজলুমদের বিপদে পড়ার মধ্যে কোথাও যেন একটি সুক্ষ্ম যোগসূত্র আছে। একারণে সে অতিদ্রুত অত্যন্ত সুক্ষ্ম ও বুদ্ধিমত্তার সাথে বিষয়টি আবার পর্যালোচনা করল। তারপর একটা দীর্ঘ বানোয়াট হাসি হেসে সে বলল—এখন আমি বুঝেছি।

—আশা করি এতটুকুতেই পরিতৃপ্ত হবে।

—পূর্ণ পরিতৃপ্ত।

—এতটুকুই যথেষ্ট নয়।

—অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নাবিলা প্রশ্ন করল—এরপর আর কি ?

—তুমি হচ্ছ বিপ্লবী সন্তান। তোমার ওপর রয়েছে বিরাট দায়িত্ব। তোমার আত্মীয়দের এসব কথা বুঝান তোমার কর্তব্য।

নাবিলা খিলখিল করে হেসে উঠল। হতভম্বের মত লোকটি তার দিকে তাকিয়ে বলল—তুমি হাসছ কেন ?

লোকটির কানের দিকে ঝুকে পড়ে নাবিল তার কানে কানে বলল—আমি জাতীয় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারীদেরই একজন। গোয়েন্দা বিভাগকে সহায়তা করি।

লোকটি হো হো করে হেসে উঠে নাবিলার হাতে হাত মিলিয়ে বলল—তুমি প্রথমেই কেন আমাকে একথা বললে না ?

—উতওয়া আপনাদের বলেনি ? সে আমার বাগদত্তা !

লোকটি মৃদু হাসল। আর একথা বলতে বলতে চোখ দিয়ে একটু ভ্রুকুটি কাটল...আমরা সব কিছু জানি। তোমার ব্যাপারে যা কিছু ঘটেছে সবই প্রেসিডেন্টের নজরে আছে। শিগগিরই তিনি উতওয়াকে বকাঝকা করবেন। তোমার ব্যাপারে যা ঘটেছে এটা নিছক একটা কঠিন রসিকতা।

নাবিলার হাত পা যেন অসাড় হয়ে আসছিল। সে গুরুত্ব সহকারে লোকটির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল—আপনি কী বলতে চাচ্ছেন ?

এটা উতওয়ার একটু তামাসা। তুমি যখন তার কথায় রাজি হচ্ছিলেনা, তখন তোমাকে বাধ্য করানোর জন্যে কিছু শিক্ষা দিয়েছে। যারা তোমাকে গ্রেফতার করেছিল, উতওয়া তার সেই বন্ধুদের সাথে ব্যাপারটি নিয়ে পরামর্শ করেছিল। তারপর যা কিছু ঘটল তা নিয়ে আমরা কত হাসাহাসি করেছি। উতওয়া একটি বোকা, মোটাবুদ্ধির লোক ও বলদ প্রকৃতির। আমরা তাকে চিনি। তার নির্বুদ্ধিতার কারণে আমরা তাকে কোন গুরুত্ব দেইনি। বরং সব সময় আমরা তাকে নিয়ে হাসি তামাশা করি।

একথা শুনে নাবিলা তার চোখ দু'টি বন্ধ করল। তার মাথা ঘুরছে। সে যা

শুনছে তা যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। তবে তাকে এ নাটকের শেষ পর্যন্ত অভিনয় করে যেতে হবে।

এরপর সে তার চোখ দু'টি খুলে বলল—আমার ভাবি বরকে নিয়ে ব্যঙ্গ করলে আমি কিন্তু আপনাকে ক্ষমা করব না।

আমি তাকে ব্যঙ্গ করছি না। খুব শিগগিরই আমরা একত্রিত হব। তুমিও আমাদের সাথে থাকবে এবং আমরা সকলে মিলে একসাথে একটি আনন্দপূর্ণ রাত্রি অতিবাহিত করব। এভাবে আমরা তোমার ব্যাপারে যা ঘটে গেছে তা পূরণ করতে পারব। আসলে প্রতিটি ব্যাপারেই উতওয়া একটু বেশী রসিক। প্রেসিডেন্ট তাকে খুবই ভালোবাসেন।

কান্নায় নাবিলার কণ্ঠরোধ হয়ে আসছিল। মনে মনে সে বলল কুকুর—নিকৃষ্ট! লোকটি সে সময় টেলিফোনে কারো জবাব দিচ্ছিল। কথা শেষ করে লোকটি নাবিলার একটু নিকটে এসে স্নেহভরে তার কাঁধে একটা হাত রেখে বলল—তোমার এখন মত কি?

—প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ।

—তিন দিন পর সম্ভব হবে। তিনি এখন নেই। কিন্তু আমার বিশ্বাস, এত ব্যস্ত হওয়ায় কিছু নেই। ভবিষ্যতে তার সাথে দেখা করার বহু সুযোগই তোমার আসবে। তুমি ত একজন উচ্চ পদস্থ নিষ্ঠাবান লোকের স্ত্রী। এরপর সে হাসতে হাসতে বলল—সে ত একজন সঙ্গপ্রিয় রসিকও।

—এটা জীবনের একটি চরম সুযোগ। আমি তাঁকে দেখার সৌভাগ্য অর্জন করতে চাই।

লোকটি ছোট্ট একটি যন্ত্রের বোতাম টিপতে টিপতে বলল—তুমি তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে চাও?

যখন ক্যাসেট রেকর্ড করা তার কথা সে শুনতে পেল তখন সে ভীষণ ঘাবড়ে গেল। ঘৃণা ও ক্রোধ সত্ত্বেও সে বলল—আমার কণ্ঠস্বর এত ভাল তা আমি আগে জানতাম না।

লোকটি বলল—প্রেসিডেন্ট নিজেই এ কণ্ঠস্বর শুনবেন।

নাবিলা একটু বিনয়ের ভান করে বলল—এর সাথে আরো কয়েকটি কথা আমি সংযোজন করতে চাই।

—বল।

নাবিলা একটু গলা ঝেড়ে যন্ত্রটি রেডি করার অপেক্ষা করতে লাগল। তারপর সে বলতে থাকল—প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন এমন একটি আশা আকাঙ্খা যা দ্বারা ইতিহাসের সূচনা লগ্ন থেকেই লক্ষ কোটি মানুষের অন্তর আন্দোলিত হয়েছে, শত শত বছর ধরে বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের কল্পনায় ঘুরপাক খাচ্ছে। হে মহান নেতা, তুমি এগিয়ে চল, আমরা তোমার পিছনেই আছি। আমাদের হৃদয় তোমাকে ঘিরে রয়েছে, আমাদের মুখ তোমার কল্যাণ কামনায় মুখর। হাজার হাজার বছরের

মধ্যে তুমি একমাত্র মিসরীয় শাসক যে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সঠিকভাবে দেশ পরিচালনা করছ।

নাবিলা শেষ করতে পারল না। হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল। সে বিপরীত কিছু বলতে চাচ্ছিল। সামরিক কারাগারের সেই মানবতার ভয়াবহ কসাইখানায় বিষাদগ্রস্থ হতভাগাদের কথা সে বলতে চাচ্ছিল। আর সে কাঁদতে চাচ্ছিল সত্যের অপমৃত্যু, জীবনযাপন এবং মিথ্যা ও ধোঁকাবাজিতে পূর্ণ বিশ্বের জন্যে, যে দিকে মানুষকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। যেমন এখনই তার ব্যাপারে ঘটে চলেছে।

লোকটি বলল—প্রেসিডেন্টের প্রতি দৃঢ় অবস্থায় সত্যি সত্যিই তোমার অন্তর পরিপূর্ণ। তোমার এ কথা প্রেসিডেন্ট শুনলে তিনি ভীষণ খুশী হবেন। আমার বিশ্বাস খুব শিগগিরই তুমি একটি বিরাট পদ পেয়ে যাবে। তাছাড়া ক্রমশ যা বাড়বে তা তোমার ভুলা উচিত নয়।

অশ্রু মুছতে মুছতে নাবিলা বলল—আশা করি আপনি এ সব কথা উতওয়াকে বলবেন না। যা ঘটেছে তা সে জানতে পেলে আমার থেকে দূরে সরে যাবে।

—তা করতে সে সক্ষম হবে না।

—কেন?

—সে প্রেসিডেন্টের রাগের ভয় করে।

—তাহলে সে কি আমার সাথে সম্পর্ক ঠিক রাখবে?

—এ ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নেই।

লোকটি একটি 'কেন্ট' সিগারেটে আগুন ধরাতে থরাতে বলল—যা হোক, তুমি যা চাচ্ছ তা আমি করব। উতওয়াকে আমি কিছুই বলব না। গোয়েন্দা বিভাগে তার রসিকতার কথা তোমাকে আমি বলেছি, একথা যেন সে জানতে না পারে।

এ ব্যাপারটি স্বয়ং প্রেসিণ্টের উপরই ছেড়ে দিয়েছি। আর আমি নিজে কখনই তাকে কিছু বলব না। একথা বলে নাবিলা উঠে দাঁড়াল এবং হাত নেড়ে বলল—বাই, বাই। ভুলবেন না। সত্যিই আমাকে ডাকা হয়েছিল। তারপর কিছুটা হাসির ভান করে সে বেরিয়ে গেল।

নাবিলা যেন পথহারা ব্যক্তির মত চলছিল। পায়ে হেঁটে চলতে তার খুবই ভাল লাগছিল। রাস্তা জনাকীর্ণ। দামী দামী জিনিসপত্রে দোকানপাট সুসজ্জিত। গাড়ীর ভেপু ও চলার শব্দে আকাশ বাতাস মুখরিত। এ শোরগোল ছাপিয়ে ক্যাসেট থেকে সুমধুর গানের সুর ভেসে আসছিল। আর সে গানের সুরে গৃহহীন ভিক্ষুক শিশুদের রাতের ঘুম ভেঙ্গে যাচ্ছিল, যারা তাদের ময়লা ছেঁড়া কাটা চাদর মুড়ি দিয়ে খালি গা ও বিপর্যস্ত অনুভূতিকে ঢেকে কোন দেয়াল বা অট্টালিকায় পাশে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিছুক্ষণ আগে যা ঘটে গেল তা ছিল তার কাছে একটি আশ্চর্যজনক ব্যাপার। সে সময় তার মুখ দিয়ে অহমিকা, কঠোর সমালোচনা, আত্মসমর্পন, কৃপা ভিক্ষা, আস্থা অর্জন ইত্যাদি বিপরীত ধর্মী কথাবার্তা প্রকাশ পাচ্ছিল। তার মাথার মধ্যে সব কিছু ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছিল। সে

অনুভব করছে তার পা দু'খানি তাকে যেন বইতে পারছে না। কিন্তু সে নিজেকে সংবরণ করে নিয়ে দ্রুত পায়ে চলতে লাগল, যেন সে কোন মহামারী এলাকা থেকে পালাচ্ছে। তার মনে হচ্ছে, তার গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্যে কোন গোয়েন্দা তার পিছনে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে। ট্রাফিক সিগন্যালের কাছে একটি টেক্সি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতে পেল। গাড়ীটি চলা শুরু করতেই হঠাৎ সে তার সামনে গিয়ে পড়ল এবং দ্রুত ডান দিকে সরে গিয়ে দরজার হ্যাণ্ডেল মুঠ করে ধরল! গাড়ীর ড্রাইভার খেঁকিয়ে উঠে দ্রুত চলতে চলতে বলল—তুমি এটা কি করলে? আমি ত পিষেই ফেলতাম।

—মাফ করবেন।

পরবর্তী ষ্টেশনে নাবিলা মানুষের প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল। তারপর পাশের একটি রাস্তায় গিয়ে উঠল। চারদিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল-না। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে একটি টেকসি পেল এবং তাতে চড়ে ডাক্তার সালামের চেম্বারে গিয়ে পৌঁছল। নাবিলা সেখানে নিজের অবসাদক্লান্ত দেহটি ডাক্তারের সামনের একটি চেয়ারে এলিয়ে দিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠল। ডাক্তার তাড়াতাড়ি নাবিলার শরীরে একটি ইনজেকশন পুশ করে তার কথা শুনতে লাগল। সে বুঝতে পারল, নাবিলা তাদের সামনে প্রকৃত সত্য পূর্ণরূপে তুলে ধরতে এবং তাদের সামনাসামনি তাদেরকে অত্যাচারী, নিষ্ঠুর, প্রতারক ইত্যাদি বলতে না পারার জন্য অনুতপ্ত। ডাক্তার সালেম তাকে তার দুঃখবেদনা প্রকাশ করে হালকা হওয়ার সুযোগ দিল। সে শান্ত ও ধীরস্থির হলে ডাক্তার বলল—এটাত স্বাভাবিক ব্যাপার।

—কীভাবে?

ডাক্তার তার চশমার ভিতর দিয়ে কক্ষের চারদিকে একবার নজর দিয়ে বলল—একজন সাহাবী রসূলুল্লাহর (স) কাছে এসে কাঁদতে কাঁদতে মুশরিকদের বিরুদ্ধে তাদের অত্যাচার, হঠকারিতা এবং তাকে গালাগালি দেয়ার জন্যে জোর-জবরদস্তির অভিযোগ করল। রসূলুল্লাহ (স) মৃদু হেসে বললেন, যদি তারা আবার এরূপ করে, তুমি তাদের কথা অনুযায়ী কাজ করবে। নাবিলা! তুমি জোর-জবরদস্তির অবস্থায় আছ। তোমার অন্তর ত প্রেম-ভালোবাসা, কল্যাণ ও ঈমানে পরিপূর্ণ। জিহ্বা যা বলেছে তার জন্য তুমি দায়ী নও।

চারদিকে আমি অন্ধকার দেখছি। নিজেকে আমার মনে হচ্ছে, আমি একটা বাজে সৃষ্টি, অত্যাচারীর কঠোরতা ও ধমকির সামনে ভীত হয়ে পড়ি। এই যদি অবস্থা, তাহলে সত্য কে বলবে?

দৃঢ় কণ্ঠে ডাক্তার সালেম বলল—তুমি।

—কীভাবে?

—তোমার কাজের দ্বারা।

ঘাড় থেকে টেথিসকোপ নামিয়ে ডাক্তার আবার বলল—সে সত্য ও কল্যানমূলক কাজের জন্য দৃঢ় সংকল্প তার সামনে হাজারো দরজা খোলা। কথার দ্বারা জিহাদ, জিহাদের সবচেয়ে সহজ পন্থা। কথা পরিবর্তন ঘটাতে সাহায্য করে থাকে, তাই বলে কথাই সবকিছু নয়। কথা যদি আচরণ ও কাজে পরিণত হয় তাহলে যা তাই-ই থেকে যাবে। তারপর নাবিলার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলো—বিদেশ যাবার কাগজপত্র রেডী করেছ?

ব্যথাভারাক্রান্ত চোখে তার দিকে তাকিয়ে নাবিলা জবাব দিল—আজ থেকে শুরু করব, ইন্‌শাআল্লাহ।

১৭

সামরিক কারাগারে সাতচল্লিশ নং সেলের কয়েদীরা রাতের বেলা একত্রে গল্প-গুজব করতে বসেছে। শায়খ আব্দুল হামীদ নাজ্জার ময়লা ছেড়া কম্বলটি টেনে গায়ে দিতে দিতে বলল—আমি ইখওয়ানুল মুসলিমীনে যোগ দিয়েছি কেন তা কি তোমরা জান? মা'রুফ চোখ তুলে তাকল। তার কিছু বলার আগেই রেযেক ইব্রাহীম বলে উঠল—কেন?

কেননা, আমি তাদের মধ্যে ফিলিস্তীনের স্বাধীনতার আশা দেখতে পাই।

কবি ইউসুফ মাঝখানে বলে উঠলেন—আল্লার কিতাব ও তাঁর শরিয়তের বাস্তবায়নই হল মুখ্য উদ্দেশ্য।

ইউসুফের দিকে রেযেক চোখ তুলে বলল—দুয়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

ইউসুফ প্রতিবাদ করে বলল—আমি আমার কথার ওপর অটল। বিশ্বে আল্লার ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হলে জুলুমের অবসান হবে এবং সবার স্বাধীনতা নিশ্চিত হবে।

মারুফ অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সবার কথা শুনছিল। আসলে সে স্বল্পভাষী ও গম্ভীর। সে সব সময় তার সাথীদের আল্লার কিতাবের দিকে প্রত্যাবর্তন, তার অর্থ অনুধাবন, ইবাদাত ও ইসতিগফারে সময় অতিবাহিত করার উপদেশ দিয়ে থাকে।

যে ব্যক্তি আল্লার কিতাব গভীরভাবে অধ্যয়ন করে সে সকল সমস্যার সমাধান পেয়ে যায়, তার সামনে রাস্তা পরিস্কার হয়ে যায় এবং সকল প্রকার অস্পষ্টতা ও সন্দেহ দুর হয় বলে সে দৃঢ় বিশ্বাসী। কেননা, সে বিশ্বাস করে, প্রকৃত মুমিন আল্লার নূরের সাহায্যে দেখে থাকে এবং সৎ সংকল্প ও অদম্য ইচ্ছা মানুষের আকাঙ্খাকে বিজয়ী ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করে। মা'রুফ নিরবে একথা বলতে বলতে বের হয়ে গেল—ভায়েরা! এ বিশ্বে 'স্বাধীনতা' বলতে কিছুই নেই। এটাই আমার বিশ্বাস। এতে কোন নড়চড় হবে না।

আইনের ছাত্র রেযেক ইবরাহীম তার কথা থামিয়ে দিয়ে বলল—আমাদের উচিত হবে প্রথমে স্বাধীনতার অর্থ সঠিকভাবে নির্ধারণ করা।

আমি বলি সংক্ষিপ্ত কথায় তা হচ্ছে, তুমি যা চাও তা বলতে পারবে, যা চাও তা করতে পারবে আল্লার আদেশ নিষেধের গণ্ডির ভেতর থেকে। কিছুক্ষণ নিরবতা বিরাজ করল। তারপর মা'রুফ বলল—এ পরিবেশেই তুমি পার স্বাধীনভাবে চলতে ফিরতে আবিস্কার উদ্ভাবন করতে এবং সৌভাগ্য রচনা করতে পার নিজের জন্য ও বর্ণ-গোত্র-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্যে। আর এভাবেই তুমি তোমার মহান লক্ষ্য আল্লার রিজামন্দী পর্যন্ত পৌঁছাতে পার।

কেউ কোন প্রতিবাদ করল না। তবে অসুস্থ নবাগত মাহমুদ সাকার প্রশ্ন করল—এটা কি সহজ কাজ?

প্রতিটি যুগেই এমন অনেক কঠিন কাজ ছিল যার জন্যে বহু আত্মত্যাগের প্রয়োজন হয়েছে।

বিষয়টির ভয়াবহতা ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে রেযেক বলল—কম্যুনিষ্ট বিশ্ব করেছে মানবতার অবমাননা, নানা প্রকার জঘন্য অপরাধে তারা অপরাধী। এক লোকমা আহারের জন্যে হাজারো হতভাগ্য মানুষের রক্তস্রোত বহাচ্ছে, আর আমেরিকাসহ পশ্চিম ইউরোপীয়রা চাচ্ছে তাদের মুক্তি ও স্বাধীনতা। তবে অন্যান্য জাতিকে উপনিবেশে পরিণত করা, তাদের হেয় ও লাঞ্ছিত করা এবং তাদের ধন-সম্পদ লুট করতে তাদের নেই কোন নৈতিক প্রতিবন্ধকতা। এও এক-প্রকার জঘন্য সাম্প্রদায়িকতা। এমনকি তাদের নিজ দেশেই বা স্বাধীনতার রূপ কেমন? ধনাঢ্য ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা সেখানকার শাসক। এ কারণে স্বাধীনতা সেখানে অশ্লীল কথাবার্তা নর-নারীর অবাধ মেলামেশা এবং ধর্ম ও নৈতিকতার বন্ধন থেকে মুক্তির নামান্তরে পরিণত হয়েছে। তুমি তোমার খোদার নামে কসম করে আমাকে বল দেখি সেখানকার পত্র-পত্রিকা, রেডিও-টিভি ইত্যাদির মালিক কারা? আমি স্বীকার করি, তারা কিছুটা সামাজিক ন্যায়বিচার, চিন্তা ও জ্ঞানের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেছে এবং সেখানে প্রকৃতই কিছু নেতাও আছেন। তবে সকল মানুষই সমানভাবে যা ভোগ করে......মানুষের চাহিদা পূরণ করে, সমাজ অর্থনীতি ও চিন্তার কেন্দ্রগুলিতে সকলকে অধিষ্ঠিত করে, তাকেই ত বলে প্রকৃত স্বাধীনতা।

এ বিষয়ের উপর তুমুল আলোচনা চলতে থাকল। রেযেক জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক আইনের উদ্ধৃতি পেশ করতে লাগল। আর ইউসুফ বারে বারে কুরআনের আয়াত, রাসূলুল্লার (স) সহি হাদিস অথবা কোন ফকীহর কথার উদ্ধৃতি তুলে ধরার চেষ্টা করছিল। ঘুরে ফিরে আলোচনা আবার ফিলিস্তীন সমস্যার দিকে ফিরে এল। সবাইকে লক্ষ্য করে রেযেক বিষয়টির জটিলতার ব্যাখ্যা করতে আরম্ভ করল। সে বলল, আমেরিকা ও ইউরোপ ইহুদীবাদের সাথে মৈত্রী-চুক্তিতে আবদ্ধ। যা তাদের রাজনৈতিক জীবন ও চিন্তার জগতে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে আছে। অন্যদিকে রাশিয়া ইসরাইলকে সাহায্য ও সহ-যোগিতা করে যাচ্ছে। আর এই মহাশক্তিশালী প্রবাহের মোকাবিলায় মুসলিম বিশ্বের শাসকবৃন্দ অত্যন্ত দুর্বল। আগের মতই তারা এখনও অনুন্নত, বিচ্ছিন্ন ও

শক্তিহীন। তাছাড়া জাতি হিসেবে, যেমন ধর মিসরী জাতি। তাদের ত কিছুটা বস্তু ও জ্ঞানগত যোগ্যতা আছে। কিন্তু তারা তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে পারছে না। চাবুক তাদের পিঠে আগুনের ফুলকি ঝরাচ্ছে, অত্যাচার তাদের গতিকে স্তব্ধ করে দিচেছ।

এসময় আবদুল হামিদ নাজ্জার বলে উঠল— এ কারণে আমি সব সময় বলে থাকি আমাদের আশা একমাত্র ইখওয়ান। একমাত্র তারাই এমন একটি গোষ্ঠী যারা পূর্ব ও পশ্চিমের কারো কাছে নত হবে না এবং তারা কোন শাসনের সাথেও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবে না, তারা সব সময় আল্লার পথে জিহাদ করে যাবে। আমি একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পেঁৗছেছি। তা হচেছ, আমাদের এ মুসিবতের পিছনে কিছু গোপন হাতের কারসাজী রয়েছে। ইহুদীবাদ ও কম্যুনিজমের অপবিত্র মৈত্রী চুক্তি এবং অ্যাংলো আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের কালো হাত। এরা সবাই ইস-লামের ঘোর শত্রু। কেননা ইসলামের মধ্যে নতুন করে প্রাণচাঞ্চল্য দেখা দিলে এবং মানুষকে আবার তার পতাকাতলে সমবেত করতে পারলে, এসব শত্রুদের স্বার্থের প্রাসাদ ধ্বংস হয়ে যাবে।

এরপর আবদুল হামিদ কোন কথা বলার সুযোগ পেল না। রাতের অন্ধ-কার ভেদ করে কর্তব্যরত সৈনিকের গলার আওয়াজ তার কানে এল—কয়েদী আবদুল হামীদ নাজ্জার, কয়েদী আবদুল হামিদ নাজ্জার, ওরে কুত্তার বাচ্চা, দর-জার কাছে আয়।

ভীত সন্ত্রস্ত আবদুল হামীদ উঠে সেলের দরজার দিকে দৌড় দিল। দরজার কাছে পৌঁছে কম্পিত হাতে দরজায় টোকা দিতে দিতে বলল—জনাব, সাতচল্লিশ নং সেল।

একটা ভীতিজনক নিরবতা নেমে এল। অন্যরাও বন্ধ দরজার দিকে এগিয়ে এল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আবদুল হামিদ বিড় বিড় করে বলল, আল্লাহ তুমি বাঁচাও। আস্তে করে ইউসুফ বলল—এ লাঞ্ছনার যেন শেষ নেই। রেযেক মন্তব্য করল—এ জাহান্নামে মানুষের অধিকার পদদলিত। আর একটু ধরাগলায় মাহমুদ সাকার বলল—তোমরা তোমাদের ভায়ের পরিত্রাণ ও সহনশীলতার জন্যে দোয়া কর।

মা'রুফ নিরবে বসেছিল। তার চোখ দু'টি ছিল দরজার অন্ধকারের দিকে নিবদ্ধ। দরজা খোলা হলে সকল 'ইখওয়ানী' দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানিয়ে সবাই এক সাথে বলে উঠলেন, তামাম ইয়া আফিন্দাম। কিন্তু মারুফ বসেই থাকল। সে ব্যথিত চিত্তে দৃশ্যটি অবলোকন করছিল। এমন সময় অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে সৈনিকটি তার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে উঠল—জানোয়ার, তুই উঠে দাঁড়াসনি কেন?

মা'রুফ তার স্থান থেকে বিন্দুমাত্র না নড়েই বলল—চুপ কর। মুখ সামলে কথা বল।

সবাই ধারণা করল, সৈনিকটি তাকে চাবুক লাগিয়ে ছাড়বে। কিন্তু যা ঘটল তা ছিল অতি বিস্ময়কর। কেননা, কয়েদীরা এরূপ আচরণের সাথে এর আগে পরিচিত ছিল না। সৈনিকটি কোনরূপ ভয়ভীতি না দেখিয়ে স্বাভাবিক হয়ে গেল। তারপর আবদুল হামীদকে লক্ষ্য করে চিৎকার করে বলল—তুমি আবদুল হামীদ?

—হঁ্যা।

—এস।

আবার দরজা বন্ধ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পর সবাই শুনতে পেল সৈনিকটি আবদুল হামীদকে নির্দেশ দিচ্ছে—কুইক মার্চ। এরপর শুনতে পেল তার পিঠে পড়া চাবুকের আওয়াজ এবং তার প্রতি বর্ষিত সৈনিকটির অশ্লীল গালাগালি। তার কোন দৃষ্টান্ত তারা অন্য কোথাও খুঁজে পেল না।

মা'রুফ বলল—এস, আমরা কুরআন তিলাওয়াত করে তার জন্যে দোয়া করি।

অবনত মস্তকে তারা কুরআন তিলাওয়াত শুরু করল। অন্ধকার তাদের অশ্রু গোপন করে দিচ্ছিল। তাদের মস্তিষ্কে আবদুল হামীদের ছবি লটকানো, তাদের হৃদয় তার জন্যে ছটফট করছে। যেন তাদের সবার দেহের একটি অঙ্গ ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। অত্যন্ত নির্দয়ভাবে তাকে তার বাকী অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে। তিলাওয়াত শেষ হলে ইউসুফ তার হাত দু'টি আকাশের দিকে তুলে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ভাষায় আবদুল হামীদের জন্যে দোয়া করল। আর তার অন্য সঙ্গীরা তার সাথে সুর মিলিয়ে আমীন আমীন বলতে থাকল।

মা'রুফ ঘুমানোর প্রস্তুতি নিতে নিতে বলল—আমি আশ্চর্য হই এই দেখে যে, মানুষ ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না।

কেউ কোন মন্তব্য করল না। কিছুক্ষণ পর ইউসুফ বলল—আমরা কি ঘুমাব!

রেযেক বলল—তার ফিরে আসা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব।

অত্যন্ত ক্ষীণকণ্ঠে মাহমুদ সরকার বলল—এক, দুই অথবা তিন দিন পরে হয়ত সে ফিরতে পারে।

ইউসুফ বলল—আমাদের কেউ কেউ আর ত ফিরেও আসেনি।

আর মা'রূফ ঘুমানোর প্রস্তুতি নিয়ে এই দোয়া পড়তে পড়তে শুয়ে পড়ল—বিইসমিকা আল্লাহুম্মা ওয়াদাতু জাম্বি ওয়া বিকা আরফাহু, আল্লাহুম্মা ইন আমসাকতু নাফসী ফাগফির লাহা, ওয়া ইন আরসালাতুহা ফাহফিজহা বিমা তাহফাজু বিহি ইবাদাকাস সা-লিহীন—হে আল্লাহ! তোমারই নামে আমি বিছানায় কাত হলাম এবং তোমারই নামে আমি আবার তা উঠাব। হে আল্লাহ; যদি আমি নিজেই আমার নফসকে পরিচালিত করে থাকি তা হলে তুমি ক্ষমা করে দিও, আর যদি আমি তার লাগাম মুক্ত করে দিয়ে থাকি তাহলে তুমি তার হেফাজত কর, যে ভাবে তুমি তোমার সত্যনিষ্ঠ বান্দাদের হিফাজত করে থাক।

এর কারণ খুঁজে পাওয়া যায় এমন কিছু স্মরণ করার চেষ্টা করে আবদুল

হামীদ ব্যর্থ হল। তার শিক্ষা, সমাজ রাজনীতি, এমন কি অনুভূতির সুক্ষ্ম ফিতাটি অতি দ্রুত মাথার মধ্যে ঘুরালো, যাতে এর কারণ সম্পর্কে কোন কিছু আঁচ করতে পারে। কিন্তু সবই নিস্ফল চেষ্টা। কোন মানুষকে গোয়েন্দা অফিসে আনা হবে, আর সে তার অপরাধ সম্পর্কে জানতে পারবে না, এটা খুবই দুঃসহ ব্যাপার। কোন মানুষকে তার জ্ঞাত ভাল কাজের জন্য শাস্তি দেওয়া এর চেয়ে বরং হাজার গুণ উত্তম। লৌহ-কঠিন অন্তরে বহু রক্তাক্ত যুদ্ধে ইহুদীদের মোকাবিলা করেছে আবদুল হামীদ। সে নির্ভীক চিত্তে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। যেন সে তার জীবনের স্বাভাবিক কাজ-কর্ম সঠিকভাবে আঞ্জাম দেয়ার জন্যে অনুশীলন করেছে। কিন্তু এই প্রথমবারের মত গোয়েন্দাদের মুখোমুখি হতে তার হৃদয় কেঁপে উঠছে, চিন্তার বিভ্রম দেখা দিচ্ছে। ইহুদীরা শত্রু। এটা স্বীকৃত ও স্পষ্ট ব্যাপার—যা তার মাথায় স্থির হয়ে গেছে। তারা জবরদখল-কারী, সীমা-লংঘনকারী, অত্যাচারী, বিদেশী। এ ব্যাপারে সন্দেহের কোন অব-কাশ নেই। আর আজ সে তার নিজের ভাইদের মুখোমুখি হয়েছে জুলুম, অত্যাচার ও কঠোরতায় তারা ইহুদীদের মতই করছে। এটাও একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। এতেও বহু জীবনের অবসান ঘটছে। আবদুল হামীদ সেই স্থায়ী কসাইখানার রক্তাক্ত আঙ্গিনায় পেঁছে গোয়েন্দা ইনস্পেক্টরের দিকে তাকাতেই সে নির্দেশ দিল—তাকে সিরিয়ার ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের সাথে রাখ। অর্থাৎ সিরিয়ার প্রচারপত্র।

অফিসারটির কথা আবদুল হামীদ কিছুই বুঝল না। সিরিয়ার প্রচার পত্রই বা কী? আর তার সাথে তার নিজের সম্পর্কই বা কী? আবদুল হামীদ সেখানে নিজেকে একদল লোকের মধ্যে দেখতে পেল, যাদের কাউকেই চিনে না। সে তার পাশে একটু তাকাতেই একজন সৈনিক দ্রুত তাকে চাবুকের আঘাত করতে করতে বলল—দেওয়ালের দিকে মুখ রাখ, হাত ওপরে উঠা।

চাবুকের আঘাতে আবদুল হামীদের পিঠ কুঁকড়ে যাচ্ছে। শঙ্কামিশ্রিত করুণ দৃষ্টিতে সে সৈনিকটির দিকে চোখ তুলে তাকাল। তখন সে তার ওপর আরোপিত দায়িত্ব দ্রুত পালন করে চলেছে। আবার আবদুল হামীদের স্মৃতিতে সেই সিরিয়ার প্রচারপত্র—গোয়েন্দা ইনস্পেক্টারের কথাটি ভেসে উঠল। এব্যাপারে সে চিন্তা করতে থাকল। এগুলি হয়ত এমন কিছু ছাপানো কাগজপত্র হবে, যাতে মিসরের বর্তমান অবস্থার সমালোচনা করা হয়েছে এবং কারাগারে নিপী-ড়িত বন্দীদের পক্ষ সমর্থন করেছে। এছাড়া আবদুল হামীদের মাথায় আর কিছু ঢুকছে না। তা না হলে তারা তাকে এখানে টেনে আনত না এবং তার অর্ধ উলঙ্গ দেহটি এভাবে রক্তেও রঞ্জিত করত না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে এব্যাপারে কিছুই শোনেনি এবং এর সাথে তার কোন সম্পর্কও থাকা সম্ভব নয়।

তার পেছনে দাঁড়ান সৈনিকটি একটু অন্যমনস্ক হলে সে তার পাশে দাঁড়ান লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করল। হায় আল্লাহ! সে কী দেখতে পেল? সে দেখল,

একটি মেয়ে তার নিকটেই দাঁড়িয়ে। সে আরো অবাক হয়ে গেল যখন সে দেখতে পেল, একজন সৈনিক তার কাছে এগিয়ে মেয়েটির দেহের একটি স্পর্শকাতর স্থান দু'হাত দিয়ে মুঠ করে ধরছে। আর মেয়েটি প্রতিবাদের সুরে চিৎকার করে উঠছে— ওরে পাপী, ছোটলোক। সে দেখতে ও শুনতে পেল চাবুকের আঘাত পড়ছে মেয়েটির শরীরে। আর তার ক্ষমা ও অনুকম্পা প্রার্থনার ব্যথিত স্বর ইথারে বিলীন হয়ে যাচ্ছিল। আবদুল হামীদের কণ্ঠে এমন সব অশ্লীল গালি এসে যাচ্ছিল- যা কোন বিবেক বিশ্বাস করতে পারে না। ব্যাপারটি ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে পড়তে লাগল। সময় বাড়ছে না কমছে, আবদুল হামীদ তা ঠাহর করতে পারছিল না। কান্না, অনুনয়, বিনয়, প্রশ্ন ও উত্তরের যে সব কথাবার্তা তার কানে আসছিল, তা সে একাগ্রচিত্তে শুনছিল। ভাবটি এমন মনে হচ্ছিল, যেন সে কিছু বুঝতে পারছে। অবশেষে অফিসার এল এবং তার নিকট এসে বলল—আবদুল হামীদ ?

—জনাব আফেন্দী, জী।

—আমি কোন কিছু পুনরাবৃত্তি পছন্দ করিনে।

—জী।

—আবদুল হামীদ ! সিরীয় প্রচারপত্রগুলি কারা ছড়িয়েছে ?

—কোন্ প্রচারপত্রগুলি ? আমি তো সে সম্পর্কে কিছুই জানিনে।

—আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তুমি একজন পাকা আযহারী, সহজে তুমি কিছুই স্বীকার করবে না।

—আল্লার কসম আমি কিছুই জানিনে।

—এ অস্বীকৃতি তোমার কোন উপকারে আসবে না।

—আল্লার কসম জীবনে আমি কখনো সিরিয়ায় যাইনি।

—আবদুল হামীদ, তুমি আমাকে বুঝাও ত… এ প্রচারপত্রইত আযহারে বি'লি করা হয়েছে !

আবদুল হামীদ বলল—আযাহার ক্যাম্পাসে ত হাজার হাজার মানুষের আনাগোনা।

—কিন্তু সেখানে তো একজনই আবদুল হামীদ।

—আমি তো নই।

—আমাদের ধারণা, তুমি এ অপরাধের সাথে পুরোপুরি জড়িত।

—তার প্রমাণ কি ?

অফিসারটি আবদুল হামীদের মুখে একটি থাপ্পর বসিয়ে দিয়ে বলল—ওরে ছন্নছাড়া কুত্তার…… আমার কাছে প্রমাণ চাস ?

বিষন্নভাবে আবদুল হামীদ তার দিকে তাকিয়ে বলল—আমি নিশ্চিত, সে ব্যাপারে আমি কিছুই জানিনে।

জিজ্ঞাসাবাদকারী অফিসারটি থু থু ফেলে একটু সংযমী হল। তারপর

বলল—ভালকথা, মেয়েটি বলছে, দু'জন আযহারী ছাত্রকে ট্রামে প্রচারপত্র সম্পর্কে আলাপ করতে শুনেছে।

—তারা কে?

—আবদুল হামীদ! আমরা ত তা জানিনে। যদি আমরা জানতাম, তা হলে ত ব্যাপারটি শেষ হয়ে যেত।

এরপর অফিসারটি ডানদিকে তাকিয়ে বলল—ওয়াফা, তুমি এস।

কাঁপতে কাঁপতে একজন যুবতী মেয়ে উপস্থিত হল। অফিসারটি বলল—বেটি, ভয় নেই। আমরা শুধু প্রকৃত ব্যাপার উদঘাটন করতে চাই। তুমি কি এ লোকটিকে চেন?

—জনাব, মিথ্যা বলা হারাম। আমি তাকে চিনিনে। একথা বলতে বলতে মেয়েটি মাথা ঝাঁকাল।

অফিসারটি হাত দিয়ে ইশারা করতেই আবদুল হামীদের পাশে একটু দূরে দাঁড়ান কয়েকজন লোককে হাজির করা হল, তাদের সংখ্যা পাঁচের অধিক হবে। তাদের সকলের দৃষ্টি ছিল প্রাচীরের দিকে আর হাত ছিল মাথার ওপরে। তারা আবদুল হামীদকে চেনার জন্যে এক এক করে তার পাশ দিয়ে চলে গেল। কিন্তু কেউ তাকে চিনতে পারল না। বিড় বিড় করে অফিসারটি বলল—এখানে পারস্পরিক বুঝাপড়ার মাধ্যমে সবসময় সমস্যার সমাধান পাওয়া যায় না এবং কোন জটও খুলতে পারে না। চাবুকই তার একমাত্র সমাধান।

মুহূর্তের মধ্যে একই সাথে সকলের শরীরে চাবুকের আঘাতে আগুনের ফুলকি ঝড়তে শুরু করল। তাদের মধ্যে 'ওয়াফা'ও ছিল। তার বিশেষ ধরনের কান্না ও চিৎকারে মানুষের হৃদয়তন্ত্রীগুল ছিন্নভিন্ন হবার উপক্রম হচ্ছিল। আবদুল হামীদ নাজ্জারের জন্যে ছিল সে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য। তখন তার স্মৃতিতে ভেসে উঠল বৈরুত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরতা তার এক সহোদরার কথা, সেও ওয়াফার বয়সী। কে জানে? তারা হয়ত ওয়াফার প্রতি রহম করবে না। তারা হয়ত কালো সৈনিকদের নির্দেশ দেবে তার সতীত্ব হরণের। যদি তাই করে তাহলে তাকে ক্ষত-বিক্ষত ও হতাশাগ্রস্তভাবে কাটাতে হবে সারাটা জীবন। ইহুদীরা কোন কোন সময় এমনটি করেছে। সে শুনেছে, এখানে মুর্খ সৈনিকরা এমনটি করে থাকে! তাদের বোকামী ও অত্যাচারের কোন সীমা নেই। আবদুল হামীদ একদিন তার জীবন দেশের জন্যে উৎসর্গ করেছিল এবং নিজেকে আল্লার নিকট সঁপে দিয়েছিল। যখন সে হঠকারী ইহুদীদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত তখন তার নিজ দেশের মাটিতে শহীদ হওয়া প্রায় নির্ধারিত ছিল। এরপর যখন সে ইসলামের মূলনীতির প্রতি ঈমান এনে ইখওয়নুল মুসলিমীনের সাথে যোগ দিল, তখন সে বুঝতে পারল, ইসলামের জন্য তার সংগ্রাম ভয়াবহতার দিক দিয়ে মাতৃভূমির জন্যে যুদ্ধের থেকে কোন অংশে কম নয়। এ দলটির মুক্তির জন্যে, আর বিশেষ করে এ মেয়েটির ইজ্জত-আবরু এবং তার ভবিষ্যৎ রক্ষার জন্যে সে চেষ্টা

করবে না কেন?

উচ্চ স্বরে আব্দুল হামীদ চিৎকার করে বলল—থামুন, আমি সত্যিকথা বলছি।

চাবুকধারীদের থামতে ইশারা করে অফিসারটি তার দিকে এগিয়ে গেল। একটু কুৎসিত হাসি হেসে বলল—আবদুল হামীদ বল, তুমি একজন সত্যবাদী ও বীর পুরুষ। কোন শাস্তিকে ভয় না করে সত্যকে স্বীকার করাই ত হচ্ছে বাহাদুরী। শাস্তি ত কেবলমাত্র বোকা ও জন্তু-জানোয়ারদের উপযুক্ত। তুমি ত লালিত পালিত হয়েছ দ্বীনি পরিবেশে। আর তুমি আল্লাকেও জান।

আবদুল হামীদ তার দিকে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থেকে একটু তিক্ত হাসি হাসল। অফিসারটি চিৎকার করে উঠল—কথা বল।

আবদুল হামীদ বলল—আমিই প্রচারপত্র ছড়িয়েছি। সত্যি বলতে কি, আমি কখনো সিরিয়ায় যাইনি। কিন্তু যে ঐগুলি পাঠিয়েছে তার নাম অলীদ আবদুর রহীম।

অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে অফিসার তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল—অলীদ কে? কোথায় থাকে? তোমার সাথে দেখা হল কি করে?

ইহুদীদের সাথে যুদ্ধের সময় অলীদ ছিল একজন স্বেচ্ছাসেবী ও আমার সঙ্গী। সে সিরিয়ার অধিবাসী এবং ইখওয়ানের সদস্য। আমার জানামতে সে হলব এর বাসীন্দা। সে ডাকযোগে আমার নিকট পাঠিয়েছে।

কিছুটা দ্বিধার সাথে মাথা নেড়ে অফিসার প্রশ্ন করল—ডাকযোগে?

—হ্যাঁ।

—সেই প্রচারপত্রগুলি কোথায়?

—সবগুলিই বিলি করে ফেলেছি।

—কোথায়?

কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবদুল হামীদ বলল—রাস্তায়, ট্রামে, বাসে, আযহারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে।

—এর সংখ্যা কত হবে তা কি তোমার জানা আছে?

—তা প্রায় এক শ'রও বেশী।

—প্রচারগুলি যাদের তুমি বিলি করেছ, তাদের কারো নাম কি তোমার জানা আছে?

—না।

—আযহারে তোমার কোন বন্ধুদের কি দাওনি?

—একবার দেয়ার চিন্তা করেছিলাম কিন্তু পরে আমি আর তা করিনি।

—কেন?

—তাদের কেউ গ্রেফতার হলে আমার নাম বলে দেবে এই ভয়ে।

অনুচ্চস্বরে বিড় বিড় করে অফিসার বলল—শয়তান, পাক্কা সন্ত্রাসবাদী।

অবশেষে অফিসার প্রশ্ন করল—প্রচারপত্রগুলির একটিও কি তুমি রাখনি?

চালাকীর ভান করে আবদুল হামীদ জবাব দিল—ভবিষ্যতে বিপদে পড়তে হয় এমন কিছু সংরক্ষণ করা যুক্তিসংগত নয়।

তা সত্বেও অফিসারটি তার এক সঙ্গীকে তাড়াতাড়ি ডেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জরুরী সংকেত পাঠাবার দায়িত্ব দিল। যেন তারা পূর্বের ধারণা অনুযায়ী আবদুল হামীদ নাজ্জার ও তার সঙ্গীদের বাড়ী ঘরে সূক্ষ্ম তল্লাশী চালায়।

তারপর অফিসার আবদুল হামীদের কাছে ফিরে এসে বলল—আশা করি প্রচারপত্রে লিখিত বক্তব্য একটু আমানতদারীর সাথে তুমি আমাকে বলবে।

—আমানতদারীর সাথে?

হ্যাঁ।

আবদুল হামীদ কিছুক্ষণ চুপ থাকল। কাহিনীটি ত সম্পূর্ণ মনগড়া, আর কল্পনা প্রসূত। যাতে এসব মজলুমরা মুক্তি পেয়ে তাদের পরিবার পরিজনদের কাছে ফিরে যেতে পারে। আর যাতে এই হতভাগা মেয়ে ওয়াফা নেকড়েদের হিংস্র থাবা থেকে পরিত্রাণ পায়। যে নেকড়েরা করুণা, ভদ্রতা ও ন্যায়বিচার বলতে কিছু-ই জানে না। এমনকি তার সিরীও বন্ধুটির নামটি পর্যন্ত বানোয়াট, বাস্তবে তার কোন অস্তিত্ব নেই। প্রচারপত্রের কাহিনীটির সম্পূর্ণই যখন বানোয়াট তখন তার বিষয়বস্তু সে কিভাবে বলবে? একটা ভীষণ কষ্টদায়ক ব্যাপার। কিন্তু তাকে তা করতেই হবে এবং কুরবানীর চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাতে হবে। সে জানে, সে নিজে মিথ্যা বলছে। কিন্তু ভদ্রজনের মিথ্যা। যারা মজলুমদের মুক্তির জন্যে নিজের জীবনকে কুরবানী দেয়। যেন আবদুল হামীদ একাই শাস্তি পাক। এটা নির্দোষ ব্যক্তিদের আজাব ও মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া থেকে অপেক্ষাকৃত লঘুপাপ। তদন্ত-কারীদের একটি সিদ্ধান্তে অবশ্যই পৌঁছাতে হবে, তা সে তার শরাফত ও জীবনের পবিত্রতার বিনিময়ে হোক না কেন। কিন্তু এ প্রচারপত্রের বিষয় কি হতে পারে?

অফিসার চিৎকার করে উঠল—আবদুল হামীদ, কথা বল। তুমি বলে ফেল। তাহলে এসব হতভাগ্য মুক্তি পেয়ে যাবে।

—জনাব! আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি, এরা সবাই মজলুম। বিষয়টির সাথে এদের কারো কোন সম্পর্ক নেই।

—জানি, জানি।

আবদুল হামীদ গলা একটু পরিস্কার করে নিয়ে বলল—প্রচারপত্রে বলা হয়েছে, বিপ্লবের পথভ্রষ্টতা, নির্দোষ লোকদের ওপর অত্যাচার, ঔপনিবেশিক শক্তির পশ্চাতে চালিত হওয়া ও ইসলামের প্রতি তার বৈরীতামূলক আচরণ সম্পর্কে। তাতে আরো বলা হয়েছে, জনগণের স্বাধীনতার অবলুপ্তি, শাসনতন্ত্রের অবমাননা, বিনা বিচারে অসংখ্য ইখওয়ান কর্মীদের হত্যা, মিসরীয় জনজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিরাজিত চরম বিশৃঙ্খলা, গোটা জাতির পেছনে গোয়েন্দা লেলিয়ে দেওয়া, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের নির্যাতন, তাদের কাউকে পদ থেকে অপসারণ, অধিকাংশ চিন্তাশীল ব্যক্তিবৃন্দ ও স্বাধীনচেতা লেখকদের ভীতি প্রদর্শন, ইসলামী চিন্তাবিদ

ও স্বাধীন মতামতের অধিকারী ব্যক্তিদের প্রতি দুর্ব্যবহার ও নিকৃষ্ট আচরণ এবং মসজিদ, মক্তব ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে গোয়েন্দা বিভাগীয় লোকদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত করা সম্পর্কে। আবদুল হামীদ এতটুকু বলে কিছুক্ষণ চুপ থাকল।

অফিসারটি পুনরায় প্রশ্ন করল—তারা জাতীয় আদালত সম্পর্কে কোন কিছু বলেনি?

আবদুল হামীদ একটু বিদ্রূপপূর্ণ হাসি হেসে বলল—তারা বলেছে, এটা জংলী আদালত। সম্পূর্ণ সংবিধান বিরোধী। আর একদল বিকৃত ও পথভ্রষ্ট লোকেরাই এর বিচারক।

একথা শুনে অফিসার ঠোঁট নেড়ে আস্তে বলে উঠল—ওরে আল্লাহ! তার-পর?

বিচারের পূর্বেই রায় তৈরী হয় এবং তা কার্যকরী হয়ে যায়।

কি চমৎকার! হারামজাদারা তা কিভাবে জানল?

সংবাদপত্রে বিষয়টি নিরপেক্ষভাবে চিত্রিত হয় না। বরং বিকৃত করে ইখও-য়ানকে দোষারোপ করা হয়। আর উদ্দেশ্যপ্রনোদিতভাবে তাদের সংগ্রামকে বিকৃত করা হয়। তাদের প্রতি আরোপ করা হয় মিথ্যা ও বানোয়াট অপবাদ।

রাগে অফিসারের চেহারা লাল হয়ে গেল। সে প্রশ্ন করল—তারপর?

তারপর জাতিকে আহবান জানান হয়েছে, জুলুম ও বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে বিপ্লব করে দায়িত্বশীলদের দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষাদানের প্রতি! আরো বলা হয়েছে, বিজয় নিশ্চিত, সমাগত। মিথ্যার সাম্রাজ্য ক্ষণিকের, আর সত্যের সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব শেষদিন পর্যন্ত।

রাগে, ক্ষোভে দাঁত কাটতে কাটতে অফিসার বলল—আর কিছু আছে?

—না।

আবদুল হামীদের কানটি ধরে জোরে টানতে টানতে অফিসার বলল—ওরে ছোটলোক, ছন্নছাড়া কুত্তার বাচ্চা, এমন কথাও কি কেউ মানুষের মাঝে প্রচার করার দুঃসাহস করে?

—এ ত যা ঘটেছে তাই।

—তোকে মৃত্যুদণ্ড দিলেও খুব কম শাস্তি দেয়া হয়।

—সব কিছুই আল্লার হাতে। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন।

—আল্লাহ সম্পর্কে কোন কথা বলবে না।

—তিনি ছাড়া ত আমার আর কেউ নেই।

তোমরা 'ইখওয়ানুশ শায়াতীন' (শয়তানের ভাই)।

কিছুক্ষণ নিরবতা বিরাজ করার পর অফিসার বলল—সিরীয় প্রচারপত্রের ঘট-নায় সন্দেহজনকভাবে ধৃত ব্যক্তিরা আমার কাছে আসছে।

অভিযুক্ত ব্যক্তিরা তার চার পাশে জমা হল। তাদের মধ্যে 'ওয়াফা'ও ছিল।

অফিসার তাদের সকলকে লক্ষ্য করে বলল—যা কিছু ঘটে গেছে আমি তার জন্যে দুঃখিত। কিন্তু এ দোষ আমাদেরও নয়, রাষ্ট্রেরও নয়। এ সবের জন্যে এই পাপিষ্ঠ, ইতর আবদুল হামীদ দায়ী। তোমরাও শুনেছ, প্রচারপত্রের বিষয়বস্তু ও জনগণের মধ্যে তার বিলির দায়িত্ব সে কিভাবে স্বীকার করল, সুতরাং অপরাধটা যে কত বড় তা তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট। আর অপরাধীও তোমাদের মাঝে দাঁড়ান। এখন তোমাদের কর্তব্য হল তাকে উচিত শিক্ষা দেওয়া।

তারপর সে সৈনিকদের নিকট থেকে চাবুক নিয়ে তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে দিল। তারপর তাদের বেষ্টনীর মাঝখানে আবদুল হামীদকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে তাদেরকে নির্দেশ দিল—তাকে পিটাও।

যখন তারা কেউ সাড়া দিল না, তখন অফিসার চীৎকার করে উঠল—তোমরা তাকে না পিটালে, আমরা তোমাদের পিটাব। এস, তাড়াতাড়ি এস...

অভিযুক্তরা প্রত্যেকেই একটি করে চাবুক হাতে নিয়ে আবদুল হামীদকে পিটাতে শুরু করল। আর সে তখন তীব্র বেদনায় মুচকি হাসছিল। এ দেখে অফিসার চীৎকার করে বলে উঠল—এভাবে পিটানো হয় না। তারপর নিজেই একটি চাবুক উঠিয়ে নিয়ে নির্দয়ভাবে আবদুল হামীদকে পিটাতে লাগল। তারপর অভিযুক্ত-দের দিকে ফিরে তাদেরকে পাগলের মত এলোপাথাড়ি পিটাতে থাকল, যাতে তারা সরে গিয়ে আবদুল হামীদকে মনের মত করে পিটানোর সুযোগ করে দেয়। কিন্তু অফিসার যেমনটি চাইল তারা তা করল না। নিরবে আবদুল হামীদ চাবু-কের আঘাত সহ্য করে যেতে লাগল। ওয়াফা তার হাতের চাবুক মাটিতে ফেলে দিয়ে আবদুল হামীদের গলা জড়িয়ে ধরে বলতে লাগল—এ কাজ কেন তুমি করতে গেলে? এটা অন্যায়। তোমার কারণে আমরা যে বিপদে পড়েছি তাতে তুমি খুশি হয়েছ? এর আগে আমি যে কষ্ট সহ্য করেছি তাত তুমি জান না। আমার বুদ্ধি জ্ঞান লোপ পাবার উপক্রম হয়েছিল। আল্লাহ তোমাকে মাফ করুন।

আবদুল হামীদের দু'গণ্ড বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। আর সে বলতে থাকল—মিস ওয়াফা! আমি দুঃখিত। তোমাকে অর্থাৎ তোমাদের বাঁচানোর জন্যে আমি সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছি।

—তোমাদের কি হৃদয় বলতে কোন কিছু নেই? যদি না থাকে তা হলে কুর-আন হেফ্জ করলে কিভাবে?

—মিস ওয়াফা! প্রতিটি আদম সন্তান অপরাধী। আর আল্লার নিকট সর্বাধিক প্রিয় অপরাধী হল তওবাকারী ব্যক্তি।

—শায়খ, আল্লাহ আপনাকে মাফ করুন।

পিটানো ও চীৎকার বন্ধ করার জন্যে অফিসার হাত দিয়ে ইশারা করল, যখন দেখল আবদুল হামীদ অজ্ঞান হয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে গেছে। তারপর এক-জন সৈনিককে নির্দেশ দিল—তাকে টবের কাছে নিয়ে গিয়ে পানিতে ফেলে

দাও। তাহলে তার জ্ঞান ফিরে আসবে, আর আমরাও তদন্ত শেষ করতে পারব।

তারা আবদুল হামীদকে সরিয়ে নেয়ার পর অফিসার তার শরীরের ঘাম মুছতে মুছতে বলল– ভাল কথা, শিগগিরই আমরা তোমাদের ছেড়ে দেব। আমাদের ধারণা এবং তদন্তের ফলাফল দ্বারা আমরা নিশ্চিত হয়েছি যে, ইখওয়ানুল মুসলিমীনের সাথে তোমাদের কোন প্রকার সম্পর্ক নেই। প্রকৃত অপরাধী হল আবদুল হামীদ নাজ্জার। তোমাদের জানা উচিত এই পাপিষ্ঠ ঔপনিবেশিক শক্তি ও ইহুদীবাদের সাথে গভীরভাবে জড়িত। এ ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ নেই যে, দেশের সরকার কে উৎখাত করার জন্য সর্বত্র মারাত্মক জাল বিছিয়ে রাখা হয়েছে। এর পেছনে সি, আই, এ-র হাত রয়েছে। তোমাদের যখন ছেড়ে দেয়া হবে তখন এর বিস্তারিত বিবরণ পত্রিকায় দেখতে পাবে।

ওয়াফার চোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল, এ অবস্থায় সে বলে উঠল— আমাকে কি শিগগিরই ছেড়ে দেয়া হবে?

—অবশ্যই।

—আজ?

—আজ নয়।

—কেন?

আনন্দ ও সৌভাগ্যে গদ গদ কণ্ঠে অফিসার বলল—তোমাদের সামনে আবদুল হামীদ যা বলেছে, তার সবটুকু তাকে স্বীকার করতে হবে। তারপর তদন্ত বন্ধ করা হবে। একথা মনে রেখ, তোমাদের শরীরে মারপিটের কোন চিহ্ন থাকা পর্যন্ত কাউকে ছাড়া হবে না। মারপিটের কোন চিহ্ন থাকলে মানুষ আমাদের সম্পর্কে কী বলবে? শরীরের ক্ষত সেরে গিয়ে চিহ্ন মুছে যেতে হবে।

অত্যন্ত অনুনয়ের সাথে ওয়াফা বলে উঠল—বাড়ী থেকে আমি কখনো বের হব না। আমাকে কেউ-ই দেখতে পাবে না। যা ঘটেছে সে সম্পর্কে আমি একটি অক্ষরও কাউকে বলব না।

মৃদু হেসে অফিসার বলল—অবশ্যই। যারা বলবে তাদের আবার এখানে ফিরে আসতে হবে।

আত্মভোলার ন্যায় ওয়াফা চিৎকার করে বলে উঠল—অসম্ভব......অসম্ভব। আমি দ্বিতীয়বার এখানে ফিরে আসতে চাই না। যদি এমনটি হয় তাহলে আমি মারা যাব।

—নিশ্চিন্ত হও, মিস নিশ্চিন্ত হও। ভবিষ্যতে তোমার সাথে আমাদের সম্পর্ক হবে আরো গভীর। তুমি হবে আমাদের একজন বিশ্বস্ত গুপ্তচর।

—আপনি কী বলতে চাচ্ছেন?

ওয়াফার দিকে পিছন ফিরে সে বলল—সময় মত সব কিছু জানতে পারবে।

অফিসার কয়েক কদম এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এল এবং ওয়াফার দিকে ফিরে বলল—মুক্তির প্রস্তুতি হিসেবে তোমাকে 'আল-কানা-তির আল-খায়রিয়্যাহ' কারাগারে যেতে হবে। মেয়েদের কারাগার। আর তোমার সঙ্গীদের নিয়ে যাব দুর্গে।

তারা প্রত্যেকেই একে অপরকে চুম্বন ও কোলাকোলি করতে লাগল। ওয়াফাও আত্মভোলা হয়ে তাদেরই ন্যায় করল। বেদনাদায়ক চাবুক তাদের পরস্পরের মধ্যে যে প্রীতি ও বন্ধুত্ব সৃষ্টি করেছিল, তারা যখন সেই বন্ধুত্বের সাগরে নিমজ্জিত তখন তাদের কানে ভেসে এল নিকটেই দাঁড়ান একজন সৈনিকের কণ্ঠস্বর—ওরে কুত্তার বাচ্চা, তুই, সে আর ওই মেয়ে, তোদের সকলের মুখ দেয়ালের দিক ফিরা।

মুহূর্তেই তাদেরও সকলের দৃষ্টি নিবদ্ধ হল সেই কঠিন ও বধির দেয়ালের উপর। পুনরায় সৈনিকটি নির্দেশ দিল—সবাই হাত ওপরে উঠা।

তাদের হাত ওপরের দিকে উঠিয়ে বাঁধা হল। ফিস ফিস করে একজন সৈনিক তার সঙ্গীকে বলল—দেখেছ? মনে হচ্ছে, তারা সবাই গুপ্তচর। উত্তরে তার সঙ্গীটি বলল—আমার মনে হচ্ছে, আবদুল হামীদ ছেলেটি নিশ্চই একজন ইহুদী। তার চেহারা সুরত তাই বলছে। আল্লার কসম। আমি একবার মনে করেছিলাম, এদিকে অফিসারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। কা'বার প্রভুর শপথ, এরা সবাই শয়তান। ইয়া জামাল, ইয়া আবদুন নাসের, আমাদের রব আপনাকে তাদের ওপর জয়যুক্ত করবেন।

ওয়াফা মনে মনে বলল—সারাটি জীবন আমি এভাবে কাটাব যেন, আমি কিছুই দেখতে পাই না, কিছুই শুনতে পাই না। চিরকালের জন্যে আমার মুখেও তালা মারব। ট্রামে আমি দু'জন ছাত্রকে 'সিরিয় প্রচার পত্র' সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছিলাম। আর তাই আমি আমার একজন প্রতিবেশী সেনা অফিসারকে জানিয়ে ছিলাম। আমি ধারণা করেছিলাম, এর বিনিময়ে আমাকে পুরস্কৃত করা হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, চাবুক গালাগালি ও ঠাট্টা-বিদ্রুপ ছাড়া আমার ভাগ্যে আর কিছুই জোটেনি। আমি আমার সেই প্রতিবেশী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তারা তাকে ও তার মা বাবা সবাইকে গালি ও লানত দিল। এরপর আমি দেখতে পেলাম, আমার চুলের বেণীতে বেঁধে আমাকে গাছে ঝুলানো হয়েছে এবং চাবুকের আঘাতে আঘাতে আমার শরীর জর্জরিত করা হচ্ছে। অথচ আমি দুনিয়াতে এমনভাবে এসেছি ও বড় হয়েছি যে, আমি যখন ছোট্ট প্রাইমারী বিদ্যালয়ের ছাত্রী, তখন শিক্ষয়েত্রী একদিন আমাকে ছোট্ট একটি থাপ্পড় মেরেছিলেন। তাই আমার আব্বা-আম্মা এর প্রতিবাদ করেছিলেন। এমনকি শিক্ষামন্ত্রীর নিকট পর্যন্ত অভিযোগ করেছিলেন। ইস! যদি আমি কোন কথা না বলতাম। প্রচারপত্র যারা ছড়িয়েছে তাদের সত্যপথের অনুসারী হওয়া কি সম্ভব? আবদুল হামীদের দৃষ্টিতে ফুটে উঠছে তার পবিত্রতা, ভালোবাসা ও সাহসিকতা। তার ঐ মৃদু হাসির মধ্যে এমন একটা অভিনব ভাব লুকিয়ে রয়েছে যা আমার বোধগম্য নয়। আমার মন

বলছে, এ ব্যক্তি কিছু একটা গোপন করে যাচ্ছে। সে যেন দুর্বোধ্যতা ও শক্তি সম্পর্কে জ্ঞাত। এমন কি, সে যখন স্বীকার করল তখনও সে বিচলিত হয়নি। একটা গভীর আস্থা ও ভারসাম্য সহকারে কথা বলেছে। এখানে যারাই স্বীকার করে থাকে, সকলেই গভীরভাবে হতাশ ও দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু তার মধ্যে ত তেমনটি দেখা যায়নি।

—আমি ত এটাই চাচ্ছিলাম যে, সে বেহুশ হয়ে পড়ুক আর আমি তাকে আমার বুকের সাথে জড়িয়ে ধরি। তার ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিই, তাকে পানি পান করাই। মনে হচ্ছিল, সে তৃষ্ণার্ত। তবুও সে ছিল কঠোর ধৈর্যশীল। এমন কি সে যখন মাটিতে পড়ে গেল তখনও আমি চেহারায় কোন রকম ব্যথা ও ভয়ের চিহ্ন দেখিনি। কিন্তু সে এমনটি করল কেন? এই মহাপরাক্রমশালী শক্তির বিরুদ্ধে একটা প্রচারপত্র কি করতে পারে? ষ্টেনগান-ও চাবুকের মোকাবিলায় এক টুকরো কাগজ কিছুই করতে পারে না।

ওয়াফা তার চিন্তাজগত থেকে ফিরে এল তার পেছন থেকে আসা একটি গলার আওয়াজে। কেউ তাকে ডাকলো—মিস ওয়াফা!

— জী।

—এস।

—কোথায়?

—কিছুক্ষণ পরই জানতে পারবে।

উতওয়া বেগের অফিসে ওয়াফা তার প্রতিবেশী অফিসারটিকে দেখতে পেল। তাকে সে বলতে শুনল—উতওয়া! আল্লাহ তোমার ঘর-বাড়ী বরবাদ করুন! ওরে জংলী! এ মেয়েটিকে তুমি কী করেছ?

পিচাশের মত উতওয়া বলল—এতটুকু ত অপরিহার্য।

—তোমার অন্তরে কি দয়ামায়া বলতে কিছু নেই?

—দয়ামায়াটা আপেক্ষিক ব্যাপার। তোমার সামনে তা জীবন্ত। এরপর তারা দু'জনেই হো হো করে হেসে উঠল।

এরপর লোকটি ওয়াফার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল—মনে কোন কষ্ট নিও না। নিরাপত্তা বিভাগ কোন কোন ব্যাপারে একটু বেশী বাড়াবাড়ি করে থাকে। তবে বিশ্বাস কর, ন্যায়বিচারের জন্যে তুমি বিরাট একটি জাতীয় খিদমত আঞ্জাম দিয়েছ। আমি তোমাকে আশ্বাস দিচ্ছি, অদূর ভবিষ্যতে তুমি এর প্রতিদান লাভ করবে।

অশ্রুভারাক্রান্ত চোখে ওয়াফা বলল—আমাকে শুধু আমার নিজের অবস্থায় ছেড়ে দিন।

তার প্রতিবেশী বলল—আল-কানা-তির মহিলা কারাগারে তোমাকে দু'-সপ্তাহ কাটাতে হবে। তারপর মুক্তি পাবে।

—দু'সপ্তাহ? সে তো খুব দীর্ঘ সময়।

উতওয়া ব্যঙ্গভরে মন্তব্য করল—তোমার সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার আছে।

ওয়াফা তার শয়তানী চেহারা ও পৈচাশিক হাসির দিকে তাকাল। তারপর তার দু'গণ্ড বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল। আর সে অনুচ্চ স্বরে প্রভুর কাছে মুনাজাত করল—ইয়া রব আমার ব্যাপারে একমাত্র তুমিই জান।

কক্ষের একটি পিলারের দিকে তাকাল ওয়াফা। দেখতে পেল আবদুল হামীদ তার পাশেই বসে আছে। মাত্রাতিরিক্ত শাস্তি ভোগের কারণে সে উঠতে অক্ষম। ওয়াফার ইচ্ছা হল, তার ওপর ঝাপিয়ে পড়ে তাকে চুম্বন করে এবং তার পবিত্র চরণ যুগলে অশ্রু বিসর্জন দেয়। কিন্তু সে অক্ষম ব্যক্তির মত দাঁড়িয়ে রইল।

ওয়াফা শুনতে পেল, অফিসারটি আবদুল হামীদকে লক্ষ্য করে বলছে—এখনই তুমি তোমার সেলে ফিরে যাবে। সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবে, খাবেদাবে ও ঘুমাবে। এরপর আমরা তোমার তদন্ত শেষ করব।

আবদুল হামীদ বলল—আরো তদন্ত বাকী আছে ?

হো হো করে হাসতে হাসতে অফিসার বলল—অনেক কিছু বাকী আছে।

১৮

আবদুল হামীদ ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় সেলে ফিরে এল। যেন সে দেহের ভারসাম্য হারিয়ে এখনই মাটিতে পড়ে যাবে। সে তার বন্ধুদের সালাম করে একটু হাসার চেষ্টা করল। কিন্তু সেই হাসিটুকু কবিতার একটি পংক্তির মত ছিল। যাতে অত্যন্ত সততার সাথে এমন দীর্ঘ রাতের স্মৃতি ব্যক্ত হয়েছে, যে রাতে তার দু'চোখের দু'টি পাতা মুহূর্তের জন্যেও এক হয়নি। সবাই বুঝতে পারল, তাদের ভাই যে আজাব ও শাস্তি ভোগ করেছে সেজন্য ধৈর্য ও সন্তুষ্টি প্রকাশের চেষ্টা করছে। প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে সে মাহমুদ সাকারের পাশে গেল। তার কাপড় চোপড় ছিল রক্তে রঞ্জিত। মাথা ও শরীরের কালো কালো দাগগুলি তার ওপর নির্দয় জুলুমের কাহিনী বর্ণনা করছিল। মানুষের ব্যথা-বেদনার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্যে কষ্টদায়ক দীর্ঘ নিরবতা বিরাজ করতে লাগল। মা'রুফ এক নজর তাকিয়েই সব কিছু বুঝতে পারল। তারপর দোয়া-দরূদ ও কুরআন তিলাওয়াতে মনোযোগ দিল। মাহমুদ তার দু'চোখ বন্ধ করে তদন্তের সেই ভয়াবহ দিনগুলির কথা স্মরণ করতে লাগল। কবি ইউসুফের চোখ দুটি চক্ষুগহ্বরে ঘুরপাক খেতে লাগল, যেন তা ফেটে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু রেযেক ইবরাহীম সাধারণত নীরবতা সহ্য করতে পারে না। তার ধৈর্য শক্তিও কম। সে বলে উঠল—তোমার কাপড়-চোপড় ত ভিজে।

আবদুল হামীদ জবাব দিল—তারা আমাকে পানির ট্যাঙ্কিতে ডুবিয়ে দিয়েছিল, যাতে আমি জ্ঞান ফিরে পাই।

—এতখানি ?

— তারা সাধারণত যারা জ্ঞান হারা হয়ে পড়ে তাদের সাথে এমনটি করে থাকে।

—আমি জানি। কিন্তু……আমি আর কী বলব ?

—দীর্ঘক্ষণ যাবত তোমার তদন্ত শেষ হয়েছে……।

যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত ঠুকতে ঠুকতে আবদুল হামীদ বলল—এ এক গীতিকাব্য। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সম্পর্কে লিখে রেখেছেন। তাদের তদন্তের কি কোন শেষ আছে ?

—এ দেখছি, এক অভিনব ব্যাপার।

—রেযেক ! তাদের সাথে আমাদের কাহিনীটি হল জীবন ও মরণের কাহিনী। হয় আমরা না হয় তারা। এমনটিই তারা ভেবে থাকে। এ দুনিয়াতে আমাদের উভয় দলের সহ অবস্থান সম্ভব নয়। তারা কারো মুখ থেকে 'না' শব্দটি শুনতে রাজী নয়। এরপর আবদুল হামীদ সিরীয় প্রচার পত্রের কাহিনী বিস্তারিত বলতে শুরু করল। তাকে ডাকা হয়েছে কেবলমাত্র সন্দেহের ভিত্তিতে। কেননা আযহারের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সেগুলি বিলি করা হয়েছে। আর সেও আযহারের একজন ছাত্র। এরপর সে তাদের সামনে তদন্তের ক্রমোন্নতির ধারা ব্যাখ্যা করল। আর এও ব্যাখ্যা করল যে, সে কিভাবে হতভাগ্য নির্দোষ ব্যক্তিদের বাঁচানোর সিদ্ধান্ত নিল নিজের জীবনের বিনিময়ে। বিশেষ করে ওয়াফা নাম্নী মেয়েটির জন্যে, যাকে তারা 'সিন্নেমারের' প্রতিদানের ন্যায় প্রতিদান দিয়েছিল। সবাই মনোযোগ সহকারে তার এ হৃদয়বিদারক বর্ণনা শুনছিল, আবদুল হামীদ তার কথার উপসংহারে বলল—এ ভাবেই আমি একটি নতুন গোপন সংগঠনের নেতা হয়ে বসেছি। আর দেশের বর্তমান শাসন ব্যবস্থাকে পাল্টে দিতে চায় এমন একটি গোষ্ঠিরও নেতা হয়ে পড়েছি। প্রকৃত ব্যাপার হল, এ সম্পর্কে আমি কোনদিন একটু চিন্তাও করিনি।

মা'রুফ তার বিছানায় কাত হয়ে শুয়ে পূর্ণ মনোযোগ সহকারে কাহিনীটি শুনছিল। কাহিনী শেষ হলে সে সোজা হয়ে বসে বলল—আবদুল হামীদ, তোমার এরূপ করাটা আমি মোটেও সমর্থন করতে পারিনে।

বিস্ময়ের দৃষ্টিতে আবদুল হামীদ তার দিকে তাকিয়ে বলল—আমি কতগুলি নির্দোষ প্রাণকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছি। তাদের মুক্তির আদেশও দেয়া হয়েছে।

—এভাবে আমরা তাদের খেলার জন্যে একটি ছাড়পত্র দিয়ে দিচ্ছি। জনগণের কাছে আমাদের দোষী বলে প্রচার করবে। খুব শিগগিরই তারা এ সব কথা পত্রিকায় প্রকাশ করবে এবং তাতে এত বেশী রং চড়ানো হবে যা মানুষকে উত্তেজিত করে তোলার জন্য যথেষ্ট।

• সিন্নেমার' একটি আরবী কিংবদন্তীর নায়ক।

—তাদের যা ইচ্ছে তাই করুক, আমি একজন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সাধারণ কয়েদী হয়ে থাকি, অথবা দোষী প্রমাণিত করে আমাকে কারাদণ্ড দেয়া হোক, উভয়টাই আমার কাছে সমান। তবে এটা সত্যি যে, বিচারের পর বেসামরিক কারাগারে যাওয়া এখানে অবস্থান করা থেকে ভাল। আর আল্লাহ যখন চাইবেন, তখন সামরিক কারাগারে কয়েদী এবং বিচারের পর বেসামরিক কারাগারে কারাদণ্ড ভোগী ব্যক্তির বিপদ দূরীভূত হবে। আসল কথা হল, সরকার এ দু'টি কারাগারের পার্থক্য স্বীকার করে না।

মা'রুফ বলল—তুমি যেমন চিন্তা করেছ ব্যাপারটি তেমন নয়।

—কেমন, মারুফ?

—সত্য ছাড়া আমাদের কিছুই বলা উচিত নয়।

মৃদু হেসে আবদুল হামীদ বলল—সত্য?

—হ্যা, তাছাড়া অন্য কিছুই না।

কিছুক্ষণ পর মা'রুফ বলল—তুমি যা করেছ, তা ত আত্মহত্যার শামিল।

বিষণ্ণভাবে আবদুল হামীদ জবাব দিল—আমি এটাকে কুরবানী বলে মনে করি।

—আমি তোমার সাথে দ্বিমত পোষণ করি।

—মা'রুফ! তারা ত ওয়াফার শ্লীলতাহানির ষড়যন্ত্র করেছিল।

—সে ব্যাপারে তোমার কোন দায়দায়িত্ব নেই।

—চরম নিপীড়নে কারো কারো জীবনাশঙ্কা দেখা দিয়েছিল।

—আমি মনে করলাম, আমার এ কাজে আল্লাহ খুশী হবেন।

—এটা একমাত্র তিনিই জানেন। আমি জানি, তোমার উদ্দেশ্য সৎ। আর উদ্দেশ্যের দ্বারাই কাজের বিচার করা হয়। মানুষের নিয়েতের ওপরই ফলাফল নির্ভর করে। কিন্তু মিথ্যার মোকাবিলায় অবিচল থাকা ওয়াজিব। তোমার অবিচল থাকাই উচিত ছিল।

—যদি তাদের কেউ মারা যেত, অথবা আমি মারা যেতাম?

—জীবন মরণ আল্লার হাতে।

সবাই নিরব হয়ে গেল। সবার চোখে একটা উদাসভাব ও অস্থিরতা বিরাজ করছিল, আর মাথার মধ্যে একটা বিস্ময়, ক্রোধ ও বিদ্রোহের ভাব ঘুরপাক খাচ্ছিল। রেযেক ইবরাহীম স্থির হয়ে এক জায়গায় বসতে পারছিল না। সে সংকীর্ণ সেলের অভ্যন্তরে পায়চারী করে ফিরছিল। একটুক্ষণ পরপর থমকে দাঁড়িয়ে কখনো মা'রুফের দিকে আবার কখনো আবদুল হামীদের দিকে তাকাচ্ছিল।

পুনরায় মা'রুফ বলতে থাকল—মাহমুদ সাকার ত তাই করেছে। সত্যকে আঁকড়ে ধরেছে। তার কাছে অস্ত্র আছে, যদি একথা স্বীকার করতো তাহলে কি হত? আমার বিশ্বাস, তারা হয়ত তার বাড়ীতে গোপনে অস্ত্র লুকিয়ে রেখে তার

অস্ত্র বলেই প্রচার করত। সত্যের দ্বারাই তাদের মুখে চপেটাঘাত করা উচিত, তার পরিণতি যাই হোক না কেন।

হতভম্বের ন্যায় আবদুল হামীদ বলল—এখন আমি কি করব?

মা'রুফ বলল—ব্যাপারটি খুবই স্পষ্ট।

—কি রকম?

তুমি তোমার সকল কথাই প্রত্যাহার করবে। কেননা, এমনটি তুমি করনি। তুমি যা কিছু বলেছ, তা ভয়-ভীতি ও নির্যাতনের মুখে বলতে বাধ্য হয়েছে। ফাইলে সই করতে অস্বীকৃতি জানাবে। তাতে যদি তোমাকে শূলেও চড়ানো হয়, তবুও।

কিছুটা অবজ্ঞার সাথে আবদুল হামীদ বলল—ব্যক্তিগতভাবে আমি মৃত্যুকে ভয় করিনে।

মাঝখানে রেযেক বলে উঠল—দৈহিক ও মানসিক নিপীড়ন ও চাপের মুখে স্বীকৃতির আইনগত কোন মূল্য নেই।

কবি ইউসুফ প্রতিবাদ করে বলল—রেযেক, তোমার আইনের কথা ছাড় ত। আইনের নিকুচি করি।

রেযেক ঢোক গিলে গম্ভীরভাবে বলল—অস্বীকৃতি তাদের কিছুটা চিন্তার মধ্যে ফেলবে। তারা বুঝতে পারবে, সেখানে একদল লোক আছে যারা তাদের বিরোধী এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রচারপত্র বিলি করেছে। এটা তাদের অন্তরে কিছুটা ভয়-ভীতি সৃষ্টি করবে। কেননা, তারা সেই সংগঠনের বিরুদ্ধে হাত দেয়নি—যদি আমার ধারণা সঠিক হয়। আমরা যেভাবেই পারিনা কেন, তাদের অন্তরে দুশ্চিন্তা, অশান্তি ও ভয় ভীতি সৃষ্টি করে কষ্ট দেব।

মাথা নাড়তে নাড়তে আবদুল হামীদ বলল—তা হলে ত তদন্ত কখনো শেষ হবে না। আর শাস্তি ও আজাবের কিস্‌সা দীর্ঘই হতে থাকবে।

অত্যন্ত প্রত্যয়ের সাথে মা'রুফ বলল—জুলুম-অত্যাচার থেকে তারা হাত গুটিয়ে নেবে একথা কে বলেছে? তাদের কালো অতীত ও অত্যাচার বাড়াবাড়ি চিরদিনই তাদের আরো বোকামীর দিকে ঠেলে নিয়ে যাবে। তারা তাদের পরিকল্পনা থেকে পিছটান দেবে না। তাদের পিছটানই হবে তাদের মৃত্যু। ব্যাপারটি সত্য কি মিথ্যা, এই ভিত্তিতে তারা কোন কিছু দেখেনা। বরং তা তাদের জন্যে লাভজনক বা ক্ষতিকর কিনা সেই ভিত্তিতে বিচার করে থাকে।

কপালের ঘাম মুছতে মুছতে আবদুল হামীদ বলল—যা হবার তা হবেই। আল্লাহ নির্ধারণ করে রেখেছেন। তিনি যা চান তাই করেন।

মা'রুফ বলল—এ মুহূর্তেই তোমার করণীয় সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়া উচিত।

—দ্বিধা-সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। তোমার বক্তব্যে আমি পূর্ণ পরিতৃপ্ত।

হঠাৎ দরজায় টোকা পড়ল। সবাই তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল। রেযেক ইব-

রাহীম দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে যে কণ্ঠস্বরটি শুনতে পেল তা তার খুবই পরিচিত। এটা তাদের ভাই ইসমাঈলের কণ্ঠস্বর। যে সব কয়েদীকে বন্দী অবস্থায় সৈনিকদের খিদমতের জন্যে এদিক ওদিক ঘোরাফেরার অনুমতি দেয়া হয়, সেও তাদের মত একজন। ইহুদী 'কুরী'র পরিবর্তে তাকে এ সুযোগ দেয়া হয়েছে। সে অসম্ভব মেধাবী। সুন্দর আচরণ, প্রখর ব্যক্তিত্ব ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের গুণে সে যে কোন লোকের হৃদয় জয় করতে সক্ষম। তাছাড়া অতি অল্প সময়ে মানুষের আস্থাও অর্জন করতে পারে। ইসমাঈল বলল—বন্ধুগণ।

রেযেক সায় দিল—জী।

—তোমরা মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শোন। আজই আমি জানতে পেলাম নিরাপত্তা বিভাগের লোকেরা নতুন একটা ইখওয়ানী দলকে গ্রেফতার করেছে। তাদের সংখ্যা প্রায় ছয়শ'র মত। মনে হচ্ছে আমরা আরো কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন।...ইসতাঈনু বিল্লাহ ওয়াশবিরু ওয়াল আকিবাতু লিল মুত্তাকীন—তোমরা আল্লার কাছে সাহায্য চাও এবং ধৈর্য ধর। পরকাল মুত্তাকীদের জন্যেই।

অতিরিক্ত তথ্য জানার জন্যে রেযেক প্রশ্ন করার চেষ্টা করল। কিন্তু ইসমাঈল দ্রুত অন্য সেলের দিকে চলে গেল এই মারাত্মক খবর তাদের কাছে পৌঁছানোর জন্যে। যাতে তারা সতর্ক হয়ে যেতে পারে এবং এরূপ পরিস্থিতিতে যেমনটি ঘটে থাকে তার জন্যে তারা প্রস্তুত থাকে।

রেযেক বলল—এখন সেখানে এ ধরণের নতুন সংগঠনের দাবী কেউ করতে পারে না। এটা আমাদের ওপর নতুন মুসিবত ডেকে আনবে।

হাসতে হাসতে মা'রুফ বলল—কেউ কেউ ধারণা করেছিল, ইখওয়ানুল মুসলিমীন চিরদিনের জন্যে শেষ হয়ে গেছে। আমার ব্যক্তিগত অভিমত হল, কাফেলা চলতে থাকবে। সংগ্রাম চিরস্থায়ী......জীবন যতদিন আছে বিরোধ থাকবে। তা যত প্রকার জুলুম ও অত্যাচারের ধারণাই আমরা করি না কেন, তা সত্বেও। তবে আমি যেন একটু স্বস্তি ও আনন্দ অনুভব করছি।

কবি ইউসুফ মাথা দোলাতে দোলাতে বলল—কাতাবাল্লাহু লাআগলাবান্না আনা ওয়া রুসুলী—আল্লাহ নির্ধারণ করে রেখেছেন, আমি ও আমার রসুলগণ বিজয়ী হবে। এটা কুরআনের একটা আয়াত। অন্যত্র বলেছেন, মু'মিনদের সাহায্য করা আমার একটি দায়িত্ব। সাহায্যের জন্য একটি মাত্র শর্ত। আর তা হচ্ছে ঈমান, এই শর্তটি কোথায়?

প্রকৃতপক্ষে কারাগারে ইখওয়ানীরা ভীতি ও সাহসিকতা এবং আশা-নিরাশার মিশ্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সংবাদটি গ্রহণ করল। সে অর্থাৎ মা'রুফ, যেমনটি বলেছে, সংগ্রামের চাকা গোলাকৃতির। সংগ্রাম নামক গ্রন্থের সমাপ্তি বাক্যটি কখনো লেখা হয়নি। আর এটাই খোদাদ্রোহীদের নিশ্চিত করে যে, অত্যধিক কঠোরতা কখনো কখনো শত্রু প্রতিরোধের আধিক্য সৃষ্টি করে থাকে।

আবদুল হামীদ যে যন্ত্রণা ভোগ করছিল, তা সত্ত্বেও ইখওয়ানীদের অন্তরে যে দুশ্চিন্তা ও হতাশার মেঘ বিরাজ করছিল, সে তা লাঘব করার ইচ্ছা করল, আর একই সাথে শিগগিরই যে তাকে তদন্তের জন্যে ফিরে যেতে হবে এবং সেখানে যে দুঃখ-বেদনা ভোগ করতে হবে তা ভুলে যাবারও ইচছা করল। তাই সে বলল—যদি আমি মুক্তি পাই তাহলে ওয়াফাকে বিয়ে করব। যদিও সে আমার গালে চপেটাঘাত করেছে।

একটু রুক্ষ স্বরে রেযেক বলে উঠল—তোমাকে যে চপেটাঘাত করল তাকে তুমি বিয়ে করবে?

এটাই ত সেই একমাত্র পথ যা তাকে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বাধ্য করতে পারে।

রেযেক ইবরাহীমকে লক্ষ্য করে কবি ইউসুফ বলল—তুমি কি বিশ্বাস কর এই পরিস্থিতিতে এমন কেউ আছে, যে একজন ইখওয়ানীকে বিয়ে করতে রাজী হবে।

রেযেক জোরের সাথে বলল—মেয়েরা বীরত্বকে পছন্দ করে।

ইউসুফ প্রতিবাদ করে বলল—কিন্তু, রাষ্ট্র এটাকে বলবে খেয়ানত।

—রাষ্ট্রের মিথ্যা কথা ছেড়ে দাও।

—পত্রিকায় যা লেখা হবে মানুষ ত তাই বিশ্বাস করবে।

—ইউসুফ, তুমি কবিতার কল্পনা ছাড়া মেয়েদের চেননা। তাদের একটা বিশেষ ভাষা আছে, তাদের ভালোবাসা বোধগম্য কোন ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠে না। যেমন, আমি একজন কদাকার কলো চেহারার মানুষ, অথচ দুধের মত সাদা একটি মেয়ে আমাকে ভালোবাসে।

সকল সঙ্গীই একসাথে চাপাস্বরে হেসে উঠল, কিন্তু মা'রুফ উচ্চস্বরে হো হো করে হেসে উঠল। ঠিক সে সময় রেযেক বলে উঠল—তোমরা হাসছ কেন? আল্লার কসম! এমনটিই ঘটেছে, সব জায়গায় সে আমার পেছনে লেগে আছে।

ইউসুফ বলল—তাহলে তুমি তাকে বিয়ে করনা কেন?

—সে পর্দা মানে না, তাছাড়া আমার নির্ধারিত পাত্রী ত সুদানে।

ইউসুফ প্রশ্ন করল—কালো?

—হ্যাঁ।

—সুন্দরী?

—অপরূপ সুন্দরী, শিক্ষিতাও বটে। তাছাড়া পর্দাও মেনে চলে।

ইউসুফ রসিকতা করে বলল—আমার ভয় হচ্ছে, তোমার যদি এখানে দীর্ঘদিন থাকতে হয়, তাহলে তুমি যখন বের হবে তখন দেখতে পাবে তার বিয়ে হয়ে গেছে। এমনও হতে পারে, তুমি তার দু'কাঁধে দু'তিনটি ছেলেমেয়ে দেখতে পাবে। তাদের কারো নাম হয়তো জামাল অথবা উতওয়াও রেখে ফেলতে পারে।

রেযেকের সুর পাল্টে গেল। তার চোখের রং বিবর্ণ হয়ে গেল। রাগে, ক্ষোভে মাথা নাড়তে নাড়তে সে বলল—আমাদের মেয়েরা এমনটি করে না।

বিদ্রুপের সুরে ইউসুফ বলল—পৃথিবীর প্রতিটি স্থানেই এমনটি হয়ে থাকে।

কথার মাঝখানে মা'রুফ বলে উঠল—রেযেক তুমি কিছু মনে করোনা। মেয়েরা বিভিন্ন ধরনের। তাদের অনেকেই যেমন নিষ্ঠাবান ও অঙ্গীকার পালন-কারিনী, তেমনি অনেকেই আবার ধোকাবাজ ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারিণী। মোট কথা শরীয়ত তাদের তালাকের অধিকার দিয়েছে স্বামী যদি দীর্ঘদিন নিখোঁজ বা অনুপস্থিত থাকে পদস্খলনের ভয়ে, এটা মানুষের স্বভাব ও প্রকৃতির জন্যে যুক্তি ও বাস্তবসম্মত কাজ।

রেযেক এমনভাবে বসল যেন, সে আকাশ থেকে পড়েছে। তারপর দু'হাতের মাঝখানে মাথাটি রেখে আফসোসের সুরে বলে উঠল—আমি ত প্রায় প্রতি রাতেই ঘুমের মধ্যে তাকে দেখে থাকি।

মারুফ বলল—ইসলামী আন্দোলনের কর্মীরা মূল্যবান অনেক কিছুই কুরবানী করে থাকে। কেননা, তারা ত আল্লার মাগফিরাত ও রিজামন্দীর বিনিময়ে পার্থিব সুখ-সম্পদ বিক্রি করে দিয়েছে।

কিছুটা বিমর্ষভাবে রেযেক বলল—ভাই মা'রুফ, তুমি আমাকে মাফ কর।

ইতিমধ্যে আবদুল হামীদ ঘুমিয়ে পড়েছে। তার নাক ডাকার শব্দে সকল বন্ধুই তার অবস্থা বুঝতে পারল। মা'রুফ বলল—কথা বন্ধ কর। তোমাদের ভাই গতরাতে ঘুমায়নি। মনে হচ্ছে সে বড়ই ক্লান্ত। তাকে বিশ্রামের সুযোগ দেওয়া উচিত। তার সামনে গোয়েন্দা অফিসে রয়েছে দীর্ঘ সংঘাত......আল্লাহ তার হিফাজত করুন।

একটা বেদনাদায়ক নিরবতা স্থানটিকে নতুন করে ছেয়ে ফেলল।

১৯

কয়েকদিন যেতে না যেতেই নাবিলা তার ভারসাম্যতা ও মনোবল ফিরে পেল। তারপর সে পুনরায় স্কুলে যেতে লাগল। সে প্রকাশ্যে ঘোরাফেরার চেষ্টা করতে থাকল। ভাবটি এমন যেন কিছুই ঘটেনি। স্বতস্ফূর্ত উল্লাস ও আনন্দ সহকারে ছাত্রীরা তাকে স্বাগত জানাল। সে অনুভব করল, এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হৃদয় তাকে ভালোবাসে এবং তারা তার পাশে থাকবে। এ ভালোবাসায় তার ফাটল ধরবে না। এটাই তার বিরাট রক্ষক। এতে তার পকেট হয়ত ভরবে না, তবে তার আত্মিক খোরাক জুটবে। এই নতুন প্রজন্মের মধ্যে তার আশা একেবারেই ব্যর্থ হয়ে যায় নি। কিন্তু, স্কুলের তত্ত্বাবধায়িকা, আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন—তিনি নাবিলার সাথে কিছুটা রুক্ষ ব্যবহার করেছেন, যেমনটি তিনি পূর্বে কখনো করতেন না। তিনি ইশারা ইঙ্গিতে অন্য স্কুলে বদলি হয়ে যাওয়ার কথা তাকে বললেন। কেননা, অতীতে এ স্কুলে ছিল শান্তি ও শৃংখলা

বিরাজমান। কোন প্রকার আন্দোলন বা রাজনীতি এখানে ছিল না। প্রথম ইঙ্গিতেই নাবিলা তার ভাব বুঝতে পেরে মনক্ষুন্ন হল। মৃদু হেসে সে জবাব দিল— এ স্কুল থেকে আমাকে বদলি করতে কেউ দুঃসাহস করবে না। দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে আমি একথা বলছি। কিছুটা বিস্ময়ের সাথে তত্ত্বধায়ক তার দিকে তাকিয়ে চুপ হয়ে গেলেন। আর বাকী শিক্ষয়িত্রীদের অধিকাংশই নিকট বা দূর থেকে ভুলেও কখনো এ বিষয়ের প্রতি কোনরূপ ইঙ্গিত করল না। যদিও হৃদয় আনন্দে ভরে দেয় এমন সব আজেবাজে জিনিসের প্রতি সর্বদাই তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকত। তাদের কয়েকজন অবশ্য তাকে ঘিরে ধরে নানা রকম প্রশ্ন করত। নাবিলা তাদেরকে এত সংক্ষিপ্ত জবাব দিত যা তাদের পিপাসা মিটাতে পারত না। তাদের ভয়-ভীতি সত্বেও তারা যখন নাবিলার সাথে একটু গাঢ় সম্পর্ক গড়ে তুলল তখন তাকে যথেষ্ট সম্মান ও মর্যাদা দিতে থাকল।

উতওয়া যত শিগগির সম্ভব বিয়ের কাজটি সেরে ফেলার জন্যে তার ওপর ভীষণ চাপ প্রয়োগ করতে লাগল। উতওয়ার অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও নাবিলা তাকে পেছনে পেছনে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগল। তাকে সংগে নিয়ে গয়নাগাটি ও কাপড় চোপড় কিনতে যেতে লাগল। বিশেষ করে আনন্দ ও ফূর্তিকালীন পরিধেয় বিশেষ ধরনের ফুসতান কেনার প্রতি নাবিলা অতিরিক্ত আগ্রহ প্রকাশ করতে লাগল। সে উতওয়াকে মিষ্টি মধুর স্বপ্নের কথা বলতে থাকল। আর উতওয়া ত তখন মিলনের স্বপ্নে বিভোর। এর ভেতর দিয়েই নাবিলা কুয়েত সফরের কাগজপত্র তৈরী করে ফেলল এবং ডাক্তার সালেমের সাথে সাক্ষাত করল। ডাঃ সালেম ত দেখে অবাক হয়ে গেল যে, সে উতওয়ার কাছ থেকে পাসপোর্টের ডিরেক্টর ও অন্যান্য দায়িত্বশীলদের নামে এ মর্মে একটি সুপারিশপত্রও নিয়ে এসেছে যে, তার এক আত্মীয়কে সাহায্যের জন্য তাকে সফরের অনুমতি দেয়া হোক। এভাবে নাবিলা যে শিক্ষকতা করে একথার প্রতি কোন ইঙ্গিত ছাড়াই সে পাসপোর্ট বের করতে সমর্থ হল। আর সাথে সাথে দেশ ত্যাগেরও অনুমতি পেয়ে গেল। কুয়েত এয়ার লাইন্সে একটি সিটও বুক করে ফেলল। তার পরিবার ও সহকর্মীদের কেউ ঘুনাক্ষরেও তা জানতে পারল না। প্রকৃতপক্ষে ডাক্তার সালেম তাকে এ ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। সে তাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ এবং সেখানে থাকা ও কাজ সংগ্রহ করে দেয়ার ব্যাপারে একটি চিঠিও দিয়েছিল। এমন কি, কিছু বৈদেশিক মুদ্রাও তাকে দিল যা ছিল সে সময় দুষ্প্রাপ্য। দেশ-ত্যাগের একদিন পূর্বে নাবিলা সিদ্ধান্ত নিল সালওয়ার সাথে সাক্ষাৎ করার। তার ভয় নেই। যদি কোন গোয়েন্দা দেখে ফেলে, সে তাকে ইঙ্গিত করবে, সে নিরাপত্তা বিভাগের একজন সাহায্যকারিনী, উতওয়ার নাম বললেই যথেষ্ট হবে। তাহলে, তার সামনে দরজা খুলে যাবে। সন্ধ্যা আটটায় সে সেখানে গিয়ে পৌঁছল। অত্যন্ত সাহসিকতা ও স্থিরতা সত্বেও স্বাভাবিকভাবেই তার হৃদয় কেঁপে উঠল। সে নিজেই যখন এমন অস্থির ও দুশ্চিন্তাগ্রস্থ, তাহলে বেচারী সালওয়ার অবস্থা

না জানি কেমন? দরজায় টোকা দিল। কিছুক্ষণ পরেই একটি বিমর্ষ মুখ দেখা দিল, যে একটু আগেই কাঁদছিল। তার দু'গণ্ড ভেজা। তার বিষাদ ভারাক্রান্ত চেহারায় ভীতির ছাপ স্পষ্ট। নিদ্রিত ক্ষীণকায় শিশুটি তার কাঁধে। নাবিলা জিজ্ঞেস করল—সাবের কেমন আছে?

—যেমনটি দেখছেন। ভিতরে আসুন, আল্লার দোহাই, বেশীক্ষণ এখানে থাকবেন না। নাবিলা উদ্বেগের সাথে বলল—নতুন কিছু ঘটেছে?

সালওয়ার চোখ দু'টি পানিতে ভিজে গেল। বসতে বসতে সে বলল—এ জীবন থেকে কারাগার অনেক ভাল।

—তার মানে?

—সালওয়া চোখ মুছতে মুছতে বলতে লাগল—প্রতিদিনই তারা আমার কাছে আসে। দায়িত্বশীল অফিসারটি আমার কাছে একটি অভিনব জিনিস চাচ্ছে।

নাবিলা বিড় বিড় করে বলল—এসব ইতর কুকুরের দল নোংরামি ও বাজে কাজ থেকে কখনো বিরত হবে না।

সালওয়া বলতে থাকল—তুমি চিন্তা করে দেখ, তারা আমার কাছে দাবি করছে, আমি যেন তালাক চেয়ে কোর্টে আমার স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করি।

—অসম্ভব।

—বার বার এমনটি বলছে। অফিসারটি বলে, আমার নিষ্ঠা ও প্রতিশ্রুতি পালন দেখে সে আশ্চর্য হয়েছে। আমার স্বামী নাকি এরূপ প্রতিশ্রুতির যোগ্য নয়। কেননা, সে দেশের শত্রু। পরিবারের ভবিষ্যত সম্পর্কে সে কোন চিন্তা করে না। সে জোর দিয়েই আমাকে বলছে, আমার স্বামী একজন জার্মান মহিলা-কে বিয়ে করেছে এবং সে পক্ষে একটি সন্তানও জন্মলাভ করেছে। নতুন স্ত্রী ও সন্তানটিকে জড়িয়ে ধরে আমার স্বামীর তোলা একটি ছবিও তারা আমাকে দেখিয়েছে। এমন কি তারা দাবি করছে, সাবেরের আব্বা নাকি এখন মদ পান করে, মেয়েদের সাথে নাচে। আর সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার হল, অফিসারটি আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছে।

নাবিলা শুনে ত হতভম্ব হয়ে গেল। অবলীলাক্রমে তার মুখ থেকে বের হল—তার কথার একটি অক্ষরও আপনি বিশ্বাস করবেন না।

সালওয়া প্রশ্ন করল কিন্তু—ছবিটি?

—বানোয়াট।

—কেমন করে?

—ছবির মাধ্যমে ধোঁকাবাজীর ব্যাপারটি ত খুবই প্রসিদ্ধ। একটি ছবি অন্য একটি ছবির সাথে মিলানোও সহজ। কিছুটা ঘষামাজা ও কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমেই যেমন ইচ্ছা আমরা তেমন ছবি বের করতে পারি।

সালওয়া প্রশ্ন করল—তাদের এমনটি করার কারণ কি?

মানুষের জীবনকে ধ্বংস ও মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়ার জন্যে তাদের যে সব

পদ্ধতি আছে, এটা হল তারই একটি। দৈহিক শাস্তিদান একটি মাধ্যম। মানসিক দিক দিয়ে ক্ষতবিক্ষত করা একটি নিকৃষ্ট কৌশল। মানুষের হৃদয়ে সন্দেহের বীজ বপন করা হলে মানুষের পারস্পারিক সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অন্তর থেকে আস্থা ও বিশ্বাস দূর হয়ে যায়।

বেদনার সুরে সালওয়া বলে উঠল—হায় আল্লাহ! আমি তা হলে কি করব!

নাবিলা দ্বিধাহীনভাবে জোরের সাথে বলে উঠল—অটল হতে হবে।

—অটল? আমার ত পড়ে যাবার উপক্রম হয়েছে।

—তারা আপনার কিছুই করতে পারবে না।

—আমাদের কারাগারে নিয়ে যাবে।

—আপনি কি বলেননি, যে অবস্থায় আপনি আছেন তার থেকে কারাগার ভাল?

—এটাই আমার সত্যিকারের অনুভূতি। যদি সাবের না থাকত……তাকে যদি আমার সাথে থাকার অনুমতি তারা দিত!

গভীর দুঃখে নাবিলা মাথা ঝাঁকাল এবং দাঁতে দাঁত কেটে বলল—কুকুরের দল।

—গালি দিয়ে কী হবে? গালি ত তাদের আরশ ধ্বংস করতে পারবে না।

—তা ঠিক।

আকাশের দিকে মুখ উঠিয়ে সালওয়া বলল—তিনি ছাড়া আমাদের আর কেউ নেই। নাবিলা বলল—আল্লার কসম কতই না ভালো কথা!

কিছুক্ষণ নিরবতা বিরাজ করার পর নাবিলা বলল—একটি দীর্ঘ সময়ের জন্য আমি আপনার থেকে দূরে চলে যাচ্ছি। কিন্তু সর্বক্ষণই আপনার স্মৃতি আমার হৃদয়ে জাগরূক থাকবে। আল্লাহ জানেন, আমি আপনার থেকে দূরে যেতে চাইনে। তবে বিশ্বাস করুন, মুক্তি খুব নিকটেই। যতক্ষণ আমি জীবিত আছি, আপনাকে কখনও ছেড়ে যাব না। এটা আমার অংগীকার।

নাবিলার একটি হাত ধরে চুমু দিতে দিতে সালওয়া বলল—কোথায় যাবে? সেই অন্ধকার জিন্দানখানার প্রথম সাক্ষাত থেকেই আমি যে তোমাকে কত ভালবাসি তা একমাত্র আল্লাই জানেন।

নাবিলা তাকে জড়িয়ে ধরল। তখন তার চোখ থেকে দ্বিতীয়বারের মত অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকল। সে বলল—সময়মত সবই জানতে পাবেন। দৈহিক বিচ্ছেদের কোন মূল্য নেই। আত্মিক মিলই হল গুরুত্বপূর্ণ। টাকা-পয়সার দিক দিয়ে কোনরূপ দুর্ভাবনায় মন খারাপ করবেন না। খুব শিগগিরই আমি সব কিছু ব্যবস্থা করব। নাবিলা খোলা আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল—একদিন না একদিন আপনি আপনার স্বামীর সাথে মিলিত হবেন। মিলনের মধুরতা অতীত বিচ্ছেদের তিক্ততা ভুলিয়ে দেবে। অতীত শুধু স্মৃতি হয়েই থাকবে। মহান প্রতিরোধের কাহিনীই হবে মধুর সংগীত, যা আপনারা গাইতে থাকবেন। নাবিলা ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ল। সে গাইতে থাকল—

'ওহে চক্ষু! আমি কাঁদি সকল বিদ্রোহী ও খোদাদ্রোহীর জন্যে

যারা ব্যাখ্যা করে জুলুম অত্যাচারকে নানা ভাবে,
আমাদের যুগের মানুষ তেমনই আছে
যেমন ছিল জামাল নাসেরের যুগে।'

এই কবিতার রচয়িতা কে তা আমি জানিনা। তিনি একজন অখ্যাত কবি। কিন্তু তার কথাগুলি অন্তরকে স্পর্শ করে যায়। নিশ্চয় সে এমন কোন কবি হবে যে দুঃখ, বেদনা, বঞ্চনা ও জুলুমের তিক্ত স্বাদ লাভ করেছে।

সালওয়া তার অশ্রু মুছতে মুছতে বলতে লাগল—জীবনটি ছিল মধুর, চমৎকার। আমরা ছিলাম সুখী। নামায পড়ে আল্লার শুকরিয়া আদায় করতাম, খেতাম, আনন্দফুর্তি করতাম, স্বপ্ন দেখতাম। একটা দুর্লক্ষণে কালো দিনে প্রদীপটি গেল নিভে, একটা উম্মত্ত হাওয়া নিভিয়ে দিয়ে গেল। আমরা ছিটকে পড়লাম আজাবের অন্ধকার গহবরে।

নাবিলা বলল—শয়তানেরা ভালবাসাকে জ্বালিয়ে দেয়। সবুজ উপত্যকা পুড়িয়ে দেয়।

—কেন?

—কারণ, তারা ত শয়তান।

—এটা অন্যায়।

নাবিলা বলল—তারা প্রদীপ নিভাতে সক্ষম হলেও সূর্যকে কখনো নিভাতে পারবে না। নাবিলা তার ব্যাগটি হাতে নিল। সে ছিল ভাবাবেগে পরিপূর্ণ। তারপর সালওয়াকে জোরে জড়িয়ে ধরে বিজড়িত কণ্ঠে বলল—আবার দেখা হবে। তারপর সাবেরকে চুমু দিয়ে বের হয়ে গেল।

খানাগর্ত, নালা-নর্দমা ও ধূলাবালিতে পরিপূর্ণ দীর্ঘ রাস্তা বেয়ে চলছে নাবিলা। বৈদ্যুতিক বাতিগুলি মিটমিট করে জ্বলছে যেন এখনই নিভে যাবে। এ বাতিগুলির কিছু কানা হয়ে গেছে। বাড়ী ঘরের জানালাগুলি সব বন্ধ। বাইরের আলো যেন ভেতরে প্রবেশের চেষ্টা করছে। সেগুলি মাথার ওপরে বিশাল মরুভূমির ন্যায় ছড়িয়ে আছে আকাশে। ভীষণ কালো একটা দৈত্য যেন তা গিলে ফেলেছে। বহুদূর থেকে নাবিলার কানে ভেসে আসছে মাইকের আওয়াজ। দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সাথে কেউ যেন কিছু পাঠ করছে। জীবনটি মিথ্যা, প্রতারণা ও ব্যথা বেদনায় ভরে গেছে। তা সত্বেও নাবিলা এ দেশটিকে ভালোবাসে। রক্তাক্ত সংঘর্ষ ও নিষ্ঠুর নির্যাতন সত্বেও সে ভালোবাসে। সে ভালোবাসে তার অভিমানী ব্যথা বেদনাকে যা তাকে সম্মান ও ধৈর্যশক্তি দান করেছে। সে ভালোবাসে তার মৌন অবিচলতা যা কোনদিন বিস্ফোরিত হয়নি। সে দেখতে পাচ্ছে বহুদূর থেকে পবিত্র রূপালী প্রভাতের শুভ সংবাদদানকারীকে, আর চিরন্তন, সুউচ্চ মিনারগুলি যেখান থেকে তাকবীর ও লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ধ্বনিত হয়ে থাকে। সবকিছুই ক্ষণস্থায়ী। একমাত্র সেই মহাপ্রভু ছাড়া কিছুই থাকবে না, যিনি কখনো পরাভূত হয়না, মৃত্যুও বরণ করেন না। মানুষের গর্ব ও অহংকার কতই না তুচ্ছ। এই

বিশাল, সীমাহীন বিশ্বে সে ত একটি উম্মাদ কণার সমতুল্য। আর একটি কণা তা যত বাড়াবাড়িই করুক না কেন, সে কি করতে পারে? সে কি পারে আমাদের থেকে শত শত আলোকবর্ষ দূরের লক্ষ-কোটি তারকারাজিকে ধ্বংস করতে? উতওয়া ও তার মত অন্যরা ত মানবতার মুখমণ্ডলে নিক্ষিপ্ত রোগগ্রস্ত শয়তানের থুথু ছাড়া আর কিছুই নয়। সম্পূর্ণ ভাবনাহীনভাবে নাবিলা জোরে চীৎকার করে উঠল—জুলুমের অবসান হবে।

নাবিলা অন্যমনস্কতা কাটিয়ে সম্বিত ফিরে পেল। সে দেখতে পেল তার পাশে একজন অন্ধ মানুষ লাঠিতে ভর দিয়ে চলছে। অন্ধ লোকটি দাঁড়াল এবং তার বসন্ত রোগের দাগ বিশিষ্ট মুখখানা তার দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে বলল—বিক্ষোভ প্রদর্শন?

নাবিলা লোকটির দিকে চোখ তুলে তাকাল। দেখল সে পঁচাদুর্গন্ধময় পানিতে প্রায় পড়তে চলেছে। নাবিলা লোকটির দিকে এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরে পরিস্কার রাস্তায় নিয়ে এল। লোকটি জিজ্ঞেস করল—তুমি কে?

নাবিলার কাটা জবাব—মাজলুমাহ্—অত্যাচারিতা।

মাথা নেড়ে লোকটি বলল—আমার মেয়েটি, আল্লাহ তোমার মান ইজ্জত রক্ষা করুন। তারপর গলাটা একটু পরিস্কার করে নিয়ে বলল—আমি ছাড়া এখানে আরো মজলুম আছে?

নাবিলা বলল—কি বলেন? কারাগারে অসংখ্য মজলুম।

—কারাগার ত আরামের জায়গা। সেখানে মানুষ খায় দায় এবং ঘুমায়ও।

নাবিলা তার কথার মাঝখানে বলে উঠল—কখনো কখনো হত্যাও করা হয়।

—আমাদের জীবনও মরণের সমতুল্য।

নাবিলা জিজ্ঞেস করল—আপনি কিভাবে জীবিকা নির্বাহ করেন?

—কবরের পাশে কুরআন পড়ি। আর কখনো ভিক্ষাও করি।

নাবিলা তার ব্যাগটি খুলে একটি নোট বের করে লোকটির হাতের মধ্যে ঠাসতে ঠাসতে বলল—এটা নিন।

লোকটি হাত দিয়ে ভাল করে মুঠ করে ধরে অবাক বিস্ময়ে বলে উঠল—এটা কি, জুনাই, (মিসরীয় মুদ্রা)?

যখন দেখল, নাবিলা জবাব দিচ্ছেনা, তখন সে জুনাইটি ঠোঁটের কাছে উঠিয়ে চুমু দিল। তারপর বলতে থাকল—এটা একটা কেরামতি। নিশ্চয় তুমি আসমানের কোন ফেরেশতা হবে। লোকেরা আমার সম্পর্কে বলে থাকে আমার নাকি কেরামতি আছে। হ্যাঁ, তুমি ফেরেশতাই। প্রসিডেন্টের কাছে আমি কত দরখাস্তই না করেছি......সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়...—ওয়াকফ মন্ত্রণালয়, সবই নিস্ফল। তারপর লোকটি জোরে চিৎকার করে উঠল—হাইউন কাইয়ুম।

গুণ গুণ করে গাইতে গাইতে লোকটি নিজের রাস্তায় চলে গেল—

'ক্ষমতাবান হলে তুমি কখনো করোনা জুলুম

জুলুমের চরিত্রই হল লজ্জা আর অনুশোচনা,

তোমার চক্ষু নিদ্রা যায়, আর মজলুম থাকে বিনিদ্র

সে দেয় তোমার ওপর অভিসম্পাৎ, আর আল্লার চক্ষুত নিদ্রাহীন।'

নাবিলার দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছে। আর সে দীর্ঘ রাজপথ বেয়ে দ্রুত চলছে। নাযার কুবানী ও আমাদের এ যুগের শ্রেষ্ঠ কবিদের রচনায় এ জাতীয় কবিতা আছে কি? তাদের কবিতা হচ্ছে বিপদগ্রস্ত বন্ধ্যা নারীর চেহারার ওপর নিকৃষ্ট ধরনের যাঁতা পেশার ন্যায়। এ কবিতাটি কার তা কি তোমরা জান? ইনিও অখ্যাত কবি। অন্ততপক্ষে নাবিলার কাছে।

ডাঃ সালেম তার কনসাল্টিং চেম্বার বন্ধ করার পূর্বে একটা টেক্সি নিয়ে তার কাছে পোঁছা দরকার নাবিলার। তার কাছ থেকে শেষ বিদায় নেয়া এবং তার সাহায্য-সহযোগিতার জন্যে শুকরিয়া জানান প্রয়োজন। খুব অল্প সময়ে নাবিলা সেখানে পোঁছে গেল। পরিবেশটা শান্ত ও থমথমে। এক নিঃশ্বাসে সে সিঁড়ি বেয়ে উঠল। অন্তরটা তার দুরুদুরু করে কাঁপছে। এই দিনগুলিতে অন্তরটি কাঁপছে কেন? কলিং বেল বাজাল। দারোয়ান গেট খুলে অভ্যর্থনা জানাল। নাবিলা প্রশ্ন করল—ডাক্তার কি বাড়ী চলে গেছেন?

বিষাদভরা দৃষ্টিতে সে নাবিলার দিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকল। নিজের স্থানে সে পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল। ভয়ে ভয়ে নাবিলা বলল—কথা বল।

—শুকনো গলায় সে বলল—নেই।

—কোথায় তিনি?

—আমি জানিনে।

নাবিলা জোরের সাথে বলল—আমার জানা প্রয়োজন।

—আমার সাথে ভাল ব্যবহার করুন, আমার পরিবারটি ধ্বংস করবেন না।

– তার মানে?

—তারা তাকে পাকড়াও করেছে। তিনি একজন রোগীকে পরীক্ষা করেছিলেন তারা তাকে ও রোগীকে নিয়ে গেছে।

—তারা তাকে গ্রেফতার করেছে?

লোকটি মাথা নেড়ে বলল—এর আগে তার ভাইকেও গ্রেফতার করেছে।

নাবিলার চক্ষুকোটরে অশ্রু জমে গেল। কিছুক্ষণ সে কোন কথা বলতে পারলনা। দারোয়ানের কণ্ঠস্বর তার কানে ভেসে এল। সে অনুনয়ের সুরে বলছে—কেউ দেখে ফেলার আগেই আপনি সরে পড়ুন।

তৃষ্ণার্ত কণ্ঠে নাবিলা বলল—আর তুমি? তুমি কি করবে?

—জানিনা। আমার ও আমার পরিবারের রেযেক আল্লার হাতে।

নাবিলা তার ব্যাগ থেকে পাঁচটি জুনাই (মিসরীয় মুদ্রা) বের করে লোকটির হাতে গুঁজে দিয়ে ডানে বাঁয়ে এঁকে বেঁকে দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। সে রাস্তায় নেমেই পিছনে একজন দীর্ঘদেহী লোককে দেখতে পেল। তার গায়ে মেটে

রংয়ের চাদর—সে নাবিলার একটি হাত চেপে ধরে বলল—পরিচয়পত্র.........।

ধীরস্থির ভাবে নাবিলা পরিচয়পত্র বের করে লোকটির হাতে দিয়ে প্রশ্ন করল—এত সব কেন ?

—ডিস্‌পেনসারীতে তুমি কি করছিলে ?

—প্রত্যেক রোগী যা করে থাকে।

—দারোয়ান তোমাকে কি বলল ?

—বলল, ডাক্তার খুব ব্যস্ত ! সফরে আছে কবে ফিরবে সে তা জানেনা। এই একটি বড় ধরনের উদাসীনতা। সতর্কীকরণ ছাড়াই একজন ডাক্তার রোগীদের এভাবে বিপদের মধ্যে কিভাবে ফেলে সফরে চলে যেতে পারে ?

মৃদু হেসে গোয়েন্দাটি বলল—শহরে ডাক্তার ভরা।

—ধন্যবাদ, তা অবশ্য সত্য।

কম্পিত পায়ে নাবিলা হাঁটছে। ভয়ে মাটি যেন কাঁপছে। এখানকার অজগরেরা বড় বিচিত্র ধরনের। শীতের রাতেও গর্ত চেনে না। সারা বছরই বিষাক্ত নিঃশ্বাস ছাড়তে থাকে। বাড়ীতে রাত জেগে যারা বসে আছে, তাদের সবাইকে ‘শুভ রাত্রি’ জানিয়ে নাবিলা নিজের শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। এর একটু পরেই সে দরজা বন্ধ করে দিল। নাবিলার মা দরজার দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন—ওরে হতভাগিনী নাবিলা, তোর যে কি হয়েছে তা আমি বুঝি না।

ব্যথিত কণ্ঠে আব্বা বলে উঠলেন—কিছুদিন যাবত বড় অদ্ভুদ আচরণ করছে। তারপর তিনি একটু আস্তে করে বললেন—কে জানে, বিয়ের পর ভালো হবে কিনা ? একটু আস্থার স্বরে মা বললেন—আমার তা মনে হয় না। সে আমার মেয়ে, আমিই তাকে ভালো জানি। এ বিয়ে তার ও আমাদের কারো জন্যে কল্যাণকর হবে না। আল্লাহ্ আমাদের ওপর রহম করুন !

রাগের সাথে তার আব্বা চেঁচিয়ে উঠলেন—এর থেকে বেশী তুমি আর কি চাও ? তার আছে লোভনীয় পদ, ‘অর্থ’, স্বাস্থ্যও।

—সে ত একটা ষাঁড়ের মত।

ঘুমানোর আগে নাবিলা তার কাপড় চোপড় ও কাগজপত্রের ব্যাগটি পুনরায় খুলে দেখে নিশ্চিত হল। ভ্যানিটি ব্যাগটিও দেখল। ডাঃ সালেম নাবিলাকে ছোট্ট কুরআন শরীফটি উপহার দিয়েছিল তাও ভুলল না। সে তাতে চুমু দিল। তার মানসপটে ভেসে উঠল সালেমের আত্মপ্রত্যয়ী মৃদু হাস্যময় ঈমানী আলোকে উদ্ভাসিত মুখটি। সে এখন কোথায় থাকতে পারে তা সে চিন্তা করতে থাকল। সেই পিচাশের দল তার সাথে এখন কেমন ব্যবহার করছে ? একটি বিপর্যস্ত ছবি তার সামনে ভেসে উঠেছে.. চাবুক...বাসর শয্যা...রক্ত...আহাজারি ও তদন্তকারীরা। নাবিলা ভাবছে, তার সেই দৃঢ় প্রত্যয়ী হাসিটুকু কি ঘৃণা, বিদ্বেষ ও ধ্বংসের আগুনে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাবে ? বালিশে মাথা রেখে সে ফুঁফিয়ে ফুঁফিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে থাকল—ইয়া ইলাহী ! অনেক বেশীই হয়েছে।

আপনি জুলুম ও জালিমদেরকে পুড়িয়ে দেন না কেন? এটা আপনার জন্য বড় কিছু নয়। আপনি ত পরাক্রমশালী ক্ষমতাবান।

ভোর চারটায় নাবিলা বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে পড়ল। সারা রাতের মধ্যে তার দু'চোখের পাতা কিন্তু এক হয়নি। সে গোছল করে ফজরের নামাজ আদায় করল। তারপর শান্ত ও ধীরস্থির পায়ে হেঁটে গিয়ে দরজা খুলল। বাড়ীর সামনেই টেক্সি অপেক্ষা করছে। ঠাণ্ডায় চারিদিকে যেন বরফ জমেছে। কিন্তু নাবিলা যেন কিছুটা আস্থা ও প্রশান্তি অনুভব করছে। আল্লাহ নিশ্চয় তাকে পাকড়াও করবেন না। সে ভুলে গেছে আব্বা-আম্মা ও বাড়ীর অন্যদের কাছ থেকে বিদায় নিতে। তাতে কি? তারা ত সব সময় তার অন্তরেই আছেন। তাদের জন্য একটি চিঠি সে লিখে রেখে এসেছে। আর কারাগারের পরিচালক উতওয়া আল-মালওয়ানীর নামেও সে একটি চিঠি রেখে এসেছে। সময় বয়ে চলছে, আর সে যেন স্বপ্ন দেখছে এয়ারপোর্টে তার প্রবেশ—পাসপোর্ট অফিসের দরজা দিয়ে তার গমন—সেনা অফিসারের দৃষ্টি যা সব ভ্রমণকারীকে অনুসন্ধান করে—তার পাসপোর্টের প্রতি চোখ বুলানো তল্লাশী—বিমানের অভ্যন্তরে সিটে বসা—সময় যেন খুবই মন্থর গতিতে চলছে। কয়েকটি মুহূর্ত যেন কত শত বছর মনে হচ্ছে। সে বিশ্বাস করতে পারছে না যে, বিমানটি তাকে নিয়ে আকাশে উড়বে। অবশেষে সময় এল, বিমানটি নড়তে শুরু করল। সে জানালা দিয়ে তাকাল, সুউচ্চ অট্টালিকার মাথার ওপর সূর্যের নতুন আলো ছড়িয়ে পড়ছে। সূর্যটি যেন একটি ক্ষুদে খেলনা। বিমানবালা যাত্রীদের শুভযাত্রা কামনা করে মাইকে কি যেন বলল তা সে শুনতে পেলনা। ধূমপান না করা, বেল্ট বাঁধা ইত্যাদি সম্পর্কে গদবাঁধা উপদেশের প্রতিও সে কোন গুরুত্ব দিল না।

মেঘের বুক চিরে বিমান উড়ে চলছে। এক অপূর্ব পুলকে নাবিলা শিউরে উঠল। সে এমন এক আনন্দ ও সৌভাগ্য অনুভব করল যা সে জীবনে আর কোন দিন দেখেনি। বন্দী বিমান তার খাঁচা থেকে মুক্তি পেয়ে এক মধুর শূন্যালোকে ছুটে চলেছে। স্বাধীনতা…মুক্তি…নির্মলতা…। হঠাৎ আলো এসে তার দেহ ও হৃদয়ের আঙিনা ঝলমলিয়ে দিল। তার চোখ দু'টি সেই আসমানী আলো দেখছিল। তার এই মধুর স্বপ্নের স্বচ্ছতা ঘোলা করে দিল গৃহের অভ্যন্তরে বিষণ্ণ সালওয়ার ছবি। তার কাঁধের ওপর সাবের এবং সালেমের ছবি ও তার সাদা চাদরটি। তার সেই শুভ্রতা পবিত্র রক্তের প্রান্তরকে সাদা করে ফেলেছে। আর জানোয়ার উতওয়া, তার চতুর্দিকের কুকুরগুলি ও তার হাতের চাবুকটি…বীভৎস দৃশ্যটি তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, আর সে ভালোবাসার পাখায় ভর করে আকাশের সাদা মেঘের বুক চিরে অসীম শূন্যালোকের দিকে উড়ে চলছে।

২০

নাবিলার চলে যাবার ঘটনাটি প্রকাশ পেয়ে গেলে সমগ্র পরিবারে আলোড়ন স্বষ্টি হল। মা খুব কাঁদলেন। শিশুরা কান্নাকাটি করল আরো বেশী। কাঁপা কাঁপা হাতে চিঠিটি তুলে নিয়ে বার বার পড়তে থাকলেন নাবিলার আব্বা—আমার প্রিয় আব্বা, আম্মা, আমার ভাই এবং বোনেরা......... ।

এটা আল্লার ইচেছ। যা ঘটে গেছে, সে সম্পর্কে আমি কোন দিন চিন্তাও করিনি। আমি খুব স্বুখে শান্তিতে ছিলাম। পড়তাম, লিখতাম, গান শুনতাম, আর মেয়েদের শিক্ষা দিতাম। জীবনের আরেকটি অজ্ঞাত দিকও আছে, বিশেষত আমার জন্যে, তা আমার জানা ছিল না। ঘটনার আকস্মিকতা যখন আমাকে সেই দিকটির প্রতি ঠেলে নিয়ে গেল, সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে হ্যাঁ, একটি নতুন জগত আমি দেখতে পেলাম। একটি ভীতিজনক মহাদেশ, জঙ্গল, হিংস্র হায়না ও আজাবে পরিপূর্ণ এক পৃথিবী। সেখানে আমি মানুষকে এমন আচরণ করতে দেখেছি যা পশুর আচরণ থেকেও জঘন্য। আমি জীবনটাকে ছোট ও বড়দের হাতের খেলনা হিসেবে দেখতে পেয়েছি। সময়ের স্বল্পতা সত্বেও এ বিশ্বে আমার সফরটি ছিল ভীতিপ্রদ সফর। শুরুতেই আমার সাথে মারাত্মক সংঘর্ষ স্বষ্টি হল। আমি আমার ভারসাম্য হারালাম। চেতনা হারিয়ে ফেলার উপক্রম হল।

বিশ শতকেও এমনটি ঘটতে পারে এ ছিল আমার ভাবনার বাইরে। আর এটাও আমি কখনো কল্পনা করিনি যে, এ সব বিশ্বাস, ভালোবাসা এবং ব্যাপক সমর্থন ও সহযোগিতারও মূল্য হতে পারে, যা আমরা সন্তুষ্ট চিত্তে প্রথম থেকেই বিপ্লবীদের দিয়েছিলাম। বিপ্লব ফলে-ফুলে আরো সুশোভিত হত, আরো, উৎকৃষ্ট ফল দান করতে পারত, যদি আমরা তা প্রেম-ভালোবাসা, স্বাধীনতা ও প্রকৃত ভ্রাতৃত্বের দ্বারা পরিচর্যা করতে পারতাম। কিন্তু মানুষের অহংকার ও অহমিকা এবং প্রকৃতিগত অনৈতিকতা আমাদের মান মর্যাদাকে কতকগুলি মুর্খ ও নির্বোধ লোকদের হাতে অর্পন করেছে, যারা বড় নিষ্ঠুর যারা জানে না মানবতার মহান মূল্যবোধ নীতি ও আদর্শ যা শত শত বছর ধরে সংগ্রাম করে যাচ্ছে তার ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে। এভাবে আল্লার ইচ্ছায়, আমি দেখেছি সামরিক কারাগারে, সাধারণ গোয়েন্দা ভবনে, প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির অফিসগুলিতে, যার ভয়াবহতা যুবকদের বৃদ্ধ করে দিতে পারে। আমি দেখেছি, একদল হতভাগ্য সহনশীল লোকদের, যাদের উপর জুলুম-অত্যাচারের এমন ষ্টীমরোলার চালানো হচ্ছে, যা কোন মানুষ কেন, কোন জন্তু-জানোয়ারও বরদাশত করতে পারে না। আমি কিছু দাস দেখেছি, যাদের হাতে রয়েছে চাবুক, আর জুলুম-অত্যাচারের

নানা উপকরণও। যারা মানুষের জীবন-মৃত্যুর মালিক। আল্লাহ রক্ষা করুন। তারা যেন মানুষকে শাসন করার খোদায়ী হক ও অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, বাস্তবে যে এমনটি ঘটেছে প্রথম প্রথম আমি তা বিশ্বাস করতাম না। আমার মনে হত, আমি ঘুমিয়ে আর আমি যা দেখছি তা কোন মারাত্মক ভীতিজনক স্বপ্ন। এটা এক প্রকার জঘন্য খেয়ানত, ধোকাবাজি ও বিকৃতি। এর সব কিছু—অন্ততপক্ষে—কিছু থেকেও মুক্তি কোনভাবেই সম্ভব নয়, তবে কবর অথবা নতুন জীবনের দিকে চলে গেলে সম্ভব হতে পারে। যেখানে আমি একজন মানুষের মত বাঁচতে, চিন্তা ও কাজ করতে পারব। আশা করি আমি মানুষের হাত পায়ের এসব শৃংখল ভেংগে ফেলতে সক্ষম হব।

স্বীকার করি, আমি দুর্বল। আর আমার আওয়াজও ক্ষীণ। যা হয়ত তাদের এই মিথ্যা প্রচার-প্রাপাগাণ্ডা ও অসার দাবী-দাওয়াকে বিদীর্ণ করতে সক্ষম হবে না। তা সত্ত্বেও আমি আত্মবিশ্বাসী। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, একটি সম্মিলিত ক্ষীণ আওয়াজও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের প্রতিটি মানুষের কাছে তাদের বিরাট ধোকাবাজির কাহিনী কখনো কখনো পৌঁছে দিয়ে থাকে। সবটুকু না হোক, অন্ততপক্ষে তার কয়েকটি পংক্তিও ত পৌঁছে যায়। এ পৃথিবীতে সব সময় কল্যাণ ও আশা-আকাংখা থাকবেই। 'ইন্নাহু লা-ইয়াইয়াস মি রাওহিল্লাহ ইল্লাল কাওমুল কাফিরুন'—একমাত্র কাফের সম্প্রদায় ছাড়া আর কেউ আল্লার রহমত থেকে নিরাশ হয় না। আমার অনুপস্থিতি দীর্ঘও হতে পারে সংক্ষিপ্ত ও হতে পারে। আমি সফলও হতে পারি, ব্যর্থ ও হতে পারি। এ সম্পর্কে আমি কোন চিন্তা করি না। আসল কথা হল, আমি কিছু করতে চাই। আমি আমার দুর্বলতা ও ক্ষীণ আওয়াজ সত্ত্বেও আমি অনুভব করি আল্লার সম্মুখে আমার উপর অর্পিত বিরাট দায়িত্ব ও কর্তব্যের জন্যে আমাকে জবাবদিহি করতে হবে। শুধু তাই নয়, আমাকে জবাবদিহি করতে হবে, আগামী দিনের বংশধরদের সামনে এবং আমাদের ঘাম, আমাদের প্রতিরোধ ও ধারাবাহিক কুরবানীর দ্বারা আমরা যে ইতিহাস সৃষ্টি করছি, সেই ইতিহাসের সামনে।

আমার প্রিয়তমা মা, আপনার পবিত্র কপালে চুমু। আপনার ছবি আমার সাথেই আছে, কখনো তা বিচ্ছিন্ন হবে না। আমার ছোট্ট ভাই ও বোনেরা, তোমাদের মিষ্টি মধুর হৈ চৈ আমার কানে সর্বদা বিরাজমান থাকবে। আল্লার দরবারে তোমাদের জন্য দোয়া করি, তিনি যেন তোমাদের আগামী দিনগুলি আমাদের বর্তমান থেকেও উত্তম বানিয়ে দেন। আর তিনি যেন তোমাদের ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব ও শান্তির পথ দেখান। 'বিদায়।'—নবিলা

উতওয়ার প্রায় জ্ঞানহারা হবার উপক্রম হল, যখন সে দুপুরের পর তাদের আকদের সর্বশেষ কথাবার্তা এবং ব্যবস্থাপনা দেখাশুনার উদ্দেশ্যে নাবিলাদের বাড়ীতে এল এবং তারা জানাল যে, নাবিলা কুয়েতে চলে গেছে। উতওয়া প্রথমত ব্যাপারটিকে একটা হালকা তামাসা মনে করে হো হো করে হাসতে থাকল। কিন্তু

যখন তারা খামে ভরা নাবিলার রেখে যাওয়া চিঠিটি উতওয়াকে দিয়ে দিল, তখন সে একটু রাগের সাথে সেটা ফেড়ে পড়তে শুরু করল।

'উতওয়া, তুমি যে বিজয়ের উল্লাসে মাতোয়ারা, আসলে কিন্তু তা একটি বিরাট ধোঁকা ছাড়া আর কিছুই না। তোমার সৈন্য, কুকুর ও নেতৃবৃন্দ সব সময় তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না। তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র—তোমার হতাশা ও পরাজয় থেকে তোমার বুকে যে তারকা চিহ্নগুলি শোভা পাচ্ছে, তা কলঙ্কের দাগ ছাড়া কিছুই নয়। যার বিনিময়ে তুমি তা লাভ করেছ তা খুবই জঘন্য ও নোংরা। ঐগুলি তোমার অপমান ও কলঙ্কের প্রতীক, বিজয়ও অহংকারের নয়। আমার মত একজন দুর্বল নারী সামান্য কিছু চিন্তা-ভাবনা, প্রচেষ্টা ও আল্লার ওপর ঈমানের দ্বারা তোমার অহমিকা ও গর্ব মাটিতে মিশিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে এবং বঞ্চনা, অপমান ও প্রজ্জলিত ক্রোধের দুঃসহ জ্বালাও তোমাকে বুঝাতে পেরেছে। মানুষ কে তা তুমি জানোনা। কেননা, জীবনে তুমি একটিবারের জন্যেও মানুষ হতে চেষ্টা করনি। তোমার পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব ও সহকর্মী, যাদের সাথে তুমি উঠা-বসা করে থাক, তাদের চেয়ে তোমার কুকুরগুলির প্রতি তোমার আস্থা অনেক বেশী।

উতওয়া! তুমি একটা নির্বোধ জানোয়ার........ক্ষ্যাপা কুকুর। তুমি তোমার জীবনে একদিনের জন্যেও এমন কোন নারী পাবে না যে তোমাকে বিন্দুমাত্র সম্মান করতে পারে। নীচতা তোমাকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে, তুমি সেইসব গোয়েন্দা শয়তানদের উৎসাহিত করেছিলে, আর তারা সেই নিকৃষ্ট নাটকীয় দৃশ্যের সৃষ্টি করেছিল। এরপর তুমি এলে আমাকে সেই নরক থেকে উদ্ধার করতে, যার পরিকল্পনা করেছিলে তুমি নিজেই। এটা কোন পর্যায়ের অধঃপতন, আর কোন ধরণের পাশবিকতা। তাহলে কাহিনী এমনটিই? তোমাদের নীতি আদর্শ এই? জাতির দুর্ভাগ্য যে, তোমরা এমন নোংরা পদ্ধতি, আর বিকৃত দর্শন দ্বারা তাদের শাসন করছ। আজ থেকে তোমার অপবিত্র হাত আমার নাগাল আর পাবে না। ইয়া আল্লাহ! আমি কতই না বেদনা অনুভব করেছি যখন তোমার সাথে আমি মিলিত হতাম। তোমার মত মানুষের পরিবার ও পুত্র-কন্যা থাকা সম্ভব নয়। কেননা, স্নেহ-মমতা ও ভালোবাসার অর্থ তুমি জাননা। কেননা, তুমি একজন ব্যতিক্রমধর্মী নির্দয় ব্যক্তি। হ্যাঁ, ব্যতিক্রমধর্মী, তুমি নিজেই তা জান। আর সব জায়গায় লোকেরা এ সম্পর্কে বলাবলিও করে থাকে। এমন কি, কিছু কিছু আরবী ও আন্তর্জাতিক পত্রিকা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করেছে। তুমি যখন আমার এ চিঠি পড়বে তখন আমি থাকব নিষ্পাপ শহীদদের রক্তে রঞ্জিত তোমার হিংস্র থাবা থেকে দূরে। যে থাবার দ্বারা তুমি ইচছাকৃতভাবেই তাদের মৃত্যুর আঙিনায় পেঁীছিয়ে দিয়েছে। যেন তুমি দাবার একটি চালই চালছ। আর এ চালে তোমার পরাজয় বরণেরই আভাস রয়েছে। এমনটিই আমি জেনেছি আমার সেই আত্মীয়ার কাছ থেকে, যে তোমাকে আমার কাছে নিয়ে এসেছিল। হ্যাঁ, আমি দূরেই

থাকব, তবে আজ থেকে আমি আমার কলম হাতে তুলে নিলাম। এর প্রাণঘাতী তীরটির লক্ষবস্তু হবে তুমি ও তোমার নেতৃবৃন্দ।

আমার ব্যাপারে আমি এত তাড়াতাড়ি করছি না… ..আমাদের মাঝে দীর্ঘ সময় বর্তমান, পথও অনেক লম্বা। আর আমিও কেবল যৌবনে পদার্পন করেছি। আল্লার প্রতি আমার এ গভীর বিশ্বাসও রয়েছে যে, তিনি তোমার পরিণতি দেখে যাওয়া পর্যন্ত আমকে বাঁচিয়ে রাখবেন। অর্থাৎ সব ছোট ছোট তাগুতের পরিণতি। তুমি হয়ত আমার এ কথায় কৌতুক বোধ করছ। কেননা সব ক্ষমতাইত তোমাদের হাতে। বিজয়ও তোমাদের জন্যে নির্ধারিত। তবে মনে রেখ, যদি এ ক্ষমতা অন্যদের হাতে থাকত, তাহলে তোমাদের কাছে কখনো যেত না। মনে রেখ উতওয়া! তোমাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন তার থেকে তুমি ক্ষমতাবান নও। তুমি যখন শিশুটি ছিলে, তখন নিজের শরীরে নিজে পেশাব করতে, মাটিতে অতি নিকৃষ্টভাবে হামাগুড়ি দিয়ে চলতে, স্কুলে শিক্ষকেরা তোমার মেধাহীনতা ও পরীক্ষায় নকলের জন্যে তোমার পাছায় বেত লাগাতেন। পরীক্ষার হলে নকল করতে গিয়ে হাতে নাতে ধরা পড়ে এক বছরের জন্যে কি এক্সফেল্ড হওনি? আমি মাঝে মাঝে চিন্তা করেছি, তোমার হেদায়াতের জন্যে দোয়া করি। কিন্তু আমার বিশ্বাস, (আল্লাহ আমাকে মাফ করুন) তোমার মত লোকেরা কোন দিনই হেদায়াত পেতে পারে না। কারন তুমি তা চাওনা এবং সেদিকে যাওয়ার চিন্তাও করনা। বরং তোমার ত বিশ্বাস, তোমার বর্তমান জীবনধারাই সঠিক এবং এটাই প্রকৃত হেদায়াত। তোমার ওপর লানত। বন্দীর আনন্দ তোমার জানা নেই। বন্দীদশা থেকে সে পালিয়ে শুন্য আকাশে মেঘের কাছে পেঁাছে যায়। এটা এমন একটি মহাসৌভাগ্য যা প্রমাণ করে যে, পৃথিবীতে স্বাধীনতাই মানুষের সর্বাধিক প্রিয়। এ লেখাটুকু ছাড়া এ সম্পর্কে আর কোন অভিজ্ঞতা আমার নেই। তবে আমি তার স্বপ্ন দেখি। আমার এ দৃঢ় প্রত্যয়ও আছে যে, তুমি ইনশাআল্লাহ কোনদিন আর আমার নাগাল পাবে না। তুমি তোমার ক্রোধের আগুনে ও পরাজয়ের গ্লানিতে জ্বলে-পুড়ে ছাড়খার হতে থাক, আর এ অভিজ্ঞতাও অর্জন করতে থাক যে, একটি নারী যে আল্লাহকে জানে, স্বাধীনতা মর্যাদা দেয় এবং মানুষ যাতে প্রেম-প্রীতি ও শান্তিতে বসবাস করতে পারে সে জন্যে নিরন্তর সংগ্রামরত, সে তোমাদের মুখে থুথু নিক্ষেপ করছে। আর সে সংগ্রাম করছে, যেন মানুষের ধন-সম্পদ, মান-ইজ্জত ও জীবন নিরাপদে থাকে। আমি তোমার ওপর সব ধরণের লানতই বর্ষণ করছি। তোমার ধোকাবাজির আগুনে সেক খাওয়া মজলুম ও বঞ্চিতদের হৃদয়ে যে ভাবের উদয় হয়, এটা তারই অভিব্যক্তি। তোমার ওপর কোন সালাম নয়।'—নাবিলা।

উতওয়ার পায়ের তলার মাটি যেন কেঁপে উঠল। টলতে টলতে কোন রকমে নিকটবর্তী আসনে গিয়ে বসল। তার কুঞ্চিত কপাল থেকে টপ টপ করে ঘাম ঝরতে লাগল। হিষ্টিরিয়া রোগীর মত এদিক ওদিক তাকাতে লাগল। পা

দিয়ে মাটিতে আঘাত করে স্বগোতোক্তির মত বলে উঠল—কিভাবে বদলা নিতে হয় উতওয়া তা জানে।

বিনয়ের স্বরে নাবিলার আব্বা বললেন—উতওয়া বেগ, একটু ধৈর্য ধর। প্রতিটি সমস্যারই সমাধান আছে। উতওয়া তার দিকে এমনভাবে তাকাল যেন রাগে দুঃখে তার চোখ দিয়ে আগুনের ফুলকি ঝরছে। সে প্রশ্ন করল—সে যা লিখেছে, আপনি কি তা পড়েছেন?

—আমার পড়া ত উচিত নয়।

উতওয়া হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে বলল—তার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আপনারা সম্পূর্ণ অবগত। নাবিলার বৃদ্ধ পিতা তার দিকে এগিয়ে গেল। তার সাদা গোঁফ কেঁপে কেঁপে উঠছিল আর তিনি বলছিলেন—আল্লার কসম, বেটা! তোমার মত আমরা ও ব্যাপারটি সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। হঠাৎ আমরা জেনেছি।

উতওয়া তার হাত মুষ্টিবদ্ধ করে দেয়ালের গায়ে অনবরত আঘাত করতে করতে প্রশ্ন করতে থাকল—বাড়ী থেকে সে কিভাবে বের হল? আপনারা কি ঘুমিয়ে ছিলেন? কিভাবে পাসপোর্ট বের করল? কি ভাবে? জেনে রাখুন আমি কোন মিথ্যুক নই। এর জন্যে কঠিন মূল্যই আপনাদের দিতে হবে। আপনাদের জন্যে যে চিঠি সে রেখে গেছে, আমাকে দেখান।

চিঠিটি যখন উতওয়ার দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছলেন, তখন বৃদ্ধের হাত কাঁপছিল। তাঁর হাত থেকে সেটা ছিনিয়ে নিয়ে উতওয়া খুব দ্রুত তা পড়তে থাকল। পড়া শেষে বলল—তার বিচারের জন্যে এতটুকু প্রমাণই যথেষ্ট।

—তার বিচার? বিচলিত কণ্ঠে পিতা প্রশ্ন করলেন। জোরের সাথে উতওয়া উত্তর দিল—হ্যাঁ, তা সে বিচার তার অনুপস্থিতিতেই হোক না কেন।

—বেটা, এটা সেরেফ তার একটা খামখেয়ালী। কোন দোষ নিও না। শিগগিরই সে তার ভুল বুঝতে পারবে এবং তার তল্পিতল্পা ঘাড়ে উঠিয়ে বাড়ী ফিরে আসবে। আমি তাকে লিখব। বরং আমার পক্ষে সম্ভব হলে সে যেখানে গেছে সেখানে যাব এবং তাকে সংগে নিয়েই ফিরব। উতওয়া! ব্যাপারটি আমাদের মধ্যেই গোপন থাকা ভাল। বুদ্ধিমত্তার সাথে আমরা এর সমাধান করার চেষ্টা করব।

উতওয়া তার ঘাড়টি নাবিলার পিতার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল—আমার মাথায় কোন বুদ্ধিই আসছে না। তার বিচারের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে আমার কুয়েত সরকারকে অনুরোধ করব, তাকে মিসর সরকারের কাছে সমর্পণ করার জন্যে। তারপর সে তার হাতের কাগজখানা উঠিয়ে চিৎকার করে বলল—এটাই হল তার প্রমাণ। এরপর উতওয়া হাঁপাতে হাঁপাতে বলতে থাকল, আর ঘাম মুছতে লাগল—যদি কুটনৈতিক পদ্ধতি অকৃতকার্য হয়, তাহলে আমরা সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা চালাবে। এ ধরণের কাজ আমরা বহু বহু করে থাকি। এটাও যদি সম্ভব না হয়, তা হলে আমরা তাকে হত্যা করব অথবা বিষ প্রয়োগ করব। বিশ্বের সর্বত্রই আমাদের পুরুষ ও নারী গোয়েন্দা রয়েছে। আপনাদের সেটা বোঝা উচিত।

একটা প্রচণ্ড নিরবতা নেমে এল। নাবিলার মায়ের বিমর্ষ গণ্ডদ্বয় চোখের পানিতে ভিজে গিয়েছিল। তিনি লাঠিতে ভর দিয়ে হেঁটে এসে বললেন—উতওয়া! আমার ছেলে, তুমি যা বলছ তাতে সমস্যার সমাধান হবে না। আমাদের কোন কৌশল অবলম্বন করা উচিত।

উতওয়া জবাব দিল—কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে কেবল দুর্বলরা। আর আমরা……আমরা ত যা ইচ্ছে তাই করতে পারি। আমরা বিভিন্ন দেশের শাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটাতে পারি, আমাদের কথা মত যারা চলে না সে সব শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়ে দিতে পারি। আমেরিকার হোয়াইট হাউস ও রাশিয়ার ক্রেমলিনের স্তম্ভও আমরা কাঁপিয়ে দিতে পারি। নাবিলার মত সামান্য একটা মেটে পোকা জব্দ করতে আমরা অক্ষম হব? আমি, আমি আমার মর্যাদার শপথ করে বলছি, তার খুন আমি পান করবই।

মহিলাটি একটু এগিয়ে গিয়ে উতওয়ার কাঁধে একটি হাত রাখার চেষ্টা করল। কিন্তু অত্যন্ত কঠোরভাবে উতওয়া তার হাতটি সরিয়ে দিয়ে বলল—আপনাদেরও বিচার করা হবে।

অত্যন্ত বিমর্ষভাবে বৃদ্ধা প্রশ্ন করলেন—বেটা আমাদের অপরাধটা কি?

—অপরাধ গোপন করা।

—কোন অপরাধ?

—আপনি এখনও বুঝতে পারেননি?

—সে বিদেশে গেছে, এ অধিকার দেশের প্রতিটি নাগরিকেরই আছে।

শয়তানের মত উতওয়া হো হো করে হেসে উঠল এবং নাবিলার পিতার দিকে তাকিয়ে বলল—এটা যে একটা বাজে ব্যাপার, তা কি আপনি তদন্তের সময় বলতে পারবেন?

তারপর উতওয়া তার হাতের চিঠি দু'টি নাড়াচাড়া করে বলতে থাকল—আর এটা কি রাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থার প্রকাশ্য সমালোচনা নয়? মহান বিপ্লবের ইতিহাসে যাদের রয়েছে এক বিরাট গুরুত্বপূর্ণ অবদান, সেইসব ব্যক্তিদের সম্পর্কে জঘন্য গালাগালি নয়?

উতওয়া বৃদ্ধ লোকটির দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে বলল—বরং যারা তার পাস-পোর্ট ও ভিসা বের করার ব্যাপারে সাহায্য সহযোগিতা করেছে তাদের বিচার হবে। দেশটা মগের মুল্লুক নয়। অত্যন্ত কঠোর হাতে আমরা তাদেরকে দমন করব।

উতওয়া বের হবার উদ্দেশ্যে দরজার দিকে এগিয়ে গেল এবং দরজা বন্ধ করার আগে রাগের সাথে বলল—কুয়েত থেকে নাবিলা যখন জানতে পারবে তার আব্বা—আম্মা এবং পরিবারের সকল সদস্যকে সামরিক কারাগারে লাল মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে, তখন হৃদয় বলে যদি তার কিছু থেকে থাকে, তাহলে সে নিজেই এসে উপস্থিত হবে। অথবা যদি তার বুদ্ধি জ্ঞান লোপ পেয়ে থাকে,

বা না আসার সিদ্ধান্ত নিয়ে সব কিছু বিসর্জনের চিন্তা করে থাকে, তাহলে ত অন্য কথা। এছাড়া তার আর কোন পথ নেই।

উতওয়া দরজা বন্ধ করে চলে যেতেই নাবিলার আব্বা পড়ে গেলেন এবং বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বলতে থাকলেন—আল্লা যা চান তাই করতে পারেন। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করলে তার কপালে কেবল লাঞ্ছনাই জোটে। একটা দুঃখ ও বেদনার ছাপ তার চেহারায় ফুটে উঠল, জোরে জোরে তিনি শ্বাস নিতে লাগলেন। ঠাণ্ডা ঘামে তার কপাল ভিজে গেল। দুর্বল কণ্ঠে তিনি বললেন নাবিলার মা.........এক মগ পানি।

স্ত্রী যে লাঠিতে ভর দিয়ে চলেন, সেটি হাতে উঠিয়ে নিয়ে স্বামীর দিকে একটু ঝুঁকে প্রশ্ন করলেন—প্রিয় স্বামী, কি হল তোমার?

—এখানে ব্যথা অনুভব করছি। দম বন্ধ হয়ে আসছে। জাকিয়া, তাড়াতাড়ি পানি নিয়ে এস।

নাবিলার মা হাউ মাউ করে চিৎকার করে উঠলেন। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পরিবারের লোকজন দৌড়ে এল। তারা খুব তাড়াতাড়ি টেলিফোনে ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করতে লাগল। একটা পেরেশানী, ভীতি ও শঙ্কার মধ্যে দিয়ে প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত হতে থাকল। থেকে থেকে নাবিলার মা কেঁদে উঠতে লাগলেন আর বলতে থাকলেন—প্রাণাধিক, তারা তোমাকে খুন করেছে। আল্লাহ তাদের থেকে বদলা নিন। তিনি অত্যন্ত পরাক্রমশালী প্রতিশোধ গ্রহণকারী। তিনি ছাড়া সাহায্য চাওয়ার মত আমাদের আর কেউ নেই। ইয়া রব ইয়া রব আমার নিজের প্রতি এবং আমাদের ছেলেমেয়েদের প্রতি রহম করুন, তাদের হিফাজাত করুন, আপনিই শেফাদানকারী। আপনি ছাড়া অন্য কারো কাছে আমরা সাহায্য কামনা করবো না।

ডাক্তার এসে নাবিলার আব্বাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বলল—আপনারা ঘাবড়াবেন না। এটা সামান্য একটু হৃদরোগ, মানসিক উদ্বেগের কারণে হয়েছে। পূর্ণ বিশ্রামের দরকার এবং নিয়ম মাফিক চিকিৎসাও করতে হবে। কিছুটা অক্সিজেন দিলে ভাল হয়। এ জন্যে আমার মতে তিন অথবা চার সপ্তাহ তাকে হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা করা উচিৎ। আমি আবারও বলছি, আপনারা চিন্তিত হবেন না।

কাঁদতে কাঁদতে নাবিলার মা বললেন—প্রাণাধিক, তুমি না হয়ে আমি হলে ভাল হত। আল্লাহ তাদের থেকে বদলা নিন। পিতা মৃদু হেসে বললেন—নাবিলার মা, কেঁদোনা। জীবন মরণ ত আল্লার হাতে—তারপর তিনি একটু রসিকতা করে বললেন—ওগো নারী, হতভাগাদের জীবন একটু দীর্ঘই হয়ে থাকে।

উতওয়া সেখান থেকে সরাসরি সাধারণ গোয়েন্দা ভবনে চলে গেল। সেখানে সে তার এক বন্ধুর সাথে বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করল। এরপর সে নাবিলার নিজ হাতে লেখা সেই দু'টি চিঠি তাকে দেখাল। বন্ধুটি সবকিছু শুনে বলল—ভাল কথা, এখন তাহলে আমরা কি করতে পারি উতওয়া?

—সালেহ বেগ, তোমার কি করণীয় তা তুমিই ভাল জান।

চিঠিতে নজর বুলাতে বুলাতে সালেহ বেগ বলতে থাকল—এ লেখা যে নাবিলার তা নিশ্চিত। তবে কথা হলো, ইখওয়ানুল মুসলিমীনের কর্মীদের ফিরিয়ে দেয়ার দাবী, কুয়েত ও সৌদি সরকার যে প্রত্যাখ্যান করবে।

—অসম্ভব।

—উতওয়া, এটাই সত্য।

—কোন অজুহাতে?

—মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শোন। উতওয়া! বিষয়টি নিয়ে আমরা বহু ঘাটাঘাটি করেছি। তারা মনে করে তাদের দেশে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীদের প্রত্যার্পণ করা উচিত নয়। এটাই তাদের নিয়ম বা আরবীয় প্রথা। মেহমানদের সাথে তারা প্রতারণা করে না। তাকে ভালো না লাগলে, অন্য কোন দেশে চলে যেতে বলে। তবে আমাদের হাতে ফিরিয়ে দেয়া অসম্ভব। তাছাড়া একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, আমাদের এ যুগে আমরা শরণার্থীদের বিনিময় করে থাকি।

উতওয়া বোকার মত বলল—নাবিলার বিনিময়ে আমরা কাউকে সমর্পণ করব।

—উতওয়া, এতো উঁচু পর্যায়ের রাজনৈতিক ব্যাপার স্যাপার, সেখানে আমরা কোন হস্তক্ষেপ করতে পারিনে। এটা তুমি ভাল করেই জান।

উতওয়া তার চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল—চাপ সৃষ্টির জন্যে তার পরিবারের লোকদেরকে কি গ্রেফতার করা যায় না? এমনটি ত আমরা অনেক সময়ই করে থাকি।

অত্যন্ত কঠিন দৃষ্টিতে সালেহ তার দিকে তাকিয়ে বলল—উতওয়া!

—হুঁ!

—এটা আমরা করতে পারি না।

—এর থেকেও মারাত্মক এবং বড় কাজও ত তুমি করে থাক।

—জানি, তবে বিশেষ করে এ ব্যাপারটি সম্ভব নয়।

—কেন?

—কেননা, পূর্বের নাটকটি প্রেসিডেণ্ট নিজেই জানেন।

—তার মানে?

—অর্থাৎ নাবিলার গ্রেফতারের কাহিনী বুঝাতে চাচ্ছি।

টেবিলে জোরে আঘাত করে উতওয়া বলল—অসম্ভব, ব্যাপারটি তাঁকে কে বলল?

—জানিনে, কিন্তু ব্যাপারটির রসিকতায় তিনি হেসেছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি ভীষণ তিরস্কার করেছিলেন।

—এটা খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। কিভাবে তিনি জানলেন? আমি পাগল হয়ে যাব মনে হয়।

অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে সালেহ বলল—তিনি সব কিছু জানেন। উতওয়া দেশে হাজারো গোয়েন্দার জাল বিছানো। তুমি কি সে সম্পর্কে অজ্ঞ? তাছাড়া তুমি ত একটা বাচাল।

উতওয়া তার অনামিকা দিয়ে বুকের দিকে ইশারা করে বলল—আমি ?

সালেহ কাঁধ দুলিয়ে একটু উপেক্ষার স্বরে বলল—আল্লাই ভালো জানেন।

অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে উতওয়া সিগারেট বের করল। সালেহ তাতে আগুন ধরিয়ে দেবার জন্য উঠে দাঁড়াল। খুব নরম স্বরে উতওয়া বলতে লাগল—প্রেসিডেণ্টের অজ্ঞাতসারেই আমরা চেষ্টা করে দেখি না কেন ?

উতওয়া, ব্যাপারটি ভালো করে বুঝতে চেষ্টা কর।

—সালেহ, আমরা ত সবাই একে অপরের বন্ধু।

—কিন্তু, তাই বলে আমরা আমাদের বাড়ীঘর ধ্বংস করতে পারি না।

—গোপনে ?

—গোয়েন্দার জাল সর্বত্রই বিছানো রয়েছে।

—সালেহ, আমরা ত সবসময় একে অপরের উপকার করে থাকি।

—প্রত্যেকটি জিনিসেরই একটা সীমা আছে। আমাকে মাফ কর, ভাই।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে উতওয়া বলল—তুমি কি চাও, একটি মেয়ের কাছে আমি এমনভাবে হার মানি—যার ওজন পঞ্চাশ কিলোগ্রামের বেশী হবে না।

—তোমার শিক্ষা হওয়া উচিত।

—আমি কী শিখব ?

—ধৈর্য, সহনশীলতা ও বুদ্ধিমত্তা। কেবল শক্তি দিয়েই সবকিছু লাভ করা যায় না।

—পরীক্ষা করেছি, কোন কাজ হয়নি।

—এর কারণ হল, তুমি কালের শত্রু। কালকে তুমি অতিক্রম করে যেতে চাও।

আবারো উতওয়া হাত দিয়ে টেবিলে আঘাত করে বলতে থাকল—আমি এর একটি সুষ্ঠু সমাধান চাই।

—সবর কর।

—সবরের দ্বারা কোন সমাধান হয় না। আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়।

—ব্যাপারটি আমার উপর ছেড়ে দাও।

—কতদিনের জন্যে ?

—আবার বলছি, সবর প্রয়োজন।

—তাহলে তার পরিবারের লোকেরা আমাকে বিদ্রূপ করবে। আমার হুম্বিতম্বিকে তারা অর্থহীন প্রলাপ বলে মনে করবে। আর আমি অক্ষমতা ও পরাজয়ের অনলে সর্বক্ষণ জ্বলতে থাকব। আমি সেই উতওয়া যাকে মানুষ চেনে। আর নাবিলা এভাবে বিদেশ থেকে আমাদের নাজেহাল করবে, আমাদের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ ছাপবে, আমাদের আক্রমণ করে কবিতা লিখবে এবং বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেবে ? তারপর সালেহের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকল—তুমি তোমার রবের নামে বলত, এসব কি প্রেসিডেণ্ট অথবা দেশের জন্য কল্যাণকর হবে ? তোমাদের বুদ্ধি-বিবেক কি বলে ? এ অবস্থায় আমাদের উদাসীনতা হবে এক প্রকার খিয়ানত।

সালেহ বেগ দৃঢ়কণ্ঠে বলল—একমাত্র প্রেসিডেন্টই পারেন ব্যাপারটির গুরুত্ব নির্ধারণ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে। বের হবার প্রস্তুতি নিতে নিতে উতওয়া বলল—আমি নিজেই ব্যাপারটি প্রেসিডেন্সীর গোচরে আনব।

—এটা তোমার জন্যে মোটেই কল্যাণকর হবে না।

উতওয়া তার চেয়ারে আবার ফিরে এসে বসল। ভয়ে তার অন্তরটি তখন কাঁপছে এবং তার বাদামী চেহারায় বিমর্ষতার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সে প্রশ্ন করল—কিভাবে ?

সালেহ যখন উত্তর দিল না, তখন উতওয়া নিজেই বলতে থাকল—প্রেসিডেন্সীর সাথে আমার দীর্ঘ কর্ম জীবনে এমন কোন কাজ আমি করিনি, যাতে আমার নিষ্ঠা সম্পর্কে তাদের মনে কোন সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে, তুমি তা ভাল করেই জান। কোন নির্দেশের আমি বিরুদ্ধাচরণ করেছি, এমনটি কখনো ঘটেনি। আর তাঁরা তা জানেন।

সালেহ বলল—ব্যাপারটি আমার ওপর ছেড়ে দাও। অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আমি ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করব। তুমি যাতে খুশী হও তা আমরা করব।

উতওয়া লাফিয়ে উঠে সালেহের গলা জড়িয়ে ধরে তার মাথায় চুমু দিতে দিতে বলতে থাকল—তুমি আজীবনই বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। আমি তা জানি, সালেহ। তোমার পিতার জীবনের শপথ, তুমি আমায় উপকারটুকু করবে।

সালেহ মৃদু হাসল কিন্তু কোন কথা বলল না। উতওয়া কিছুক্ষণ বিমর্ষ অবস্থায় চুপ করে বসে থাকল। তারপর বলল—আমি কি এ থেকে বুঝে নেব যে, আমার ওপর প্রেসিডেন্সী সম্পূর্ণ অসন্তুষ্ট ?

একটু দুষ্টু হাসি হেসে সালেহ বলল—আরে বেশী চিন্তা করো না।

—প্রেসিডেন্সী আমাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আসলে প্রেসিডেন্সীই ত আমার জীবনের সবটুকু।

—ভয় পেয়োনা।

—কিন্তু তোমার কথা মারাত্মক কোন কিছুর প্রতি ইঙ্গিত করছে।

—তুমি বড় সন্দেহপরায়ণ। সহজ-সরল কথার বাঁকা অর্থ করতে ভালবাস। আমি এর দ্বারা তেমন কিছু বুঝাতে চাইনি।

কিছুক্ষণ নিরবতা বিরাজ করতে থাকল। সালেহ সেই নিরবতা ভেঙে বলতে লাগল—আমি খুব ব্যস্ত, আর তুমিও। ইখওয়ানুল মুসলেমীনের নতুন একটি সংগঠনকে কি গ্রেফতার করা হয়নি ?

মাথা নেড়ে উতওয়া বলল—হ্যাঁ, আমি এখনই যাচ্ছি। নাবিলার প্রতি আমার ক্রোধের প্রতিশোধ নেব তাদের থেকে, কোন প্রকার বাছবিচার ছাড়া সকল ইখওয়ানীদের থেকেই। চরম মূল্যই আমি তাদের থেকে আদায় করব।

২১

শেষের দিনগুলোতে সামরিক কারাগারে রক্তাক্ত প্রতিশোধের ব্যাপারটা একটা নিয়মে পরিণত হয়ে যায়। খুব সকালেই নাশতার পরপর কয়েদীদের মাঠে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর শুরু হয় সেই প্রাণঘাতী সারিবদ্ধ প্যারেড। উপরন্তু আগুনের ফুলকি ঝরানো চাবুক, তাদের মুখ থেকে বন্যার স্রোতের মত প্রবাহমান অকথ্য গালিগালাজ, সেই হতভাগ্যদের কারো কারো তাজা গোশত খাওয়ার লোভে অথবা তাদের শরীরে থাবা বসিয়ে ছিঁড়ে-কেটে দেয়ার জন্যে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুকুরদলের পিছু ধাওয়া আর সেই সাথে কুকুরের হাঁক-ডাক অথবা সৈনিকদের সরব হৈ চৈ। যা দেখে মনে হয় বর্বরতা ও কঠোরতায় তারা যেন কুকুরের পালের সাথে প্রতিযোগিতায় নেমেছে।

ময়দানের মাঝখানে উতওয়া বেগ আল-মালওয়ানী দাঁড়িয়ে। বাদামী রঙের চুলে তার মাথা ভর্তি। কোটের পকেটে দু'হাত। তার চার পাশ দিয়েই ঘুরছে শাস্তিমূলক প্যারেডের সারিগুলো। সে যেন একটা কেন্দ্রবিন্দু। স্বভাবতই এ ধরণের প্রাত্যহিক প্যারেড সকল বন্দীর জন্যই। তা সে দোষী হোক বা নির্দোষী। অন্যায়ভাবে তাকে বন্দী করা হোক বা কোন কালে কোন দিন ইখওয়ানের সাথে তার কোন প্রকার সম্পর্ক থাকার কারণেই হোক!

তাদের শাস্তির মাত্রা বৃদ্ধি ও তার সীমা বাড়ানোর যে কারণটি সবার কাছে প্রসিদ্ধ তা হচ্ছে, তাদের কথিত সেই নতুন সংগঠনটি। বাস্তবে সেটা কিন্তু কোন রাজনৈতিক বা ধর্মীয় সংগঠন নয় বরং তা হচ্ছে কতিপয় সৎলোকের একটি গোষ্ঠী। যে সব লোক বন্দী করা হয়েছিল অথচ তাদের পরিবারবর্গ ছিল বাইরে, গোপনে ঐ সংগঠন তাদের জন্যে কিছু সাহায্য সংগ্রহ করছিল এবং সেই সব হতভাগা পরিবারবর্গের হাতে তুলে দিচ্ছিল। যাতে তারা তাদের ছেলেমেয়েদের খাওয়া দাওয়া লেখা-পড়া, ঘর ভাড়া, বৈদ্যুতিক বিল ইত্যাদি এমন সব প্রয়োজন মিটাতে পারে, যা না হলে চলেনা। হঠাৎ গোয়েন্দারা স্কুলের বেশ কিছু ছাত্রকে গ্রেফতার করে বসল, যারা প্রতিমাসে পাঁচ থেকে দশ গুরুশ (পয়সা) করে সাহায্য দিত। তাছাড়া তারা যে ষড়যন্ত্র করছিল বা নিয়মতান্ত্রিক সংগঠনের রূপ দিচ্ছিল এমন কোন প্রমাণ কিন্তু নেই। এ কারণে গোয়েন্দারা এ সংগঠনের নাম দিয়েছে 'আর্থিক সাহায্যদানকারী সংস্থা'। তাদের ক্রোধের কোন সীমা নেই। অভিযুক্তদের একজন যখন তাদের সামনে ব্যাখ্যা করতে শুরু করল, এই মহৎ কাজ কেবলমাত্র মানবতার খাতিরে, কোন প্রকার ষড়যন্ত্র, বিপ্লব প্রচেষ্টা বা অন্য কোন অসাধু উদ্দেশ্যে নয়, তখন গোয়েন্দারা তাকে বিদ্রূপবাণে জর্জরিত করল এবং বুঝলে—এ ব্যাপারে

রাষ্ট্রের মতামত ভিন্নরূপ। এই অর্থ সংগ্রহের মধ্যে একটা পারস্পরিক সহানুভূতির ভাব রয়েছে, যা পরস্পরকে এক গভীর বন্ধনে আবদ্ধ করে থাকে। আর এ সহানুভূতি পুরাতন ভালোবাসা ও সম্পর্কেরও পরিচয় বহন করে, যা খুবই মারাত্মক। এবং এই অর্থ সংগ্রহের মাধ্যমে সেটা ধীরে ধীরে একটা গোপন সংগঠনের রূপ নিতে পারে। তখন অস্ত্র কিনবে, গোপন ষড়যন্ত্র করবে আর রক্তের বন্যা বইয়ে দেবে।

অভিযুক্তদের একজন বলল, শুধু মিসরেই নয় বরং বিশ্বের কোথাও এমন কোন আইন নেই যাতে সাহায্য সংগ্রহকারীদের বড় ধরণের কোন অপরাধী গণ্য করা হয়। বিশেষত ইখওয়ানীদের জন্যে এ সাহায্য একথা জানা সত্বেও অমুসলিমরাও যেখানে সাহায্য দানে অংশ গ্রহণ করেছেন। অথচ শুধু এ কারণেই এ নতুন সংগঠনটির সাথে এমন বর্বর আচরণ করা হচ্ছে যা 'মুনশিয়ার' ঘটনায় ইখওয়ানীয় অভিযুক্তদের বিচারের প্রাথমিক পর্যায়ে এবং অভিযুক্তদের ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানোর পর যে বর্বরতা দেখানো হয়েছিল, তা থেকে কোন অংশে কম নয়। তবে প্রথম বিচারটি ছিল প্রায় প্রকাশ্য।

পত্র-পত্রিকা ও বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম সত্যকে বিকৃত করা ও বাড়িয়ে বলার উদ্দেশ্যে বিশ্বস্ত সূত্রের মাধ্যমে সেগুলো প্রচার বা প্রকাশ করত। আর এই নতুন বিচারটি হলো সম্পূর্ণ গোপনে। কোন উকিল বা জনতা ছাড়াই কেবল সৈনিকদের দ্বারাই এ কাজটি সমাধা করা হয়েছে। প্রখ্যাত বিচারপতি ক্যাপ্টেন সালাহ হাতাতাহ বসতেন, আর তার দু'পাশে থাকত দু'জন সদস্য। মঞ্চের পাশেই বসত কেরানীরা, সামনে থাকত কতিপয় অভিযুক্ত ব্যক্তি, আর তাদের পিছনেই থাকত প্রহরী। যারা তাদেরকে বিভিন্ন সেনানিবাস থেকে এনে হাজির করেছে, কিন্তু তারা কিছুই জানেনা তাদের সামনে কী ঘটতে চলেছে। কারো সাথে কথা বলার অথবা কোন প্রতিবাদ করার কোন অনুমতি অভিযুক্তদের নেই।

সামরিক কারাগারে এ রকম শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশে বহু বেদনাদায়ক ঘটনাও ঘটত। বিচার শেষ হবার পর কয়েদীরা মনে করেছিল, জুলুম ও নির্যাতনের সেই দীর্ঘ দিনগুলির বুঝি অবসান হল। এ কারণে নতুন করে শাস্তি ও নির্যাতন শুরু হওয়ায়, যার নির্মমতা অতীতের থেকে কোন অংশে কম ছিল না, তাদের অনেকের নানা রকম দৈহিক অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়াল। তাদের কেউ কেউ এত জুলুম সহ্য করতে না পেরে নতুন করে রোগগ্রস্থ হয়ে পড়ল। কয়েদী 'নুরুদ্দীন' ত অন্ধ হয়ে গেল। কারাগারের ডাক্তার বলল, এটা 'স্বাভাবিক অন্ধত্ব।' কয়েদী 'সা'দ যাহরানের' অর্ধাঙ্গ অবশ হয়ে গেছে। সে এখন চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে অক্ষম। চাবুকের আঘাতও এখন আর তাকে নাড়াতে পারে না। এর সম্পর্কেও কারাগারের ডাক্তারের মত হল, এটা স্বাভাবিক 'প্যারালাইসিস'। এ ভাবে দিন দিন বেড়েই চলল দৈহিক দিক দিয়ে অক্ষমতা, বিকলাঙ্গতা ও পাগলামী। ফলে বিরাট সংখ্যক কয়েদী খুব দ্রুত মৃত্যু কামনা করতে লাগল এ রকম মারাত্মক মানসিক ও দৈহিক উৎপীড়ন থেকে মুক্তির জন্যে। এ শ্রেণীর রোগীদের হাস-

পাতালে অথবা অন্য কোন বিশেষ স্থানে রাখারও ব্যবস্থা করা হয়নি। বরং তাদেরকে রাখা হয়েছে অন্য কয়েদীদের সাথে নিজ নিজ সেলে। যাতে তাদের বর্তমান ব্যথা বেদনার সাথে নতুন একটি দিন সংযোজিত হয়। অধিকাংশ কয়েদী-দের অত্যাশ্চর্য দৃঢ়তা সত্বেও তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক মনে করল, ব্যাপারটি ক্রমেই জটিল হয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং দিনের পর দিন অবনতির দিকেই যাচ্ছে। তারা নিজেরা বলাবলি করতে লাগল—আমরা সরকারের সাথে একটি বোঝাপড়ায় আসিনা কেন?

এই সমঝোতার প্রতি প্রায় সকলেরই ঘৃণা ও অস্বীকৃতি প্রকাশ পেল এবং প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যাত হল। যদিও তাদের মহান আদর্শ ও উদ্দেশ্য ছিল, অন্যদের মুক্তি, বেদনাদায়ক শাস্তির পৈশাচিক মহোৎসবের পরিসমাপ্তি, রুগ্ন ও অসুস্থদের মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচানো এবং চিরদিনের জন্যে পরিবারগুলির ধ্বংস ও ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবার হাত থেকে রক্ষা করা। অতি ছোট্ট আকারের হলেও, তাদের সেই সমঝোতা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তবে তারা তাদের মুক্তির ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়েছে অথবা তাদের মনোবল একটু কমে গেছে বা তাদের নীতি-মূল্যবোধের প্রতি তাদের আস্থা একটু ঢিলে হয়ে গেছে, তা কিন্তু নয়। বলা চলে, এটা সর-কারের সাথে এক ধরণের চুক্তিপত্র, যাতে অত্যাচার-উৎপীড়নের মাত্রা একটু কমে যায়, কয়েদীরা তাদের বিপর্যস্ত চিন্তা চেতনাকে একীভূত করতে এবং নতুন করে একটু দম নিতে পারে। রাত-দিন জেলের রুদ্ধদ্বার কক্ষে এ বিষয় আলোচনা পর্যালোচনা চলতে থাকল।

কিন্তু মা'রুফ দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে সকলকে লক্ষ্য করে বলল—ভায়েরা আমার! তোমরা একটা বিভ্রান্তির মধ্যে আছ। সরকার যে কোন ধরণের সমঝোতা প্রত্যা-খ্যান করবে। কেননা, সে হচ্ছে প্রভুত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী। এটাও স্পষ্ট যে, সরকারী দায়িত্বশীলদের কার্যকলাপের তাৎপর্য মাত্র একটিই হতে পারে। যেমন দৈহিক পরিসমাপ্তি, মানসিক ধ্বংস, আমাদের দলে অনৈক্যের বীজ বপন অথবা আমাদের চিন্তা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে অস্থিরতা সৃষ্টি করা, যাতে আমাদের আকীদা-বিশ্বাস ও আল্লার পথে আমাদের অতীতের ভূমিকার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়। এটাই হচ্ছে সরকারের উদ্দেশ্য। আমরা যত কিছুই করিনা কেন, এর থেকে আমাদের রেহাই নেই। ধৈর্য ও সহনশীলতা, আল্লার দিকে প্রত্যাবর্তন এবং আমাদের আদর্শকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরা ছাড়া আমাদের সামনে দ্বিতীয় কোন পথ নেই আল্লাহ ও তার রাসূল (স) প্রদর্শিত সত্যের পথে আমাদের স্থির থাকা উচিত। গায়রুল্লার শরণাপন্ন হওয়া শিরক। সুতরাং তোমরা আল্লার সাহায্য চাও ও ধৈর্য ধর। পরকাল ত মুত্তাকীদের জন্যে। আমাদের আকাংখিত জয়-পরাজয় ও কঠোরতার নিরিখে আজকের এ সংগ্রামের ফলাফল বিচার করোনা। আদর্শের এ সংগ্রাম একদিন, একমাস, একযুগ বা কয়েক যুগের নয়। এ সংগ্রাম চিরন্তন। এর ফলাফল এখনো প্রকাশ পায়নি। এ শাসন ব্যবস্থা ক্ষণস্থায়ী, কয়েক মুহূর্তেই ভেঙ্গে

পড়তে পারে। মহাপরাক্রমশালী শাসকের শেষ শ্বাসটিও বেরিয়ে যায় বসে হাসতে হাসতে, দাবা খেলতে খেলতে অথবা কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবে স্বাক্ষর করতে করতে। জীবন ত আল্লার হাতে। আমরা কে? দুনিয়ায় আমরা একটা গতিশীল একটা সীমিত সময়ের জন্যে। কখনো এ সময়টুকু দীর্ঘ হয়, আবার কখনো হয় খুব সংক্ষিপ্ত। কিন্তু সর্বাবস্থায় তা সীমিতই।

তাহলে এই ভয়-ভীতি ও ব্যথা-বেদনা কিসের জন্যে? এক সেকেণ্ডের একটি ভূমিকম্পে হাজারো মানুষের প্রাণহানি ঘটে, আর ধ্বংস হয় হাজার হাজার ঘরবাড়ী। জীবন-মরণের ব্যাপারটি আল্লার জন্যে ছেড়ে দেওয়া আমাদের উচিৎ। তেমনিভাবে রুযি রেযেকের ব্যাপারটিও। আমাদের প্রিয় আল্লার রাসূল সত্যি কথাটিই বলে গেছেন—লা রাহাতা ফিদ্দুনিয়া, ওয়ালা হীলাতা ফির রিয্‌ক, ওয়ালা শাফায়াতা ফিল মাওত'-দুনিয়ায় বিশ্রামের কোন অবকাশ নেই, রেযেকের ক্ষেত্রে কোন হীলা বা বাহানা নেই, আর মৃত্যুর ক্ষেত্রে কোন সুপারিশও নেই।

কারাগারের বাইরে আমরা ত আল্লার দ্বীনেই তাবলীগ করেছিলাম। এখনো ত আমরা এ বন্দী অবস্থায় একই দায়িত্ব আরো মারাত্মকভাবে পালন করে চলেছি।

কেউই মা'রুফের বক্তব্যের প্রতিবাদ করার চিন্তা করল না। রেযেক ইব্রাহীম অত্যন্ত আগ্রহভরে মনোযোগের সাথে তার প্রতিটি কথা শুনছিল। কবি ইউসুফ দৃশ্যত বিদ্রোহী ভাব প্রকাশ করলেও মা'রুফের বক্তব্য তার কল্পনায় যেন ব্যক্তি, ঘটনা ও সুর হয়ে ফুটে উঠছিল। তার মনে হচ্ছিল, এটা যেন কোন আরবী কাসিদার চিরন্তন সুর যা যুগ যুগ ধরে মানুষের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। আবদুল হামীদ নাজ্জার তার ক্ষত, কাটা-ছেড়া এবং ব্যথা-যন্ত্রনা সত্বেও তার প্রতিটি অক্ষর ও বাক্য মনে মনে আওড়িয়ে যাচ্ছিল। আর মাহমুদ সাকার, তার ক্ষত শুকিয়ে গিয়েছিল অথবা প্রায় শুকানোর মত হয়েছিল, চুপ করে পিছনের দিকে বসেছিল। তার বিমর্ষ মুখে ছিল এক অভিনব মৃদু হাসি, আর তার চোখে ছিল এক ঔজ্জ্বল্য যা যাদু মন্ত্রের মত মানুষের হৃদয় আকর্ষণ করছিল।

দীর্ঘ নিরবতা বিরাজ করতে থাকল। প্রত্যেকেই যেন তার চিন্তা জগতে সাঁতার কাটছে। মাহমুদ স্মরণ করছে 'আমালের' কথা। যেন সে পিপাসার্ত আর 'আমাল' মতির পেয়ালা হাতে নিয়ে তার পিপাসা নিবৃত্ত করছে। আবদুল হামীদের মনে পড়ছে হতভাগী 'ওয়াফার' কথা। সিরীও প্রচার-পত্রের তদন্তের সময় তার সেই শান্তি ও স্বস্তির কথা। আবদুল হামীদের হৃদয়ে সেই স্মৃতি ভেসে উঠেছে—'আহ......নতুন করে আবার যখন আমি পৃথিবীতে ফিরে যাব, তখন আমি তার কাছে যাব...হায় আল্লাহ...আমি ত তার ঠিকানা জানিনা। এতে কিছু যাবে আসবে না...আমার মনে হয় আমি তাকে খুঁজে বের করতে পারব...আমার হৃদয় তার সন্ধান দেবে। কিন্তু একজন গরীব ছাত্রকে বিয়ে করা কি তার পক্ষে সম্ভব হবে? তাছাড়া ফিলিস্তিনী উদ্বাস্তু, জেল থেকে মুক্তি পেলেই মিসর থেকে বিতাড়িত করা হতে পারে। সে কারাগার থেকে বের হবে কবে? লৌহ-কপাট পুরোপুরি

বন্ধ। দরজার পেছনেই রয়েছে প্রাচীর……প্রাচীর……কাঁটাতার সুউচ্চ পর্যবেক্ষণ টাওয়ার, যেখানে সর্বক্ষণ নিদ্রাহীন অবস্থায় ষ্টেনগান হাতে দাঁড়িয়ে আছে প্রহরীরা তাদের পারস্পারিক প্রথাগত হুংকার সর্বদা-ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ফেরে। তাদের একজন বলে ওঠে তামাম……দ্বিতীয়জন তামাম……তৃতীয়জন তামাম……এমনি-ভাবে চলতে থাকে। তারা কখনও ঘুমায়না….. কিন্তু তার প্রেয়সী ত সেখান থেকে অনেক দূরে। তবুও সে অনুভব করছে, সে যেন তার নিকটেই আছে, তারই সাথে অবস্থান করছে, তার অন্তরেই আছে…… ।

আমাদের উপর আল্লার হাজারো রহমত যে, তারা চিন্তা ও স্বপ্নের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। যদি তা পারতো তাহলে তারা আমাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে হাজারো কেস দাঁড় করাতো। স্বপ্ন ও বাস্তবের মধ্যে পার্থক্য কি? এর উভয়টিই ত একপ্রকার সহাবস্থান। যেমন, তার উপস্থিতিতেও আমার অন্তরটি ধুক ধুক করে, তেমনি ভাবে কেবলমাত্র তার কথা স্মরণ করেও এখন আমার অন্তরটি ধুক ধুক করছে। তাহলে, বাস্তব ও চিন্তা জগতের মাঝে আসল পার্থক্যটা কোথায়? চিন্তাও এক ধরনের বাস্তব। এখনই আমি তাকে দেখতে, স্পর্শ করতে, পরস্পর আমরা কথা বলতে, মত পার্থক্য করতে ও ঐক্যমত পোষণ করতে সক্ষম। যেমনটি বাস্তব জীবনে প্রতিনিয়ত ঘটে থাকে। আমি পাগল নই, কিন্তু আসলেই আমি বাস্তব ও চিন্তা জগতের মধ্যে বড় ধরণের কোন পার্থক্য দেখতে পাই না। কল্পনায় যখনই আমি তাকে ডেকেছি, সে চলে এসেছে। শুধু তাই নয়, কল্পনায় আমরা যা কিছুই ডাকিনা কেন, সাথে সাথেই তা এসে হাজির হয়। তার জন্যে রকেট কিংবা সুলেমানী আংটির প্রয়োজন পড়ে না। হে আমার অত্যাশ্চর্য ও অস্বাভাবিক হৃদয়! তোমার সৃষ্টি কি দিয়ে? তুমিও স্রষ্টার একটি অন্যতম মুজিযা…… ।

বাইরে থেকে শব্দ ভেসে এলো—কয়েদী আবদুল হামীদ নাজ্জার……কয়েদী আবদুল হামীদ নাজ্জার……এই কুত্তার বাচ্চা!

তারপর দরজায় ধাক্কা পড়ল। মুহূর্তেই আবদুল হামীদ সেলের দরজার পিছনে এসে জোরে জোরে দরজায় ধাক্কা দিতে দিতে বলল—জনাব আবদুল হামীদ নাজ্জার এখানে……৪৭ নং সেলে, জনাব আফেন্দী!

কক্ষের বাইরে সৈনিকদের চলাফেরার খট্‌খট্ আওয়াজ হচ্ছিল। আবদুল হামীদ আল্লার ইচ্ছা ও সন্তুষ্টির কাছে আত্মসমর্পন করল। অন্য বন্ধুরা ভীতি ও শঙ্কামিশ্রিত দৃষ্টিতে তার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকাচ্ছিল, আর তাদের অন্তকরণ তার জন্যে আল্লার দরবারে দোয়া করছিল। মা'রুফ চুপে চুপে তার গণ্ডদেশে গড়িয়ে পড়া অশ্রু মুছে নিল। একটা বাহাদুরী ও নির্ভীকতার ভাব প্রকাশ করে সে বিড় বিড় করে বলল—আল্লাহু মায়াকা ইয়া আবদাল হামীদ—আবদুল হামীদ, আল্লাহ তোমার সহায়। রেযেক ইব্রাহীম তার লাঠিটি মাটিতে গেঁড়ে বলল—তোমার কৌশল বড় কঠিন।

কবি ইউসুফ মৃদু স্বরে বলল—কুল লাই য়ুসীবানা ইল্লা মা কাতাবাল্লাহু লানা—আপনি বলুন, আল্লাহ যা আমাদের জন্যে নির্ধারণ করে রেখেছেন, তার অতিরিক্ত কোন বিপদই আমাদের স্পর্শ করবে না।

মাহমুদ সাকার সম্পূর্ণ চুপচাপ বসে। একটা অভিনব মৃদু হাসি তার বিমর্ষ চেহারাটিকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। তার চোখের তীক্ষ্ণতা অন্ধকারেও যেন ঠিকরে পড়ছে। আবদুল হামীদ বসে বসে আয়াতুল কুরসী পড়ছে। 'মান জাল্লাজী ইয়াশফায়ু ইনদাহু ইল্লা বিইজনিহি'—তার অনুমতি ব্যতীত কে তার কাছে সুপারিশ করতে পারে?—পর্যন্ত পেঁছিতেই দরজা খুলে গেল। আবদুল হামীদ বেরিয়ে গেলে আবার দরজা বন্ধ করে দেয়া হল। কিছুক্ষণ পর মা'রুফের কণ্ঠস্বর সবার কানে এল—এস, আমরা দোয়া-দুরুদ পড়ি।

আবদুল হামীদ এসে দেখতে পেল মাঠ মানুষে ভরা। অভিযুক্ত ও সন্দেহ ভাজন ব্যক্তিদের একটির পর একটি সারি। নির্দেশ ও নানা রকম হট্টগোলে একাকার। শাস্তি ও আজাবের নানা রকম অভিনব পদ্ধতির প্রয়োগ চলছে। এটা হচ্ছে বিশেষজ্ঞদের যুগ। শাস্তিদানও স্বতন্ত্র একটি বিষয়ে পরিণত হলে অবাক হবার কিছু নেই। আর থাকবে এক্সপার্ট, দার্শনিকবৃন্দ এবং অধ্যয়ন-যোগ্য কিছু মূলনীতি। তাতে ব্যবহৃত হবে আধুনিক টেক্‌নোলজি ও মনো-বিজ্ঞান। সেই শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশে আবদুল হামীদ নিজের ধ্বংস ও অবলুপ্তি অনুভব করল। একজন সৈনিক পেছন থেকে তাকে নির্দেশ দিচ্ছে—লেফ্‌ট রাইট, কুইক মার্চ ইত্যাদি। কিন্তু সেখানে একই ধরনের বহু ধ্বনি শোনা যাচ্ছিল। এ কারণে আবদুল হামীদ তার ও অন্যদের প্রতি প্রদত্ত, নির্দেশের মধ্যে পার্থক্য করতে পারছিল না। আবদুল হামীদ শুনতে পেল, একজন সৈনিক বলছে,—'নতুন এ চক্রটি আমার মাথার হেলমেটটি উড়িয়ে দিয়েছে।' তার সংগীটি বলে উঠল—হায় আল্লাহ! মাত্র একটি? পাগলের মত আবদুল হামীদ একবার পেছনে একবার সামনে যেতে থাকল।

সৈনিকটি তার বিস্ময় ও ভীতি বুঝতে পেরে সজোরে তার বাহু মুঠ করে ধরে আংগুল দিয়ে ইশারা করে বলল—'এই যে, ঐ অফিসটি দেখতে পাচ্ছ? ঐ, দক্ষিণ দিকে...ঐ দিকে যাও।' চাবুক দিয়ে তার গায়ে এমন একটি শক্ত আঘাত করল যে, সেটা তার গলায় জড়িয়ে গেল। আবদুল হামীদ অফিসের দিকে যেতে থাকল। দরজার কাছে পেঁছে হাপাতে থাকল। দেখতে পেল, যে অফিসারটি তার পূর্বের তদন্ত-কাজ শেষ করেছিল, সেই একই ব্যক্তি তার অফিসের পেছনের দিকে বসে আছে। আবদুল হামীদ হতভম্ব হয়ে গেল, যখন সে অত্যন্ত নরম সুরে বলতে শুনল—আবদুল হামীদ, বেটা! এ দিকে এস। বস।

আবদুল হামীদ বসতে ইতস্তত করতে থাকল। পরিষ্কার ঝকঝকে তকতকে আরামদায়ক চেয়ার। তার পরনের কাপড় ময়লা, পুরানো ও রক্তমাখা। অভি-জাত পোষাক পরিহিত তদন্তকারী অফিসারটি একটু রসিকতা প্রকাশের ভান

করে বলল—আবদুল হামীদ, আল্লার কসম ! সত্যিই তোমরা আমাদেরকে কষ্ট দিচ্ছ। আল্লাও তোমাদেরকে কষ্ট দেবেন। আমি তোমাদের বুঝে উঠতে' পারছি না। তোমরা কি কোন শয়তান, জ্বীন, না পাগলের দল ? না, এ সবকিছু থেকে বহু দুরে গোপন কোন ষড়যন্ত্রকারী নতুন সংগঠন ? তোমাদের কার্যাবলী দিয়ে সব কিছু ধ্বংস না করে তোমরা যেন বিরত হবে না। বেটা ! তুমি বসছ না কেন ? বস, কোন ভয় নেই ।

ভয়ে ভয়ে আবদুল হামীদ একটি বেঞ্চের এককোণে বসল। তার অন্তর দুরু দুরু করছে, শরীর ঠক ঠক করে কাঁপছে। সে এক নতুন পরীক্ষার মুখোমুখি। পূর্বের ঘটনাবলী ও স্বীকৃতি, যা লেখা আছে এবং যার ওপর ভিত্তি করেই বিচার হবে, তার সব কিছুরই সরাসরি অস্বীকৃতি। বহু দিন আগে তার এক প্রাইমারী শিক্ষক তাকে বলতেন, 'সত্য কথা মুক্তিদাতা' কিন্তু এখন সে দেখছে, তার উল্টোটি সত্য বলা মানে 'মৃত্যু'। মিথ্যা ও জুলুমে ভরপুর এ বিশ্বে সকল সত্য ও মূল্যবোধই আগাগোড়া পরিবর্তিত হয়ে গেছে। আবদুল হামীদের একটু বাইরের দিকে তাকানোর সুযোগ হল। সে দেখতে পেল, উতওয়া বেগ নিজেই একটি চাবুক হাতে নিয়ে একজন নতুন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমানে পিটিয়ে চলেছে। হায় আল্লাহ ! আবদুল হামীদ যে লোকটিকে চেনে ! এ ত 'সুলায়মান হাযার। 'হরমের' Mathematical Higher Training Institute এর ছাত্র। ইস ! তারা এ কি করছে ? একে ত মেরে ফেলারই কায়দা করেছে।

হঠাৎ আবদুল হামীদ একটি কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। তাকে বলছে—আবদুল হামীদ ! আদালতকে তুমি যে সাহায্য করেছ, তার জন্যে আমরা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।

আবদুল হামীদ তদন্তকারী অফিসারের দিকে তাকাল। সে তাকে দেখতে পেল, নিরবে গভীর মনোনিবেশ সহকারে কিছু কাগজ-পত্র উল্টে-পাল্টে পড়ছে। ভাব দেখে মনে হয় সে নয়, বরং অন্য কেউ কথা বলছে। আবদুল হামীদ অফিস কক্ষের চারদিকে নজর ফেরাল। সে এই প্রথমবারের মত দেখল একটি লোক অন্য একটি অফিসের পেছন দিকে বসে আছে। তার সামনের একটি বাল্ব থেকে একটি উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ আলো ঠিকরে পড়ছে। ঐ প্রচণ্ড তীক্ষ্ণতার দরুন আবদুল হামীদ ভালোমত সেই লোকটির চেহারা দেখতে সক্ষম হচ্ছিল না। সেই দুর্বল লোকটির কণ্ঠস্বর আবার শোনা গেল। সে বলছে—একটি জিনিস ছাড়া আমাদের সামনে আর কিছুই নেই। আর তা আমাদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ। আমার বিশ্বাস, এ ব্যাপারে তুমিই আমাদেরকে সাহায্য করতে পার। আমার মর্যাদার কসম করে বলছি, শিগগিরই আমরা তোমাকে ছেড়ে দেব।

'মর্যাদার কসম' শুনে আবদুল হামীদ মৃদু হাসল। সবসময় তারা এমনই বলে থাকে। 'কসম' করতে ভুল করে না কখনো। এটা তাদের কাছে কতকগুলি অর্থহীন হরফ অথবা একটি বাজে কাজ।

আবদুল হামীদ বলল—আপনি যা বলতে চাচ্ছেন তা আমি বুঝলাম না।

নতুন তদন্ত অফিসারটি তার অফিস কক্ষের পেছন দিক থেকে বেরিয়ে আবদুল হামীদের কাছে এসে বলল—সিরীয় ইখওয়ান ও মিসরীয় ইখওয়ান, তেমনিভাবে জর্দান, ইরাক, সৌদি আরব ও কুয়েতের ইখওয়ানীদের মাঝে যোগাযোগ রক্ষাকারী দলটির সন্ধান বের করা আমাদের দরকার।

মুচকি হেসে আবদুল হামীদ বলল—মনে হচ্ছে আমাকে আপনারা চিনতে পারেননি!

—তুমি আবদুল হামীদ নাজ্জার। একজন বীর ও নিষ্ঠাবান কর্মী।

—আমি ত ইখওয়ানুল মুসলিমীনের 'মুরশিদে আম' নই।' কর্ম পরিষদ বা সাংগঠনিক পরিষদেরও সদস্য নই। আমি একজন সাধারণ মানুষ। এত কিছু আমি কি করে জানব? লোকটি তার সবগুলি দাঁত বের করে হেসে বলল—সরকারের কাছে তুমি যা চাইবে, তাই পাবে। বুঝলে?

আবদুল হামীদ উঠে দাঁড়াল এবং তদন্ত অফিসারের দিকে একটা দৃঢ় প্রত্যয়ী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলল—ঘটনাটি সম্পূর্ণই বানোয়াট।

তদন্ত অফিসারের চেহারাটি বিবর্ণ হয়ে গেল। অন্য একখানি চেয়ারে উপবিষ্ট প্রথম তদন্ত অফিসারটি লাফিয়ে উঠে আঁধ পাক ঘুরে আবদুল হামীদের কাছে এগিয়ে গেল। তার দু'চোখ থেকে একটা পৈশাচিকতা ঠিকরে পড়ছে। সে প্রশ্ন করল—কি বললে?

আমি বলছি, 'সিরীয় প্রচার পত্রটি' সম্পর্কে আমি কিছুই জানিনে।

—তাতে যা লেখা আছে, তা ত, তুমিই বললে। তোমার কণ্ঠস্বর আমরা রেকর্ড করে রেখেছি। তুমি কি তা আবারো শুনতে চাও?

আবদুল হামীদ ঢোক গিলে কম্পিত কণ্ঠে বলল—আমি যা কিছু বলেছি, তা বানিয়ে বলতে আপনারাই আমাকে বাধ্য করেছেন।

—আমরা তোমাকে বাধ্য করেছি? কার কাছ থেকে তুমি একথা শিখেছ?

—আমি প্রচণ্ড মার থেকে বাঁচতে চেয়েছি। তদন্ত অফিসার তার ঘাড়টি ধরে জোরে একটি ধাক্কা দিয়ে বল—এ ছাড়া অন্য কিছু বল।

—এ প্রচারপত্র সম্পর্কে আমি কিছুই জানিনে।

সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করার পর এভাবে অস্বীকার করতে কে তোমাকে উৎসাহিত করল? আবদুল হামিদ মাথা নীচু করে বলল—কেউ না। খুবই সামান্য কারণে। অফিসার বলল—কি সে কারণ?

—সত্যি কথা বলাই উচিত ছিল।

—কোনটা সত্যি আজকের কথাটি না গতকালের?

কাহিনীটি আমিই আগাগোড়া বানিয়েছি, যাতে কিছুটা স্বস্তি ও ঘুমানোর সুযোগ লাভ করতে পারি। অফিসারটি তার গালে জোরে একটা থাপ্পর মেড়ে

বলল—আমরা প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্সিকে এখন কি বলব? তোমার সব কথাই ত তাঁদের কাছে আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি। আর তাঁরা অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে সে ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা শুরু করে দিয়েছেন।

উতওয়া আল-মালওয়ানী রুমে ঢুকলো। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সে আবদুল হামীদ ও তদন্তকারী অফিসার দু'জনের কথাবার্তা শুনল। সে বুঝতে পারল অভিযুক্ত ব্যক্তি তার পূর্ব প্রদত্ত জবানবন্দী এখন অস্বীকার করছে। উতওয়া বলল—তাকে আমার কাছে ছেড়ে দাও ত। আমি আবার তার স্বীকৃতি আদায় করে দিচ্ছি। নিজ হাতেই সে লিখে দেবে। বরং অতিরিক্ত অন্য কিছুও সে স্বীকার করবে।

প্রথম তদন্ত অফিসারটি বলল—এ ছাড়া অন্য কোন গতি নেই। তা না হলে তারা আমাদেরকে বকাঝকা করবে এবং প্রেসিডেন্সিতে ঠাট্টা বিদ্রূপও করা হবে।

উতওয়া তার দু'পাটি দাঁত বের করে আবদুল হামীদের প্রতি ইশারা করে বলল—আমার সামনে এস। জবাই করা ছাগলের মত তোমার ঠ্যাংগে দড়ি বেঁধে গাছে ঝুলাবো। হয় স্বীকার করবে, না হয় মরে যাবে।

দ্বিতীয় তদন্ত অফিসারটি বলল—আমার মনে হয়, তার বন্ধুদেরও ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা উচিত। তাদের কেউ না কেউ তাকে অস্বীকার করার জন্যে উৎসাহিত করেছে।

কয়েক মিনিট পরেই আবদুল হামীদকে পায়ে রশি বেঁধে ঝুলানো হল। সে সম্পূর্ণ উলঙ্গ, যেমনটি তার মা তাকে প্রসব করেছিলেন। স্বয়ং উতওয়ার তত্ত্বাবধানে চারদিক থেকে বর্ষিত হচ্ছে চাবুকের আঘাত। অতি ক্ষীণ কণ্ঠে আবদুল হামীদ কঁকাচ্ছে। সে তার সব কিছুই আল্লার নিকটে সোপর্দ করে দিয়েছে। মৃত্যু এখন তার কাছে কিছুই না; বরং তাই যেন তার কাম্য। আবদুল হামীদ আল্লার কাছে তওবা-ইসতিগফার করছে। জীবন তাঁর মহান প্রভুর একটি দান অথবা তাঁর অনেক নিয়ামতের একটি নিয়ামত। তা একান্তভাবে পেতে চাওয়া কোন মুমিনেরই উচিত নয়। কেননা, তা ত আল্লার কাছ থেকেই এসেছে, এবং কেবলমাত্র আল্লাহরই। তার কাজ শুধু ধৈর্য্য ধারণ ও অবিচল থাকা। উতওয়া তার নিকটে এগিয়ে এসে একটু নীচের দিকে ঝুঁকে আবদুল হামীদের একটি কান ধরে বলল—আবদুল হামীদ, তুমি এখনই মারা যাবে। সময় বয়ে যাবার আগেই কথা বল।

কান্না বিজড়িত কণ্ঠে আবদুল হামীদ বলল—'আইনামা তাকুনু য়ুদরিককুমুল মাউতু ওয়া লাও কুনতুম ফী বুরূজিম মুশাইয়্যাদাহ'—তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, তা তোমরা কোন সুকঠিন লৌহ সিন্দুকেই লুকিয়ে থাকনা কেন।

—এ ধরণের কথা আমি আগেও শুনেছি।

—আমি যে একজন মজলুম একথা আমি কিভাবে প্রমাণ করবো?

—আমরা কারো উপর জুলুম করিনা।

—আমি……।

উতওয়া চিৎকার করে উঠল—ওরে কুত্তার বাচ্চা, তুই……মিথ্যাবাদী।

—আমার সম্পর্কে একমাত্র আল্লাই ভালো জানেন।

—আমাদের এ ব্যাপারে আল্লার কোন ভূমিকা নেই।

আবদুল হামীদ বলল—উতওয়া বেগ, আল্লার কাছে ইসতিগফার কর।

আবারো উতওয়া চিৎকার করে উঠল—একে পিটাও।

কঁকানী……অসহ্য যন্ত্রণা……ভয়ানক দীর্ঘ মুহূর্তগুলো………। আবদুল হামীদের মাথাটি নীচের দিকে, কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। চোখ দু'টি অন্ধকার হয়ে আসছে, মাথা ফেটে যাবার উপক্রম হচ্ছে। সে অনুভব করল তার নাক দিয়ে গরম রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। রক্তক্ষরণ…এটাই কি তার শেষ? আবদুল হামীদ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, আল্লাহ এ মুহূর্তে এবং যে কোন সময়ে সব কিছুই দেখেন ও শোনেন। তার বিপর্যস্ত মাথায় সব কিছুই তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে, কি একটি সত্য তার মাথায় উজ্জল হয়ে উঠছে। এখন নামাজের ওয়াকত। হায়, এ ফরজটি আদায়ের জন্যে তারা যদি তাকে একটু ছেড়ে দিত। আহ্। সে চিন্তা করছে, সে এ অবস্থায়ই নামাজ আদায় করে নেয়না কেন? কাবা আমার সামনে—নামাজের নিয়ত করছি…আল্লাহু আকবর।' সে বিড় বিড় করে কিছু পড়ছে, আর চাবুকের আঘাত সমানে পড়ছে তার পিঠে। সে যেন কিছুই অনুভব করছে না। সব শেষে সে বিড় বিড় করে পড়ল, 'ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ…আস-সালামু আলাইকুম'—তুমি প্রশংসিত মহান……।

উতওয়া তার কাছে এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করল—কি, কথা বলবেনা?

—সে কোন উত্তর দিলনা।

—কি দিয়ে তোমাকে তৈরী করা হয়েছে?

আবদুল হামীদ উত্তর দিল—মাটি দিয়ে।

—ওয়াক থু। কি নোংরা!

—আল্লাহ আপনাকে মাফ করুন।

উতওয়ার রাগে ফেটে পড়ার উপক্রম হল। চীৎকার করে সে তার আশে-পাশের সৈনিকদের নির্দেশ দিল—তাকে ছেড়ে দাও।

কিছুক্ষণ পর আবার সে বলল—তার বন্ধন খুলে দাও।

দুই তিন মিনিট পর আবদুল হামীদ বালুর ওপর চীৎ হয়ে পড়ে আহ্ উহ্ করে কঁকাতে থাকল। অত্যন্ত করুণ সুরে সে বলতে লাগল—ইয়া রব…ইয়া রব…ইয়া রব……।

২২

তদন্ত বিভাগের অফিস থেকে ৪৭নং সেলে বেশ কিছু সংখ্যক সৈনিকের অপ্রত্যাশিত আগমনে এ সেলের বাসিন্দারা হতবাক হয়ে গেল। তাদের মধ্য থেকে যদি দু'একজনকেও নিয়ে যেত তাহলেও ব্যাপারটি স্বাভাবিক মনে হত। কিন্তু সকলকে এমন রাগের সাথে নিয়ে যাওয়া এবং তাদেরকে সেল থেকে তদন্ত বিভাগের অফিস পর্যন্ত এভাবে চাবুকের আঘাতে জর্জরিত করা—এর পেছনে কেবল মাত্র দু'টি কারণ থাকতে পারে। প্রথমত, নতুন সংগঠনটির সকল সদস্যকে গ্রেফতারের পর পরিচালনা পরিষদ পুরাতন কয়েদীদের সম্পর্কে নতুন কোন রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকবে। যেমন প্রতিশোধ ও শিক্ষামূলক শাস্তির ন্যায় কোন বাছ-বিচার না করে সংগঠনের সকল স্তরের বা সব সংগঠনের লোকদের প্রতি শাস্তি ব্যাপক করা। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগতভাবে আবদুল হামীদের বিষয়টির সাথেও ব্যাপারটি জড়িত হতে পারে। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, তার অস্বীকৃতি তাদেরকে বিচলিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। আর মা'রুফের সমর্থন হচ্ছে এই শেষের মতটির প্রতি। তার মন ও বুদ্ধি এ কথাই বলছে। বর্তমান দিনগুলিতে তার মন যা বলে তা সত্যে পরিণত হয়। আল্লার অধিক নিকটবর্তী হয়েছে বলে আজকাল সে যেমনটি অনুভব করে এমনটি কোন দিনও এর আগে অনুভব করেনি।

তদন্ত অফিসের প্রাঙ্গনে পৌঁছার সংগে সংগেই তাদেরকে দেয়ালের সামনে এমনভাবে দাঁড় করিয়ে দেয়া হল যে, তাদের মুখমণ্ডল সুকঠিণ পাথরের মুখোমুখি তাদের পিঠ সৈনিকদের দিকে এবং তাদের বাহুগুলি উপরের দিকে ওঠান। মা'রুফের বাঁ দিকে একটু তাকানোর সুযোগ হল। সে দেখতে পেল আবদুল হামীদ মাটিতে মরার মত পড়ে আছে। মা'রুফ তার চাহনী ও নড়াচড়া থেকে ব্যাপারটি সম্পর্কে কিছু আঁচ করার চেষ্টা করল কিন্তু কোন প্রকার নড়াচড়া বা ইশারা ইঙ্গিত করার কোন ক্ষমতাই নেই আবদুল হামীদের। কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই প্রথম ও দ্বিতীয় তদন্ত অফিসারদ্বয় এসে হাযির হল। প্রথমজন তার সঙ্গীর প্রতি ইঙ্গিত করতে করতে মা'রুফকে বলল—শোন মা'রুফ, প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্সী থেকে ফরীদ বেগ এসেছেন।

মা'রুফ তার হাত দু'খানি নামাল। এরপর অত্যন্ত তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল—হ্যাঁ, ইয়াহইয়া বেগ, আমি তাকে চিনি।

ফরীদ মৃদু হেসে কিছুটা গর্বের সাথে মা'রুফের সাথে হাত মিলাল এবং বিড় বিড় করে বলে উঠল—আমরা বন্ধু ছিলাম, কিন্তু কালচক্র

ইয়াহইয়া বেগ পুনরায় বলতে লাগল—আপনার বন্ধু আবদুল হামীদ জেলের অভ্যন্তর থেকেই আমাকে একটা ধেঁাকাবাজির মধ্যে ফেলে দিয়েছে। যে কারণে হয়ত আমার প্রতি আপনার কু-ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। তার কথা শেষ না হতেই ফরীদ বেগ বলতে লাগল—তুমি আমার বহুদিনের বন্ধু। তাই এরূপ মারাত্মক পরিস্থিতিতে একমাত্র তুমিই পার উপকার......

মাথা দুলিয়ে মা'রুফ বলল—কি সমস্যা খুলে বলুন ত।

সিরীয় প্রচারপত্র সংক্রান্ত কিছু স্বীকারোক্তি রেকর্ড করা হয়েছিল। ব্যাপারটি আমরা উপরে প্রেসিডেন্সীতে পাঠিয়ে দিয়েছি এবং সন্দেহভাজন ব্যক্তিদেরও মুক্তি দিয়েছি। এখন সে এসে সবকিছু অস্বীকার করছে।

মা'রুফ ব্যাপারটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করল। তাকে ও তার সংগীদের এভাবে ডেকে আনার তাৎপর্য কি হতে পারে? এর দ্বারা কি একথা বুঝা সংগত হবে যে, আবদুল হামীদ প্রচণ্ড শাস্তির মধ্যে তাদের একথা বুঝিয়েছেন যে, মা'রুফই তাকে পূর্বের সব কথা অস্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ করেছে? মা'রুফ ভালো করেই জানে, নিরাপত্তার বিষয়ে এ সব দায়িত্বশীল অফিসারের প্রকৃতি ও স্বভাব সম্পর্কে। এ কারণে সে আল্লার সাহায্য কামনা করল এবং সিদ্ধান্ত নিল, তাদের সামনে সত্যকে পূর্ণরূপে তুলে ধরতে এবং এর জন্যে চূড়ান্ত শাস্তি পিঠ পেতে নিতে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তার ক্রিয়াকলাপ তাদেরকে ক্ষেপিয়ে তুলবারও সম্ভাবনা রয়েছে। এত কিছুর সম্ভাবনা থাকা সত্বেও মা'রুফ সত্য বলতে আগ্রহী। সে ইয়াহইয়া বেগকে বলতে শুনল—মা'রুফ তোমার মত কি? তুমি আমার সুহৃদ। সর্বদাই আমরা তোমাকে সম্মান করি, বড় মনে করে থাকি। তোমার আজকের এ দুরাবস্থা সত্বেও আমরা তোমাকে ভালো করেই চিনি ও জানি।

শান্তভাবে মা'রুফ বলল—আপনারা কি প্রকৃত রহস্য সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চান, না আপনাদের সন্দেহ ও সংশয় সমূহের প্রতি আমার সমর্থন চান?

মৃদু হেসে ফরীদ বেগ বলল—অবশ্যই প্রকৃত রহস্য।

মা'রুফ বলল—বেশ ভালো কথা। আবদুল হামীদ ফিরে গিয়ে যখন আমাকে সবকিছু জানল তখন আমি বুঝতে পারলাম, কাহিনীটি আগাগোড়াই তার বানানো। সত্যিই বলছি, তাকে আমি তিরস্কার করলাম। আমার এ কাজে আপনারা হয়ত রাগ করবেন। কিন্তু আমি দেখলাম, আপনাদের ধেঁাকা দেয়া মারাত্মক ব্যাপার। তার অর্থ হবে এই, এ প্রচারপত্র কে এনেছে এবং এর প্রকৃত বণ্টনকারীদের সম্পর্কে কোন তথ্য আপনারা জানতে পারবেন না। আর এটাকে কি আপনারা আপনাদের ও দেশের জন্যে কল্যাণজনক মনে করতে পারেন?

ইয়াহইয়া বেগ ক্রোধ চেপে বলল—ওরে খেকশিয়াল, এর কারণ তাহলে তুমিই?

– সত্য ছাড়া আমি কিছুই বলব না.........আর.........

ফরীদ বেগ তার কথা থামিয়ে দিয়ে বলল—তোমাকে আমি জানি। সারা জীবনই তুমি একজন আদর্শবাদী।

—আসল কথা হল, আমার কথায় আপনাদের বিশ্বাস।

বিচলিত কণ্ঠে ইয়াহইয়া বেগ প্রশ্ন করল—তাহলে আমরা প্রেসিডেন্সীর জিজ্ঞাসার জবাব কি ভাবে দেব?

—সত্য কথা দিয়ে।

—এটা আমাদের জন্যে একটা তুলনাহীন দুর্ভাগ্যের দরজা খুলে দেবে।

—কেন?

·কারণ, এ কর্মের প্রকৃত নায়ক খুঁজে বের করা আমাদের কর্তব্য।

—ইয়াহইয়া বেগ, এ কাজের নায়ক আবদুল হামীদ নয়।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে মা'রুফ বলল—আপনারা কি চান, এ হতভাগা বন্দীর পাঠা হোক। তারপর আপনারা ফাইলপত্র গুটিয়ে নিশ্চিন্তে আরাম করতে থাকুন, আর আবদুল হামীদকে মৃত্যু অথবা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের জন্যে নিয়ে যাওয়া হবে অন্যায়ভাবে! ইয়াহইয়া বেগ হাত উঠিয়ে সজোরে মা'রুফের গালে এক থাপ্পর বসিয়ে দিয়ে বলল—আমরা কারো প্রতি বানোয়াট দোষারোপ করি না।

বিদ্রুপের সাথে মা'রুফ বলে উঠল—খুবই স্পষ্ট।

তারপর ফরীদ বেগের দিগে ফিরে জিজ্ঞাসা করল—ফরীদ বেগ, আপনি কি তার কথা সমর্থন করেন? তারপর অত্যন্ত আবেগের সাথে মা'রুফ তার কথার সমাপ্তি টানল এই বলে—এমনটি করা আপনাদের জন্যে হারাম। আল্লাহ তাঁর মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে বলেছেন, 'ওয়ালা ইয়াজরিমান্নাকুম শানায়ানু কাওমিন 'আলা আন লা তা' দিলু.........ইদিলু হুয়া আকবারু লিত্‌ তাকওয়া—'অর্থাৎ কোন দল বা গোষ্ঠির প্রতি তোমাদের শত্রুতা তোমাদেরকে এত উত্তেজিত করে না তোলে যে, তার ফলে তোমরা ইনসাফ ত্যাগ করবে। তোমরা ইনসাফ প্রতিষ্ঠা কর। কারণ ইনসাফই হল তাকওয়ার অধিক নিকটবর্তী। আর আপনারা কীভাবে আল্লার প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াচ্ছেন? এভাবে মিথ্যা ঘটনা তৈরী করা না আপনাদের না রাষ্ট্রের কোন কল্যান বয়ে আনবে।

মা'রুফ বুঝতে পারল, ব্যাপারটি এত সোজা নয়। এ নির্মম শয়তানগুলিকে বুঝানো খুবই কঠিন ব্যাপার। বুদ্ধি ও যুক্তি-তর্ক দিয়ে তাদের সাথে বোঝাপড়া করা বেশ কষ্টকর। তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব থেকে দূরে থাকতে চায় এবং নেতাদের খুশী করার উদ্দেশ্যে নিজের কাজের প্রতি একজন উৎসাহী ও নিষ্ঠাবান হিসাবে জাহির করতে চায়। প্রথম যে ভিত্তিটার ওপর তারা তাদের চিন্তা দর্শনের ইমারত গড়ে তুলেছে তা হল, ইখওয়ানের প্রতিটি লোকই অতি মারাত্মক একটি বালা ও মুসিবত এবং একটি বিপর্যয়ও বটে। এ ব্যাপারে নেতা ও কর্মী, দোষী ও নির্দোষ সবাই একই পর্যায়ের। চূড়ান্ত কথা হলো, হয় তাদেরকে শেষ

করে দাও অথবা যথাসম্ভব দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ডে দণ্ডিত কর। যাতে দুশ্চিন্তা তাদেরকে কুরে কুরে খেয়ে নিঃশেষ করে দেয় এবং করার অন্তরালে ভয়-ভীতি তাদেরকে ধ্বংস করে ফেলে। এরপর কেউ যদি সেখান থেকে বেরও হয়, তাহলে সে একজন হতাশগ্রস্ত, কপর্দকহীন বিপর্যস্ত মানুষ হিসেবে বের হবে। তখন সে আর কোন কাজের যোগ্য থাকবে না।

এসব কিছু জানা সত্ত্বেও সে তার ভূমিকার ওপর অটল থাকার সিদ্ধান্ত নিল, যার ব্যাখ্যা গতকালই সে সেলের অভ্যন্তরে আবদুল হামীদের কার্যকলাপের সমালোচনা প্রসঙ্গে করেছিল। যত কঠিন মূল্যই দিতে হোক না কেন, সত্য বলাই উচিত এবং আল্লার ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ ও অবিচল থাকা কর্তব্য। 'তোমার সামান্যতম ক্ষতির উদ্দেশ্যে যদি তারা সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়, তবুও তারা আল্লা যা নির্ধারণ করে রেখেছেন, তা থেকে কিছুমাত্র বেশী ক্ষতি তারা করতে সক্ষম হবে না।'

মারুফ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল এবং তার কান দু'টি বিশ্বাসই করতে পারেনি যখন সে শুনতে পেল ফরীদ বেগ বলছে—ইয়াহইয়া বেগ শুনুন, মা'রুফ যা বলেছে তাতে আমি পরিতৃপ্ত। ফাইলটা বাতিল করে ফেলুন এবং আবদুল হামীদের নতুন কথাগুলি রেকর্ড করুন। আর তাতে তার স্বাক্ষর নিন। আর আমিও পূর্বের তদন্ত রিপোর্টের ফাইলটি বাতিল করে দেব। এরপর তাদেরকে সেলে ফিরে যেতে দিন।

ফরীদ বেগ কিছুটা হৃদয়তার সাথে মা'রুফের হাতে হাত মিলিয়ে বলল—মারুফ, তুমি জান, আমরা সবাই তোমার জন্যে ব্যথিত। তোমার মাথা থেকে এসব চিন্তা-ভাবনা যদি দূর হত এবং যদি তুমি গোড়ামী ছেড়ে দিতে তাহলে খুবই ভাল হত। যদি তা করতে তাহলে এ বন্দীদশা থেকে ছাড়িয়ে নেয়ার জিম্মাদারী আমিই নিতাম। ছোট্ট এক টুকরা কাগজে প্রেসিডেণ্টকে উদ্দেশ্য করে একটু ক্ষমা ভিক্ষা করলেই সব সমস্যার নিস্পত্তি হয়ে যেত। তুমি সেনাবাহিনীতে অবশ্য ফিরে যেতে পারবে না। তবে তুমি তোমার ব্যক্তিত্ব ও অতীত ইতিহাসের উপযোগী কোন গুরুত্বপূর্ণ কোম্পানীতে একটি সম্মানজনক চাকরী পেয়ে যাবে।

মৃদু হেসে মা'রুফ বলল—ফরীদ বেগ, আপনাকে ধন্যবাদ। এটা আমার জন্যে গৌরব। আপনার এ করুণা কোনদিন আমি ভুলব না।

পিছন ফিরে যেতে যেতে ফরীদ বলল—চিরকালই তুমি বড়ো কঠোর। কারণ যাই থাকুক না কেন, এমন নিগৃহীত অবস্থায় কেউ কি থাকতে চায়?

উতওয়া বেগের রাগে ফেটে পড়ার উপক্রম হল এবং খুবই লাফালাফি শুরু করে দিল যখন সে প্রেসিডেন্সীর প্রতিনিধি ফরীদ বেগের পদক্ষেপ সম্পর্কে অবগত হল। সে প্রস্তাব দিল, অন্য ইখওয়ানীদের থেকে তাকে দূরে স্বতন্ত্র একটি সেলে আবদ্ধ করে রাখার এবং তার অহমিকা, নির্বুদ্ধিতা ও সরকারে প্রতি শত্রুতামূলক মনোভাবের উপযোগী কোন কঠিন আচরণ তার প্রতি হোক।

কিন্তু ফরীদ বেগ বলল—উতওয়া, কথা শোন। প্যালেস্টাইন যুদ্ধে মা'রুফ

আমার ও আমার মত আরো দশজন সৈনিকের জীবন বাঁচিয়েছে। সে দিন সে না থাকলে আজ আমি 'সুরে বাহের' অঞ্চলের বালুর নীচে পড়ে থাকতাম। হায়, পৃথিবী বড় অভিনব! মা'রুফ যদি একটু নরম হত এবং নিজের কল্যাণের কথা চিন্তা করত তাহলে আজ উঁচু পর্যায়ের বিপ্লবীদের একজন হত সে।

রাগে দাঁত কিড়মিড় করে উতওয়া বলে উঠল—এসব কথা তাকে আরো দুঃসাহসী করে তুলবে।

—উতওয়া, ভুলে যেওনা, আমি প্রেসিডেন্সীর পক্ষ থেকেই কথা বলছি। ঘটনা সম্পর্কে আমরা তোমার থেকে অধিক জ্ঞাত।

সবাই সেলে প্রত্যাবর্তনের পরপরই মারুফ বলল—পাক মাটি দিয়ে তোমরা তায়াম্মুম করে নাও। ওজুর পানি পাওয়া যাবে না। আমরা দু'রাকাত শোকরানা নামাজ আদায় করব। তারপর সবাই মিলে আবদুল হামীদের জন্যে দু'আ করব, যাতে সে সহিসালামতে ফিরে আসতে পারে।

কবি ইউসুফ তাদের নামাজের ইমামতি করল। তারপর তারা গোল হয়ে বসল। তারা নিজেদেরকে বড় সৌভাগ্যবান মনে করছে। কেননা তাদেরকে আল্লা এমন কঠিন অবস্থা থেকে বাঁচিয়েছেন। ফরীদ বেগ যা করেছে তা নিয়েই এখন সবার চিন্তা আবর্তিত হচ্ছে। এমন মারাত্মক সময়ে সে যা করেছে তার দৃষ্টান্তও বিরল। রেযেক ইবরাহীম টিপ্পনি কাটল—এই লোকটির মধ্যে এখনো কি সত্য ও কল্যাণ অবশিষ্ট আছে?

ইউসুফ অনুচ্চকণ্ঠে কুরআনের আয়াত পাঠ করল—'ওয়া মাই য়া'মাল মিনাস সালিহাতে ওয়াহুয়া মু'মিনুন, ফালা য়াখাফু জুলমান ওয়ালা হাদমা—কোন ব্যক্তি যদি কোন সৎকাজ করতে চায়, আর সে মু'মিন হয় তাহলে কোন জুলুম অত্যাচারের পরোয়া সে করেনা।' আর মাহমুদ সাকার, সর্বক্ষণ যে নীরব ও চুপচাপ থাকে, সেও বলে উঠল—মানুষের ব্যাপারটি বড় অভিনব। কখনো সে শক্ত কখনো সে দুর্বল, কখনো ন্যায়পরায়ন, কখনো তার উন্নতি আবার কখনো অবনতি। স্থায়িত্ব একমাত্র আল্লার।

মা'রুফ এমনভাবে হেসে উঠল যে, সবার দৃষ্টি তার ওপর গিয়ে পড়ল। সে বলল—ব্যাপারটি রহস্যজনক। সবাই তার কাছাকাছি এগিয়ে এসে বড় বড় চোখ করে তার দিকে তাকিয়ে থাকল।

রেযেক প্রশ্ন করল—রহস্যটি কী?

মারুফ প্রশ্ন করল—গোপনীয়তা রক্ষা করতে পারে তোমাদের মধ্যে এমন কেউ কি আছে? চাবুক তোমাদের অঙ্গীকারের কথা ভুলিয়ে দেবে না ত?

রেযেক ইবরাহীম বলল—গোপন রাখার অঙ্গীকার আমরা করছি।

মা'রুফ বলল—গোপনীয়তা ফাঁস করে দেয়া আমার স্বভাব নয়।

রেযেক বলল—আমিও অঙ্গীকার করলাম।

মারুফ বলল—কিন্তু এবার আমার একটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আছে।

সবাই চুপ করে গেল তার গুরুত্বপূর্ণ কথাটি শোনার জন্যে। এরপর সবাই তার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল—ফরীদ ছিল আমারই ইউনিটে।

ইউসুফ চীৎকার করে প্রশ্ন করল—ইখওয়ানের?

—হ্যাঁ।

এরপর মারুফ বলতে থাকল—ঘটনাটি যেদিন ঘটল সেদিন সে আমার কাছে এল। আমাকে সে বলল—মা'রুফ প্রকৃত রহস্য একমাত্র তুমি, আমি ও আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেনা। আমি সবই বুঝলাম। আল্লার কাছে অঙ্গীকার করলাম, ব্যাপারটি কেউ জানতে পারবে না, তাতে যদি তারা আমাকে টুক্‌রো টুক্‌রোও করে ফেলে। আমরা ছিলাম আল্লার পথে পরস্পর পরস্পরের ভাই। অস্ত্র ও জিহাদের ক্ষেত্রে একে অন্যের বন্ধু। ভাইয়েরা, বিশ্বাস কর, সেখানে প্রতিটি স্থানেই ফরীদের মত অসংখ্য ব্যক্তি রয়েছে। এর দ্বারা আমি তোমাদের মনোবল বৃদ্ধি করতে চেয়েছি। এ কারণে রহস্যটি আজ তোমাদের কাছে ফাঁস করলাম। তবে সরকারের কাছে নয়।

রেযেকের হলুদ বর্ণের চেহারায় যেন রক্ত জমে গেছে, এমন অবস্থায় সে প্রশ্ন করল—তাহলে অত্যাচারী শাসকের সহযোগিতা সে করে কিভাবে!

মা'রুফ বলল—এ প্রশ্নের জবাব দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

—তাহলে জবাব কে দেবে?

—সে নিজেই। প্রতিটি লোকেরই রয়েছে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী।

—মা'রুফ ব্যাপারটি খুবই স্পষ্ট। খারাপ পরিণতির কথা চিন্তা করে সে ভয় পেয়ে গেছে।

মৃদু হেসে মা'রুফ বলল—একমাত্র কারাগারই কি অটুট মনোবল ও সাহসিকতা দূর করে দিতে পারে?

—আমার বুঝে আসে না। বীরত্ব ও সহসিকতা কখনো কখনো পলায়নী মনোবৃত্তি গ্রহণ করে থাকে আবার কখনো সামনে অগ্রসর হয়। কখনো বা প্রকাশ্যে আবার কখনো বা আত্মগোপন করে থাকে। এ ধরনের সমস্যাবলীতে কোন প্রকার মতামত দেয়া সহজ নয়।

রেযেক জোর দিয়ে বলল—এ পদ্ধতি শঠ রাজনৈতিক নেতাদেরই সাজে।

দু'কাঁধ দুলিয়ে মা'রুফ বলল—হতে পারে। কিন্তু তার আচরণটি একটি কঠিন ব্যাপার।

কথার মাঝখানে কবি ইউসুফ রাসূলের (স) একটি কথার উদ্ধৃতি দিল। 'তোমরা তোমাদের প্রয়োজন সমাধার জন্যে চুপি চুপি আল্লার সাহায্য চাও।'

অনুচ্চস্বরে মাহমুদ বলল—একমাত্র আল্লাই ভালো জানেন।

দরজার চাবি ঘোরানোর শব্দ হল। যেই মাত্র দরজা খুলল, অমনি উপস্থিত সকলে হুড়মুড় করে উঠে দাঁড়াল। দু'জন সৈনিক আবদুল হামীদকে কাঁধে করে নিয়ে এল। তাকে সেলের মধ্যে ঢুকিয়ে সশব্দে ফেলে দিল। তার প্রায় তখন

অজ্ঞান অবস্থা। সবাই ভীতি ও শঙ্কার সাথে তার বিকৃত চেহারার দিকে তাকাল।

মা'রুফ বলে উঠল—তারা তাকে কেন শেফাখানা নিয়ে গেল না?

কেউ কোন উত্তর দিলনা। আবার দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

বন্ধুদের সকলের বিস্ময়ের সীমাপরিসীমা থাকল না, যখন দেখল আবদুল হামীদ মৃদু হাসছে এবং বলছে—সেটা আমিই চেয়েছি। শেফাখানায় যেতে অস্বীকার করেছি। তোমাদের বিচ্ছেদকে আমি সহ্য করতে পারি না।

রেযেক বলল—কিন্তু তোমার অবস্থা ত আশঙ্কাজনক।

—তোমাদের মাঝেই আমার মরণ হলে নিজেকে আমি সৌভাগ্যবান মনে করব।

—কিন্তু এখন এর সমাধান হবে কিভাবে?

কিছুক্ষণ নীরবতা বিরাজ করার পর রেযেক বলে উঠল—হ্যাঁ, আমি পেয়েছি।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মা'রুফ তার দিকে তাকাল। রেযেক বলে উঠল—আজমী...... আমি ডাঃ আজমীর কথা বলছি।

ইউসুফ চীৎকার করে বলে উঠল—তুমি কী বুঝাতে চাচ্ছ?

—আমি বলতে চাচ্ছি, কামরায় তার কাছে কিছু ঔষধ-পত্র আছে। কুকুরের কামরায়। সম্ভবত তা থেকে উপকার নেয়া যেতে পারে।

মৃদু হাসির একটা ঝলক ইউসুফের চোখে-মুখে ফুটে উঠল। এর মধ্যে মা'রুফ বলে উঠল—একটি উত্তম চিন্তা। তার কাছে পেনিসিলিন, সালফাডাইজিন, কাপড় তুলা ইত্যাদি আছে। আমার বিশ্বাস এর থেকে বেশী কিছু আমাদের প্রয়োজন পড়বে না

সারা দেহে আঘাতের যন্ত্রণা সত্ত্বেও আবদুল হামীদ কিছুটা স্বস্তি ও সৌভাগ্য অনুভব করতে লাগল। সেই নরক থেকে খুব সহজেই সে নিষ্কৃতি পাবে এমন চিন্তা সে করেনি। বরং তার ধারণা হয়েছিল, তার অন্তিম সময় উপস্থিত। প্রথমে স্বীকার, পরে আবার তা অস্বীকার, এ বড় অভিনব ব্যাপার। এ জন্যে তাকে চরম কঠোরতার সম্মুখীন হতে হবে। তার বড় সৌভাগ্য যে, ধীরে ধীরে তার ব্যথা-বেদনার অনুভূতি কমে গিয়েছিল। আর তার ভেতরে একটা দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছিল যে, তার এ দুরাবস্থা থেকে সে একদিন সুস্থ হয়ে উঠবে। ভীতি ও শঙ্কা মিশ্রিত কণ্ঠে আবদুল হামীদ বিড় বিড় করে বলল—ডাঃ আজমী হলেন পশু ডাক্তার। পশু, না তাতে কোন আপত্তি নেই। এখানে আমরা ত পশুর থেকেও নিকৃষ্ট। বন্ধুগণ, ব্যাপারটি খুবই স্বাভাবিক। তারা কেউ হাসি চেপে রাখতে পারল না।

২৩

নাবিলা আবদুল্লার বিষয়টি উতওয়া মালওয়ানীর হৃদয়ে এমন একটি ক্ষতের সৃষ্টি করেছে যা কোন মতেই শুকাচ্ছে না। একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে সে বিষয়টি পর্যালোচনা করেছে। তার মাথায় এ চিন্তাটি একবারও আসেনি যে, নাবিলা একজন মানুষ। কাউকে ভালোবাসা বা না বাসার অধিকার তার আছে।

সে ভুলে গেছে, সে একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব। কোথাও যাওয়া বা না যাওয়া তার নিজস্ব ব্যাপার। তেমনিভাবে কোন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করা বা মেনে নেয়ার পূর্ণ ক্ষমতা তার রয়েছে। তার দৃষ্টিতে এসবের কোনই গুরুত্ব নেই। তার জীবনের জোর-জুলুমের বছরগুলি, তাকে প্রদত্ত প্রশস্ত ও লাগামহীন ক্ষমতা, নিরস সৈনিক জীবন কলংকিত অতীত, যা তার জীবনের অনেকগুলি বছরকে ছিনিয়ে নিয়েছে—এসব কিছুই সম্মিলিতভাবে তাকে একজন হিংস্র পশুতে পরিণত করেছে। তার কোন আবেদন কেউ প্রত্যাখ্যান করুক তা সে সহ্য করতে পারে না। সে বাস্তব সত্যকে মেনে নিতে পারে না। কিন্তু পাখি এখন মহাশূন্যে ডানা মেলে তার ক্ষমতার বাইরে দূর দিগন্তে পাড়ি জমিয়েছে। পলাতক উড়ন্ত পাখি নাবিলাকে হাতের মুঠোয় পাওয়া এখন অসম্ভব ও অবাস্তব।

যে বিষয়টি বেশী করে তার মনে কাটার মতন বিঁধছে তা হল নাবিলার সেই চিঠি দু'টি। তাতে পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে নাবিলার ইখওয়ানুল মুসলিমীনে পরিপূর্ণরূপে যোগ দেয়ার বিষয়টি। এটা কি একটি অভিনব, ব্যতিক্রমধর্মী ও অকল্পনীয় ব্যাপার নয়? নাকি আল্লাহ্ এমনি একটি সৃষ্ট জীবের মাধ্যমে তার থেকে প্রতিশোধ নিতে চান, যা কিনা তার জন্যে লোভনীয় নিষিদ্ধ ফলের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে? উতওয়া কিছুটা প্রশান্তি অনুভব করল, যখন তার স্মরণ হল নাবিলার আব্বা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, নাবিলা এ খবর শুনে খুবই ব্যথা পাবে। উতওয়া জানে, নাবিলার গভীর আবেগ কোমল অনুভূতি ও পরিবারের প্রতি তার তীব্র ভালোবাসার কথা। তার আব্বা মারা গেছেন, তার মা পঙ্গু হয়ে পড়েছেন অথবা তার কোন এক ভাইকে জেলখানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সে যখন এসব কথা জানতে পারবে তখন সে কী করবে?

এ কারণে উতওয়ার রাত্রি-দিনের একমাত্র চিন্তা হল কিভাবে নাবিলার পরিবারকে কষ্ট দেয়া যায়। যদি তার আব্বা না মরে তাহলে সে তাকে বিষ প্রয়োগ করতেও প্রস্তুত। এভাবেই সে তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে পারবে এবং তার আকাংখিত প্রতিশোধ গ্রহণের পথে একটি পদক্ষেপ নেয়া তার পক্ষে সম্ভব হবে। এ ব্যাপারে কোন কিছুই তার চিন্তাসূত্র ছিন্ন করতে পারবে না। এমন সময় সামরিক কারাগারে একজন উঁচু পর্যায়ের অফিসারকে সে বলতে শুনল—আমি জেনেছি, একটি কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র থেকে মিসর যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম কিনবে।

উপেক্ষা ভরে উতওয়া তার দিকে তাকিয়ে বলল—এ ধরনের বিষয়াবলী নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই।

বিস্ময়ের সুরে অফিসারটি বলল—তা কেমন করে হয়? এত একটি মারাত্মক ব্যাপার। যার অর্থ হল, দেশের রাজনৈতিক নিয়ম কাঠামোর পরিবর্তন।

কিছুটা উপেক্ষার ভঙ্গিতে, উতওয়া তার নিচের ঠোঁটটি মুছে নিয়ে বলল—বিষয়টি নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাবার দরকার নেই।

—তাহলে কে মাথা ঘামাবে?

—স্বাভাবিকভাবেই প্রেসিডেণ্ট।

এরপর উতওয়া একটি হুইস্কীর বোতল বের করে নিজের জন্যে একটি গ্লাসে ঢালতে ঢালতে প্রশ্ন করল—তুমি খাবে?

অফিসারটি বলল—ধন্যবাদ। তারপর একটু তিক্ত হাসি হেসে বলল—হুইস্কী পশ্চিমের……অস্ত্র পূর্বের। এরপর সে উতওয়ার সামনে পড়ে থাকা 'কেন্ট' সিগারেটের প্যাকেটটি উঠিয়ে নিল এবং তার থেকে একটি সিগারেট বের করে বলতে থাকল—আর সিগারেট আমেরিকার। এরপর সিগারেটে আগুন ধরিয়ে বলল—আর আজাব ও শাস্তির বিশেষজ্ঞ জার্মানীর। তারপর ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকাতে পাকাতে বলল—আসলে আমাদের এ দেশটি বিশ্বের সকল কল্যাণ ও অভিজ্ঞতার জন্যে উম্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। এটা বহু কল্যাণের সুসংবাদ বহন করে।

তৃতীয় পেয়ালাটি শেষ করে উতওয়া হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল—মাহমুদ সাকার কিছু অস্ত্র ও তার স্থানের কথা হয় স্বীকার করবে, না হয় মারা যাবে।

অফিসারটি বলল—সম্ভবত সে ইংরেজের হাতিয়ার।

—ইংরেজ……দৈত্য……আমি কোন পরোয়া করিনে……

অফিসারটি উতওয়ার নিকটে এগিয়ে গিয়ে বলল—আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কোন প্রকার অস্ত্রের সাথে এ যুবকের কোন সম্পর্ক নেই।

—সন্দেহ ছাড়া দৃঢ়ভাবে কিছুই আমি বিশ্বাস করিনে।

মৃদু হেসে অফিসারটি বলল—বেগ সাহেব, কোন কোন সান্দহ পাপের জন্ম দেয়।

—পৃথিবীর বুকে এ ধরণের ভবঘুরেদের অস্তিত্ব থাকাটাই হল পাপ।

কঠোরভাবে অফিসারটি বলল—উতওয়া বেগ, আমরা তাদের উপর জোর জবরদস্তি করছি কেন?

—আমি নিজেকে এ ধরণের প্রশ্ন কখনো করিনি।

—কেন?

—ব্যাপারটি আলোচনা—পর্যালোচনার প্রয়োজন নেই। প্রতিটি জিনিসই যদি আমরা চুলচেরা বিশ্লেষণ করি তাহলে কিছুই করতে পারব না।

উতওয়া তার অফিস থেকে বের হয়ে গেল। অতীতের যে কোন সময় থেকে প্রাঙ্গণটি বন্দীদের দ্বারা বেশী ঠাসাঠাসি। এদের মধ্যে আছে আর্থিক যোগানদার, নতুন সংগঠনের সদস্যবৃন্দ ও পুরাতন সংগঠনের কিছু সদস্য। আহাজারি, চিৎকার ও চাবুকের শব্দ সবকিছু ছাপিয়ে ওপরে ভেসে উঠছে এবং ইথারে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। প্রাঙ্গনে যেইমাত্র উতওয়ার আগমন ঘটল অমনি একজন সৈনিক উঁচু গলায় হেঁকে উঠল—'সবকুছ ঠিক হ্যায়।' সংগে সংগে এক ভীষণ ক্লান্তিকর নিরবতা তার কালো পাখাগুলিতে ভর দিয়ে নেমে এলো সেই রক্তিম প্রাঙ্গণে। আর সেই ছোট্ট খোদাটি বুক ফুলিয়ে গম্ভীরভাবে হতভাগ্য প্রজাদের

মাঝে চক্কর দিতে থাকল। তার দু'চোখ থেকে ঠিকরে পড়ছে এক ধরণের পৈশাচিকতা। কখনো সে ডানে আবার কখনো বামে তাকাচ্ছে। মনে হচ্ছে সারা বিশ্বই তার পদানত।

এরূপ একটি রক্তাক্ত ও ভীতিপ্রদ নিরবতার মাঝখানে হঠাৎ কেউ রেডিও খুলে দিল। মাইক্রোফোনে পাঠকের সুরেলা কণ্ঠ ভেসে এল—ইন্নানি আনাল্লাহু, লা-ইলাহা ইল্লা আনা ফাবুদনী ওয়া আকিমিস সালাতা লিজিকরী, ইন্নাস সা-'আতা আ-তিয়াতুন আকা-দু উখ্‌ফীহা লিতুজযা কুল্লু নাফসিন বিমা তাস'আ। 'নিশ্চয় আমিই সেই আল্লাহ। আমি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই। কাজেই তুমি আমারই ইবাদত কর এবং আমারই ইবাদত স্মরণে নামাজ কায়েম কর। অবশ্যি কিয়ামত সমাগত। আমি তা গোপন রাখতে চেয়েছি যাতে প্রতিটি প্রাণীই তার কাজের প্রতিদান পেতে পারে।'

উতওয়ার চেহারা মলিন হয়ে গেল। সে জোরে চীৎকার করে উঠল—রেডিও বন্ধ কর, জানোয়ার কোথাকার।

মুহূর্তেই কোরআনের আওয়াজ থেমে গেল। এর পরপরই ভেসে এল উম্মে কুলসুমের কণ্ঠস্বর। সে গাচ্ছিল—ইয়া জামাল, ইয়া মিসালাল ওয়াতানিয়্যাহ—গানটি। সংগে সংগে উতওয়ার চেহারার মালিন্য কেটে গিয়ে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। আবার হো হো করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। হাসি থামিয়ে আবার চিৎকার করে উঠল—কারাগারের সকলেরই আমার সুরে সুর মিলানো উচিত।

বন্দীদের ধীর, নম্র ও কান্না বিজড়িত কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল। তারা উম্মে কুলসুমের তালে তাল দিচ্ছিল। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল, পাঠক কুরআনের যে আয়াতগুলি পাঠ করছিল, তার প্রতিধ্বনি উপস্থিত লোকদের কানে তখনো অনুরনিত হয়ে তাদের ক্ষত-বিক্ষত অন্তরের গভীরে গিয়ে পৌঁচোচ্ছিল। আর গানের উঁচু কণ্ঠগুলি তাদের কাছে কোন প্রান্তর থেকে ভেসে আসা শোরগোল ও হৈ চৈ বলে মনে হচ্ছিল। উপস্থিত লোকদেরকে উতওয়া জিজ্ঞেস করল—মাহমুদ সাকার কোথায়?

তাদের একজন দুরে একটি পিলারের দিকে ইশারা করল। উতওয়া তার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকাল যেন তা থেকে কঠোরতা ও ঘৃণা উপচে পড়তে লাগল। জীর্ণ-শীর্ণ মাহমুদ কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল, তার ঘাড়টি শুকিয়ে গেছে। স্বচ্ছ দু'টি চোখ গর্তের মধ্যে বসে গেছে। যে বালির উপরে সে দাঁড়িয়ে আছে, তা থেকেও তার চেহারা বেশী ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ক্ষত চিহ্নগুলি এত বেশী ফুলে গেছে যাতে মনে হচ্ছে সেখানে কোন কিছু ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। অজগরের মত মৃদু হেসে উতওয়া বলল—মাহমুদ তুমি নতুন জীবন লাভ করেছ।

বিষাদ ভরা দৃষ্টিতে মাহমুদ তার দিকে তাকাল। তবে সে কোন কথা বলল না।

উতওয়া বলল—তোমাকে আমরা দীর্ঘ সময় সুযোগ দিয়েছি।

উতওয়া তারপর মাহমুদের কম্পিত কাঁধটি ধরে সজোরে একটি ধাক্কা দিয়ে বলল—তুমি 'সাকার' (বাজপাখী) হলে আমি 'নসরে' (শকুন)। তোমার বাপ মা

তোমার নাম রাখার ব্যাপারে ভুল করেছে। তাদের উচিত ছিল তোমার নাম রাখা মাহমুদ গুরাব (কাক), মাহমুদ বুমাহ্ (পেঁচা) বা মাহমুদ কিরাদ (বানর) বা অন্য কিছু।

উতওয়া অহেতুক হেসে কুটি কুটি হচ্ছিল। পাশে দাঁড়ান অফিসার ও সাধারণ সৈনিকরা সৌজন্য ও সম্মানের খাতিরে সে হাসিতে যোগ দিল, এমন কি মাহমুদ নিজেও একটু হেসে ফেলল। উতওয়া বড় বিমর্ষ হয়ে পড়ল যখন সে মাহমুদের দু'টি চোখে মু'মিনের স্বচ্ছ—স্বাভাবিক দৃষ্টি লক্ষ্য করল। সে এটা মোটেই সহ্য করতে পারে না। সে তার একখানি হাত ওপরে উঠিয়ে সজোরে মাহমুদের মুখে মেরে দিল। মাহমুদ বেকে গিয়ে প্রায় পড়ে যাচ্ছিল কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই নিজেকে সংবরণ করে নিয়ে আবার সোজা হয়ে দাঁড়াল। ব্যথায় মাথাটি নীচু করে রাখল, তবে কোন কথা বলল না। এর মধ্যে উতওয়া বলতে থাকল—ওরে হারামজাদা, মনোযোগ দিয়ে শোন। হয় অস্ত্র অথবা মৃত্যু। তোর সাথে ব্যয় করার মত এর থেকে বেশী সময় আমার হাতে নেই। শত শত লোক তদন্তের অপেক্ষায় আছে, তা কি তুই দেখতে পাচ্ছিস না? তোর জীবনের কোনই মূল্য নেই। জাতির কয়েক মিলিয়নের মধ্যে তুই একটি ব্যক্তি মাত্র। তুই মারা গেলে দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে না। আমার কথা বুঝেছিস? আমি কিন্তু তামাশা করছি না।

মাহমুদের হৃদয় কেঁপে উঠল, সে চাইল আকাশের দিকে একটু তাকাতে। কিন্তু মাথাটি উপরের দিকে উঠে যাবে তাই ভয় পেল। অত্যন্ত বিনয়ের সাথে সে বলল—অস্ত্র কি জিনিস আমি আমার জীবনে কোন দিন চিনিনি, কথা ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমেই আমি মানুষকে দাওয়াত দিতাম।

বিদ্রূপের সাথে উতওয়া বলে উঠল—আমি জানি জানি। তারপর প্রহরীদের দিকে তাকিয়ে নির্দেশ দিল—হয় সে অস্ত্রের কথা স্বীকার করবে অথবা তার ক্ষত-বিক্ষত লাশ আমার সামনে হাজির করবে, তার লাশ বুঝলে?

একজন বিখ্যাত কারা প্রহরী উতওয়া বেগের সামনে এসে দাঁড়িয়ে তাকে স্যালুট মেরে বলে উঠল—তামাম ইয়া আফিন্দাম—বুঝলাম জনাব।

এভাবে আদেশ জারি হল, অত্যন্ত শান্ত ও ধীরস্থিরভাবে আধা মস্তানী অবস্থায় উতওয়া আল-মালওয়ানী জারি করল সেই আদেশ। মাহমুদ অবস্থার ভয়াবহতা বুঝতে পেরে দ্রুত চিন্তা করতে লাগল, তার কোন আত্মীয়ের নিকট যদি অস্ত্র থাকত—সে কোন ধরণের অস্ত্র, তা সে যত নিম্ন মানেরই হোক না কেন, তার কথা বলে দিয়ে এ মুহূর্তে সে তার জীবন বাঁচাত। এ মুহূর্তে মাহমুদ ভীষণ ভাবে একটি অস্ত্র কামনা করছে, যাতে সে তার কথা স্বীকার করতে পারে। কিন্তু উপায় কি? এ ব্যাপারে ত সে কিছুই জানে না।

আর চারপাশের সব কিছু থেকে মাহমুদ একেবারে নির্লিপ্ত হয়ে পড়ল! তাদের কথার কিছুই সে বুঝতে সক্ষম হচ্ছিল না। বড় নির্দয়ভাবে তার পিঠে পড়ছিলো চাবুকের আঘাত। এমন কি আহ্ উহ্ বা কাকুতি মিনতিমূলক কোন

শব্দও সে উচ্চারণ করতে পারছিল না। সব কিছুই সে আল্লার নিকট সোপর্দ করল। সে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। তার চারপাশের বিশ্বটি ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। তারপর সে কি দেখতে ও কি শুনতে পেল? তার রহস্য আসমান ও জমীনের মালিকের নিকট, সে যেন নতুন করে তার নূরের একটি ঝলক দেখতে পেয়েছে। অথবা সে তার মাকে দেখেছে, যিনি তাকে নিজ হাতে খাওয়াচ্ছেন। অথবা তার প্রেয়সী 'আমাল' কে। সে তাকিয়ে আছে অশ্রু ভেজা চোখে। আর দৃষ্টির বাইরে থেকে যেন তাকে ডাকছে, সে তাকে মৃদু হাস্যময় অবস্থায় স্পন্দহীন ভাবে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেছে। সে আরো বলছে, সে যখন মৃতের মত পড়ে ছিল তখন উতওয়া বেগ তাকে শেষ বারের মত দেখার জন্যে এসে সেই মৃদু হাসি দেখতে পেল, এতে তার পাগলামী গেল আরো বেড়ে এত কিছু সত্ত্বেও সেই মৃদু হাসিটুকু বিলীন হলো না।

কারাগারের ওপর সন্ধার ঘন অন্ধকার তার কালো চাদরটি বিছিয়ে দিল। তালাবদ্ধ সেলগুলির অভ্যন্তরে ধীরে ধীরে নিরবতা নেমে এল। তবে থেকে থেকে সেখান থেকে আল্লার নাম ও তার রসূলের ওপর দরূদ পাঠের শব্দ ভেসে আসছিল। মাঝরাতের সামান্য কিছু আগে মা'রুফ তার বিছানায় একটু নড়েচড়ে উঠে বিড়বিড় করে বলে উঠল—তোমাদের ভাই মাহমুদ সাকার ফিরে এলো না!

তার ধারণা ছিল কেউ তার কথার উত্তর দেবে না। সাধারণত এটা সবারই ঘুমের সময়। কিন্তু সবাই হঠাৎ এক সাথে গায়ের চাদর ফেলে চিন্তিত অবস্থায় বিছানার ওপর উঠে বসল, আবদুল হামীদ নাজ্জার বলল—তার সাথে আল্লাহ আছেন।

মা'রুফ আবার বলতে থাকল—তার অনুপস্থিতি বেশ দীর্ঘ হয়ে গেছে।

জবাবে আবদুল হামীদ বলল—সেখানে হাশরের দিনের মত ভীড়। দিনের পর দিন পায়ের পাতা ও আংগুলের ওপর দাঁড় করিয়ে রেখে তদন্ত চালানো হচ্ছে এরূপ পরিস্থিতিতে অফিসাররা অতিরিক্ত মজুরী পেয়ে থাকে।

সুদানী বন্ধু রেযেক একটু টিপ্পনি কেটে বলল—তারা উৎসাহমূলক ভাতা গ্রহণ করে থাকে। একটু বিদ্রুপের সাথে কবি ইউসুক ফোড়ন কাটল —অতিরিক্ত উৎপাদন বড় ও ধরণের মুনাফা অর্জনের জন্যে।

তারা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা, দোয়াদরূদ পাঠ অথবা কুরআন তেলাওয়াত করতে লাগল। এভাবে ফজরের নামাজের সময় হয়ে গেল। কিন্তু ঘুম তাদের চোখের পাতাকে স্পর্শ করল না। অথচ দীর্ঘদিন ধরে তারা অত্যাচার-উৎপীড়ন ও ভীষণ মানসিক উৎকণ্ঠা ভোগ করে আসছে। নিয়ম অনুযায়ী ভোর চারটায় সেলের দরজাগুলি খোলা হল। যাতে কয়েদীরা পেশাব-পায়খানার নির্বাক সারিতে যেতে পারে। বিষন্নভাবে তারা সবাই বসে থাকল। যে কোন মুহূর্তে বিনাকারণে রক্ষীরা চাবুকের আঘাতে তাদের দেহকে জর্জরিত করবে। তারপরেও তারা বসে থাকবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা পালা বা লটারীতে অভ্যস্ত। এভাবেই

শেষ হবে পেশাব-পায়খানার লাইন, তথা স্থায়ী শাস্তির লাইন। মা'রুফ হাদারী যখন তার সেলে ফিরছিল তখন বন্ধু ইসমাঈল তার কাছে এগিয়ে গেল। সম্প্রতি সে অফিসের ঝাড়ামোছার কাজে ইহুদী 'কুরীর' জায়গায় নিয়োজিত হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি সে বলে ফেলল—মা'রুফ, আল্লাহ তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিদান দান করুন। মাহমুদ সাকার শাহাদাত লাভ করেছে।

মা'রুফ থমকে দাঁড়াল। সে যেন চেতনা হারিয়ে ফেলল। পরক্ষণেই চিৎকার করে প্রশ্ন করল—কি হয়েছে?

ইসমাঈল বলল—তারা তাকে আব্বাসিয়া মরুভূমিতে দাফন করেছে। আর খাতাপত্র তার নামের পাশে প্রথাগতভাবে 'ফেরার' শব্দটি লিখে রেখেছে। তাড়াতাড়ি সরে যাও। আর কাকেও এ সংবাদটি বলোনা।

মুহূর্তের মধ্যে ইসমাঈল সড়ে পড়ল। আর মা'রুফ একাকী সেখানে দাঁড়িয়ে থাকল। তার চোখে যেন অশ্রু জমাট বেঁধে গেছে, হৃদয়ে ধিক ধিক শব্দ হচ্ছে। যেন তার বুকের খাঁচাটি এখনই ফেটে যাবে। এভাবে কিছুক্ষণ অতিবাহিত হল। তার মাথায় চাবুকের সজোর আঘাত পড়তেই সে চেতনা ফিরে পেল। তারপর তার কানে প্রবেশ করল কয়েকটি শব্দ—কুত্তার বাচ্চা, সেলে ঢোক।

মা'রুফ একটুও ব্যথা অনুভব করলনা। ধীরস্থিরভাবে সে তার সেলের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে হতভম্বের মতো মাঝ পথে থেমে গেল। একটা অন্ধকার যেন জগদ্দল পাথরের মত তার বুকের ওপর চেপে বসেছে। অন্য ইখওয়ানীরা ঢুকেই তাকে এ অবস্থায় দেখতে পেল। রেযেক চীৎকার করে বলে উঠল—কি হয়েছে?

মা'রুফের কান্নাবিজড়িত কণ্ঠের কঠোর নির্দেশ তাদের কানে ভেসে এল—আকীমুস সালাহ্—নামাজে দাঁড়িয়ে যাও।

ফজরের নামাজ শেষ হলে মা'রুফ বলল—বন্ধুগণ, আমরা সকলে আল্লার আমানত। যখন ইচ্ছা আল্লাহ তার আমানত ফিরিয়ে নিতে পারেন। আমরা সকলেই সেই গন্তব্য স্থলের দিকে এগিয়ে চলেছি। তোমাদের শহীদ ভায়ের গায়েবী জানাযা আদায়ের জন্যে তোমরা দাঁড়িয়ে যাও। তার জানাযা ছাড়াই তারা তাকে দাফন করে দিয়েছে।

রেযেক গর্জন করে উঠল—কে?

—মাহমুদ সাকার। আল্লাহ তার ওপর রহম করুন।

সবাই কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। মা'রুফ কয়েক মিনিট অপেক্ষা করল। তারপর সে নিজেই চোখের পানি মুছতে থাকল। তার স্মরণ হতে লাগল ১৯৪৮-র ফিলিস্তীন যুদ্ধের সেই রক্তমাখা দিনগুলির কথা। আর কিভাবে কত বীর সন্তান মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছে। আর কি ভাবেই না সে যুদ্ধের কঠিন পর্যায়গুলিতে সে তার সেনাবাহিনীকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পরিচালনা করেছিলো। এমন সময় অত্যন্ত আত্মপ্রত্যয়ী নেতার ন্যায় দৃঢ়তার সাথে চিৎকার করে উঠল—তোমা-

দের ভায়ের রুহের ওপর দোয়া করার জন্যে দাঁড়িয়ে যাও। নামাজের জন্যে কাতার বন্দী হয়ে দাঁড়াও।

নামাজের পর মা'রুফ শূন্য বিছানাটির দিকে তাকাল। গতকালও মাহমুদ সাকার এখানে বসত, খেত এবং ঘুমাত। সে বসত একজন আগন্তুকের মতো। অথবা এখনই যাত্রা করবে এমন একজন মুসাফির বা একজন পথচারীর মতো। একটা অভিনব অনুভূতি কয়েক দিন যাবত মারুফকে খোঁচা দিচ্ছে। ফেরেশতার মতো সাদা পাখিটি শিগগিরই হয়ত পাখা মেলে মহাশূন্যের দিকে উড়ে যাবে। যেখানে পৌঁছেনি মানুষের নোংরামী, কারখানার কালো ধোঁয়া ও মাইকের শোরগোল। সে এক চিরন্তন প্রেম ও শান্তির বিশ্ব। যেখানে নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের রুহের সম্মিলন ঘটে। যেখানে জুলুম, অত্যাচার, হিংসা-বিদ্বেষ, আত্মম্ভরিতা ও ধোঁকাবাজীর কোন অবকাশ নেই।

কবি ইউসুফ বলল—হৃদয় বিনম্র ও বিচলিত হও। চোখ অশ্রু বিসর্জন কর। মাহমুদ, আমরা তোমার বিচ্ছেদে ব্যথিত।

—ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন,—এ চিরন্তন বাণীটি ছাড়া কিছুই আমরা বলতে পারি না।

কিছুক্ষণ নিরবতা বিরাজ করার পর রেযেক ইবরাহীম বলল—তদন্তে হাজির এমন কিছু কয়েদীকে আমি বলতে শুনেছি, তিনজন ইখওয়ানীকে তারা মেরে ফেলেছে।

মা'রুফের দু'গণ্ড চোখের পানিতে ভিজে যাচ্ছিল। এ অবস্থায় সে আবার বলতে লাগল—কুল্লু নাফসিন যা-য়িকাতুল মাউত, ওয়া নাবলুকুম বিশ শার্‌রি ওয়াল খাইরি ফিতনাতান, ওয়া ইলাইনা তুরজাউন।—প্রতিটি প্রাণই মৃত্যুসুধা পান করবে। ভাল ও মন্দের মাধ্যমে আমরা তোমাদের পরীক্ষা করব। অবশেষে আমার দিকেই তোমরা ফিরে আসবে।

সবাই বিড় বিড় করে আওড়াল—সাদাকাল্লাহুল আযীম—মহান আল্লাহ সত্যিই বলেছেন।

২৪

নাবিলা যখন কুয়েতের মাটিতে নামছিল তখন তার অনুভূতি ছিল একজন বিদেশীনির অনুভূতির মতো। হঠাৎ সে দেখতে পেল বহু মেয়ে-পুরুষ তাকে স্বাগত জানাতে বিমান বন্দরে উপস্থিত। ব্যাপারটি ছিল তার জন্যে খুবই অস্বাভাবিক। তাদের কারো সাথে তার পূর্ব পরিচয় নেই। এঁরা কারা। ডাঃ সালেমের বন্ধু, যিনি প্রথম থেকেই নাবিলার বিষয়টির দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তিনি নাবিলার মাথার মধ্যে যে সব ঘুরপাক খাচ্ছে তা বুঝতে পেরে চুপে চুপে বললেন—এঁরা সবাই আল্লার পথের ভাই ও বোনেরা।

—আমাকে তাঁরা কিভাবে চিনল?

—সময় মত সবই জানতে পারবে।

সব চেয়ে বেশী আশ্চর্যের ব্যাপার হল, এদের কাছে এসে নাবিলা ভীষণ স্বস্তি অনুভব করছে। যেন সে তাদেরকে বহুদিন আগে থেকেই চেনে। অধ্যাপক আবদুল আজীজ সীসী, যিনি ডাঃ সালেমের বন্ধু, মৃদু হেসে বললেন—বোন, রূহ বা আত্মারা হল সশস্ত্র সৈনিকের দল। পরস্পর পরিচিত হলে তারা এক সূত্রে গেঁথে যায়, পরস্পর অপরিচিত থাকলে বিভক্ত হয়ে যায়। এঁরাও একই পথের পথিক।

একটা অনাবিল প্রশান্তিতে নাবিলার মন ভরে গেল। সে শধু বলল—জ্বী।

নাবিলা খুবই খুশী। সে শুনতে পাচ্ছে, তারা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে বিভিন্ন বিষয়ের পর্যালোচনা করেছে এবং এমন সব বই-পুস্তক ও ছাপানো কাগজপত্র পরস্পর লেনদেন করছে যা মিসরে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। মিসরে এই ধরনের কাগজপত্র যার কাছে পাওয়া যায় তাকে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে জেলখানায় নিক্ষেপ করা হয়। নাবিলা কিছু আরবী ও আন্তর্জাতিক ম্যাগাজিন হাতে নিয়ে দেখতে লাগল। মিসরীয় পত্র-পত্রিকার যে ধরন-ধারণের সাথে সে পরিচিত এগুলির ধরন-ধারণ তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এর কোনটিতে রয়েছে মিসরের শাসকগোষ্ঠীর কঠোর সমালোচনা, আর কোনটিতে রয়েছে চলতি ঘটনাবলীর দ্বিধাহীন চুলচেরা বিশ্লেষণ। এতে বহু দুঃখজনক ঘটনার পর্দা উম্মেচিত হয়ে যায়। মিসরীয় সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে এগুলিকে বিরাট কৃতিত্ব ও সাহসিকতার কাজ বলে গণ্য করা হয়। অপরদিকে সেখানে এমন সব পত্র-পত্রিকাও সে দেখতে পেল যা মিসর সরকার ও তাদের রাজনীতির গোঁড়া সমর্থক। নাবিলা শুনতে ও দেখতে পেল এমন কিছু ব্যক্তিকে যারা জামাল আবদুন নাসের ও তার সঙ্গী সাথীদের অন্ধ ভক্ত। তাদের অন্ধ ভক্ত। তাদের কেউ কেউ ফিলিস্তীন, সিরিয়া, লেবানন অথবা কুয়েতের অধিবাসী। মিসর বিপ্লবের প্রতি তাদের এ দ্ব্যর্থহীন ও অন্ধ ভক্তি দেখে নাবিলা যেন একটু ক্ষুব্ধ হল। প্রথম থেকেই তার মাথায় এ ধারনা জন্মাল, তারা প্রতারিত অথবা ভাড়াটিয়া দল। কিন্তু অধ্যাপক আবদুল আজীজ সীসী তার স্বভাব সুলভ নীচু গলায় বললেন—এখানে কোন একটি মত ও বিশ্বাসের সমর্থকবৃন্দকে দেখতে পাবে তেমনিভাবে পশাপাশি তার প্রতিপক্ষকেও পাবে। প্রতিটি দলেরই একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী রয়েছে। আমি এখানে বহু বছর ধরে আছি। আমাদের ও তাদের মধ্যে আলোচনা সব সময় চলছে। এসব পরস্পর বিরোধী প্রবাহ অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবেই তাদের যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। চাবুক এখানে মানুষকে একটিমাত্র মত বা পথের দিকে তাড়িত করছে না।

নাবিলা গভীর মনোযোগ সহকারে এখানে প্রকাশিত বই-পুস্তক পড়তে লেগে গেল। এগুলির বিষয়বস্তু হল, ইখওয়ান ও বিপ্লবের ঝগড়া, এ মহান যুদ্ধে শহীদদের তালিকা, দেহ ও চিন্তার ক্ষেত্রে সব খোদাদ্রোহীদের গৃহীত পোষ্ট-মর্টেম পদ্ধতি এবং ক্রমবর্ধমান ইসলামী শক্তি ও আন্দোলনকে নস্যাৎ করার

ঔপনিবেশিক শক্তি, খৃষ্টান মিশনারী ও কম্যুনিষ্টদের সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র। সে নিজে যা প্রত্যক্ষ করেছে এবং বইতে যা পড়েছে তা যখন তুলনা করে তখন তার বিশ্বাস হয়, রহস্যটি একদিন সবার কাছে ফাঁস হয়ে যাবে। এতে তার অন্তরে কিছুটা প্রশান্তি অনুভূত হয়। একই সময়ে সে বড় দুঃখও অনুভব করে যখন সে দেখতে পায় বহু লোক খোদাদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কোন কথায় বিশ্বাস করতে চায়না। সে শুনতে পায় কায়রো রেডিওর সুমিষ্ট বক্তৃতামালা, 'সাওতুল আরব' (Voice of Arab) এর আকর্ষণীয় শ্লোগান, অসংখ্য উপস্থিতিতে জাতীয় সমাবেশ, নতুন নেতৃত্বের প্রতি প্রতারিত প্রচার মাধ্যমগুলির প্রদত্ত অভিনব খেতাব ও বিশেষণ-সমূহ। এ থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তারা পরাভূত হবে না এবং তাদের স্বরূপ ও উন্মোচিত হবে না। নাবিলা বড়ই হতাশা ও দুঃখ অনুভব করে কিন্তু আবদুল আজীজ সীসী তাকে বললেন এ যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী। বাতিল শক্তি ভিতরের গোপন ও প্রকাশ্য বলে বলীয়ান। ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করা ছাড়া আমাদের সামনে অন্য কোন পথ নেই।

নাবিলা বলল-কত দিন পর্যন্ত ?

— তা আল্লাহ জানেন।

—ফলাফল ?

—আল্লার হাতে। আমাদের কর্তব্য হলো সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। এটাই আমাদের কাছে চাওয়া হয়েছে। বিজয় আগামীকালও আসতে পারে অথবা আমাদের পরবর্তী কোন প্রজন্মের হাতেও আসতে পারে।

নাবিলার সুন্দর চেহারায় একটা বিষন্নভাব ফুটে উঠল। এ অবস্থায় সে বলল—লাঞ্ছনার এ দীর্ঘ বছরগুলিতে আমরা জীবনকে কীভাবে বরদাশত করব ?

—আমরা তা হলে কী করতে পারি ?

আমরা হত্যা করব, ধ্বংস করব, প্রতিশোধ নেব। কারাগারের অভ্যন্তরে প্রতারণা ও ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে শতশত লোক মৃত্যুবরণ করেছে। আমরা কেন মরতে পারব না ? আমরা মারব এবং মরব। এ ভাবেই আমাদের কোরবানী সার্থক হবে।

আবদুল আজীজ মৃদু হাসবেন এবং মাথা ঝাঁকিয়ে বলতে থাকলেন—আমি তোমার সাথে দ্বিমত পোষণ করি। এক, দশ অথবা হাজার জনের মৃত্যু এ বাস্তবতার কোন পরিবর্তন সাধন করতে পারবে না। বরং তা খোদদ্রোহীদের আরো বেশী বোকামী ও হাজারো নিরাপরাধ মানুষের রক্ত প্রবাহের দিকে ঠেলে দেবে। সমস্যাটি হল আগাগোড়াই পদ্ধতিগত সমস্যা। হিকমাত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে মানুষকে আল্লার দিকে দাওয়াত দেওয়া ছাড়া এ পদ্ধতির পরিবর্তন অথবা সংশোধন মোটেই সম্ভব নয়। পরিবর্তনের জন্যে মানুষের বুদ্ধি ও অনুভূতি থেকে সূচনা করতে হবে। উচিত হবে প্রথমে তাদেরকে প্রভাবিত করা। তাহলেই ফাসাদ ও বিপর্যয়ের কেল্লা টলে উঠবে, জুলুমের দুর্গ ধ্বসে পড়বে এবং 'উতওয়া আল-মালওয়ানী' ও তার মত ব্যক্তিরা এ ধরাপৃষ্ঠ থেকে আত্মগোপন করবে। আর তখনই নতুন সাংবাদিকতা আত্মপ্রকাশ করবে এবং মুনাফেকদের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে যাবে।

নাবিলা চিন্তায় ডুবে গেল। তার চেহারায় একটি বিমর্ষ ভাব ফুটে উঠল। সে স্মরণ করতে লাগল সামরিক কারাগারের সেই বিষণ্ন মলিন চেহারাগুলি, পায়ে রশি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা মানুষগুলি, প্রচণ্ড শাস্তির পরে রক্তাক্ত শরীরগুলি, বেদনাদায়ক আহাজারী ইত্যাদির কথা। তার আরো মনে পড়তে লাগল, সালওয়া ও তার শঙ্কিত ভীতিগ্রস্থ চাহনী, কাঁধে শিশু সাবের, উতওয়া আল-মাওয়ানী, টাকা ভর্তি মানি ব্যাগ, গোয়েন্দাদের সাথে তার অভিনব কাহিনী বর্ষণ, মুখর রাতে রাস্তায় অন্ধ লোকটি, মহান ব্যক্তি ডাক্তার সালেম, মিলিয়ন মিলিয়ন মানুষের ওপর কালো পাখা মেলে দাঁড়ান ভীতি এবং সেই মিথ্যা ও কষ্টকর জীবনের কথা, যা কিনা সবুজ উপত্যকার প্রতিটি অঞ্চলে সব ব্যাপার পরিচালনা করছে, আর শয়তানের দল সেখানে আগুন জ্বালাচ্ছে ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে চলেছে।

আব্দুল আজীজের কণ্ঠস্বরে নাবিলা তার রক্তিম স্বপ্নগুলি থেকে চেতনা ফিরে পেল। সে তাকে বলতে শুনল—মানুষের মধ্যে প্রচারের উদ্দেশ্যে তোমার বিশেষ অভিজ্ঞতাটি লেখা উচিৎ। এতে তোমার অনেক ব্যথারই উপশম হবে।

নাবিলা বলল—সেখানকার আত্মোৎসর্গকারীরা এ লেখা দিয়ে কতটুকু উপকৃত হবে?

—তারা বহু উপকৃত হবে।

—আমার ধারনা, এতে খোদাদ্রোহীরা শাস্তির মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেবে।

—ব্যাপার তো এখন চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। প্রকৃত রহস্যের প্রকাশই এখন জরুরী।

ব্যথিত কণ্ঠে নাবিলা বলল—প্রকৃত রহস্য ঢাকা পড়ে গেছে সন্দেহের আবর্জনা ও মিথ্যা প্রচারের কালো ছায়ার অন্তরালে। তারা ধারণা করেছে আমরা লেখক অভিনেতা ও অভিনেত্রীদেরকে হত্যা করব। পুল, পানির টাঙ্কি, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, সিনেমা হল ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি উড়িয়ে দেব এবং নেতা ও অফিসার বৃন্দকে অপহরণ করব। আমাদের বিরুদ্ধে তারা জাতির যুব সমাজকে ক্ষেপিয়ে তুলছে, আমাদের প্রতি সকল প্রকার অপবাদ নিক্ষেপ করেছে এবং আমাদেরকে ইখওয়ানুস শায়াতীন-নাম দিয়ে ছেড়েছে। হিংসাপরায়ণ ও প্রতারিত উলামাদের দ্বারা ফতোয়া জারি করিয়েছে। আমাদের চারপাশের গণরায়কে তারা বিষাক্ত করে ছেড়েছে। আর এ সব ব্যাপারে তাদের হাতে যে বিরাট ক্ষমতা রয়েছে তার পূর্ণ সদ্ব্যবহার তারা করেছে। আরব ও ইসলামী বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের অসংখ্য পত্রপত্রিকা তারা এ উদ্দেশ্যে খরিদ করে নিয়েছে। আমরা এখন শত্রুতার প্রচণ্ড প্লাবনের সামনা সামনি এসে দাঁড়িয়েছি। তারা আমাদের প্রতি এমন মিথ্যা ধারণাও করছে যে, আমরা আমাদের দেশবাসী খৃষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করে থাকি। তারা আমাদের নেতৃবৃন্দের প্রতি নিকৃষ্ট ধরনের অপবাদ আরোপ করেছে। এ ভয়াবহ অন্ধকারে কিভাবে আমরা বসবাস করতে পারি?

কষ্টের সাথে মৃদু একটু হাসি দিয়ে আব্দুল আজীজ বললেন—আল্লাহ তার মহান গ্রন্থে বলেছেন.........

—কি বলেছেন ?

—বলুন (হে মুহাম্মদ), তোমরা কাজ করে যাও............

আলোচনা দীর্ঘক্ষণ চলল। সর্বশেষে আব্দুল আজীজ তাকে জানাল, তাঁর স্ত্রী সকালে এসে তাকে সংগে করে প্রবাসী শিক্ষয়িত্রীদের বাসস্থলে নিয়ে যাবে এবং নাবিলা তাদের সাথে সেখানে থাকবে। যাতে সে কোন একটি বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষিকা হিসাবে কাজ শুরু করতে পারে। তিনি আরো জানালেন, প্রতি বৃহস্পতি-বারে তার বাড়িতে আসার একটি অনুমতিপত্রও শিক্ষামন্ত্রণালয় থেকে তার জন্যে তিনি নিয়ে রেখেছেন। যাতে সে তার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে ও কিছু মুসলিম বোন যাদের স্বামীরা কুয়েত সরকারের বিভিন্ন দফতর ও প্রতিষ্ঠানে কর্মরত, তাদের সাথে সাপ্তা-হিক ছুটি কাটাতে পারে। সত্যি সত্যিই নাবিলা উল্লেখিত বিদ্যালয়ে তার কর্ম-জীবন শুরু করল।

প্রবাসে নতুন জীবনের শুরুতেই সে তার চলার পথটিকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারল। সে একটি আরবী সমাজে বসবাস করছে ঠিকই, কিন্তু তার রয়েছে এক বিশেষ প্রকৃতি। তার সংগী-সাথীরা তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে তার প্রতি যেসব সতর্কতা ও উপদেশবাণী দান করে তাতে সে মনক্ষুণ্ণ হয়। তারা বলে, এই মেয়েগুলির কোন একটির সাথে তোমার বিরোধ হওয়া উচিত হবে না। এটা অমুকের আর ওটা অমুকের মেয়ে। মারপিট সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কোন প্রকার রাজনৈতিক কথা বার্তার প্রয়োজন নেই। তাছাড়া সামাজিক রীতি-নীতি ও আচার আচরণ সম্পর্কে সব রকম সমালোচনা এড়িয়ে চলবে। মেয়েদের কিছু কিছু বেয়াড়া আচরণ তোমাকে ধৈর্য, সহনশীলতা ও বুদ্ধিমত্তার সাথে মোকাবিলা করতে হবে। তাদের কাউকে তুমি শাস্তি দেবার চিন্তা করবেনা। সব কিছু বিদ্যালয়ের পরি-চালিকাকে জানাবে। প্রশাসনিক কোন ব্যাপারে কোনপ্রকার নাকগলাতে যাবে না। তোমার কর্তব্য হল, বিনাপ্রশ্নে আদেশ পালন। তোমার পেশাগত কাজ ছাড়া অন্য কোন কিছু সম্পর্কে কোন চিন্তা ভাবনা করবেনা। শিক্ষামন্ত্রণালয় যে সিলেবাস নির্ধারন করেছে তাই তুমি অনুসরণ করবে। যা কিছুই ঘটুক না কেন বছর শেষের ফলাফল সম্পর্কে তুমি পূর্ণ দায়িত্বশীল। অন্য যে কোন ব্যাপার থেকে উপস্থিত ও বিদায়ের সময়টি অত্যন্ত পবিত্র মনে করা হয়।

এখানে মিসরী, ফিলিস্তিনী, ইরাকী, সিরীয়, কুয়েতী ও বিভিন্ন জাতি সত্বার পরস্পরের মধ্যে বিরোধ বিদ্যমান। এর কোন কিছুতে তোমার জড়িয়ে পড়া উচিত হবে না। তোমার কোন বান্ধবী তার কোন বান্ধবীর সমালোচনা করলে বা স্কুলের পরিচালিকার নিন্দা করলে তুমি তাতে কোন সায় দেবে না। তুমি সর্বদা সতর্ক থাকবে। তোমার কাছ থেকে যা শুনবে তা তারা উপরের দায়িত্বশীলদের জানিয়ে দেবে। আর তাতে তুমি সমস্যায় পড়ে যাবে। স্কুল পরিচালিকার কোন অনুরোধে কখনো 'না' বলবে না। এমনি ধরনের আরো বহু উপদেশ নাবিলার কানে গেথে দেয়া হল।

সব কিছু শুনে নাবিলা খুবই ভীত-শঙ্কিত হয়ে পড়ল। সে বুঝতে পারল তার মতামত প্রকাশ ও কাজের স্বাধীনতায় নতুন বাঁধন ও শিকল লাগানো হচ্ছে। আর এসব ব্যাপারে পূর্বে সে পরিচিত ছিল না। কিন্তু অধ্যাপক আবদুল আজীজ সীসী, যিনি একটি বিরাট কোম্পানীর ডাইরেক্টর, তিনি ধীরভাবে বললেন--প্রতিটি সমাজেরই একটি বিশেষ প্রকৃতি ও স্বভাব থাকে। আল্লার দিকে আহবানকারী দায়ীকে হতে হয় বিচক্ষণ, তীক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন ও ধৈর্যশীল। প্রতিটি ব্যাপারেই কিছু না কিছু বলার থাকে। সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ উপাদান থেকে কোন সমাজকে তুমি কখনো একেবারেই শুন্য পাবে না, তেমনিভাবে পবিত্র অন্তরের লোকদের থেকেও তোমার নিজের ব্যবহার ও আচরণের দ্বারাই তুমি সবার সম্মান ও ভালবাসা অর্জন করতে পারে। আমরা এখানে কারাগারে বন্দী নই। আমরা বিশ্বের বিভিন্ন মহা-দেশে আল্লার প্রশস্ত জমীনে স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করতে সক্ষম। ক্ষুধায় আমরা মারা যাবনা। আসল কথা হল, আল্লাহ আমাদের কাঁধে যে দায়িত্ব অর্পন করেছেন তা যেন তুমি ভুলে না যাও। কেননা, সে দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে এবং কেবলমাত্র সে জন্যেই আমরা এখানে বসবাস করব। আর আল্লার পথে সব প্রতিবন্ধকতাই তুচ্ছ।

নাবিলা বলল—কিন্তু আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত হবে না, আমাদের মান-মর্যাদা সব কিছুরই ওপরে। আর তা আমাদের বিশ্বাসেরই একটি অংশ।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়।

কুয়েতের কোন প্রকাশনা সংস্থাই নাবিলার 'স্মৃতিকথা' ছাপতে রাজী হল না। নাবিলা অত্যন্ত ক্ষেপে গিয়ে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করল। কিন্তু বন্ধু-বান্ধবীরা তাকে বোঝাল, ব্যাপারটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা উচিত। এখানকার দায়িত্বশীল কর্তা ব্যক্তিরা মিসর সরকারের সাথে ঘোষিত বা অঘোষিত কোন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে চায় না। আর এ রাষ্ট্রের অবস্থান ও প্রকৃতি সেটাই দাবী করে। জুলুম অত্যাচার থেকে পালিয়ে আসা ব্যক্তিদের জন্যে কুয়েত যে তার হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছে এবং তাদেরকে কাজের সুযোগ ও ভায়ের মত সম্মানজনক জীবন যাপনের অনুমতি দিয়েছে এতটুকুই যথেষ্ট। নাবিলাকে তারা আরো জানাল এদের অনেকেই ইখওয়ানুল মুসলিমীনের সমস্যাটির ব্যাপারে গভীর সহানুভূতি-শীল। কিন্তু বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তারা তা প্রকাশ করতে চায় না। তারা নাবিলাকে আরো বললেন যে, কোন বই কুয়েতের বাইরে থেকে, যেমন ধর বৈরুত থেকে প্রকাশ করা সম্ভব। আর সে ব্যাপারে সরকার অনুমতি দেবে। আর এভাবে উদ্দেশ্য সফল হতে পারে।

আবদুল আজীজ জিজ্ঞেস করলেন—বইয়ের কভারে তোমার নাম ছাপাবার ব্যাপারে তুমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ?

—অবশ্যই। লেখকের নাম ছাড়া যে সমস্ত বই প্রকাশিত হয় তা আমি মোটেই মেনে নিতে পারি না।

—তা তোমাকে কিছু বিপদেও জড়িয়ে ফেলতে পারে।

—যা হয় হোক। কোন কিছুকে আমি ভয় করিনে। আল্লার জন্যে আমি আমার

জীবনকে বাজী রেখেছি। ইখওয়ানের প্রথম মুরশিদে আম শহীদ হাসান আল-বান্নার বই-পুস্তক ও ইখওয়ানের আরো বহু বই পড়ার সুযোগ আমার হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে তা থেকে আমি বহু জিনিস আবিষ্কার করেছি। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় যে অভাবনীয় শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে তা ছিল আমার কল্পনার বাইরে। আমাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি আমাদেরকে দ্বীন সম্পর্কে খুব সামান্যই শিক্ষা দেয়। এখন আমার বিশ্বাস জন্মেছে, মধ্যবর্তী ভূমিকা হল, এক প্রকার দুর্বলতা, পলায়নী মনোবৃত্তি ও ঈমানী ত্রুটির পরিচায়ক। হয় সত্যিকার মুসলমান হব, অথবা মুসলিমই হব না। এ কারণে আমি লিখতে ও প্রকাশ করতে চাই এবং পরিপূর্ণ রূপে তার দায়িত্বের বোঝাও বহন করতে চাই। এ ব্যাপারে আমি মৃত্যুকেও পরোয়া করি না।

—এটা ত খুবই উত্তম কথা। কিন্তু তুমি যে দায়িত্বের কথা বলছ তার পরিধি কতটুকু? এ কথা বলতে বলতে আবদুল আজীজ সীসী মাথা ঝাকালো।

—পরিপূর্ণ দায়িত্ব।

—ব্যাপারটি তোমার একার মধ্যে সীমাবদ্ধ হলে খুবই সহজ ছিল। মানুষ তার ঈমান ও বিশ্বাসের জন্যে জীবন কুরবানী করতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে হাজার হাজার মানুষের পরিনতি তোমার কাজ ও কথার সাথে সম্পৃক্ত। এ ব্যাপারেও তুমি ও আমরা সকলেই দায়িত্বশীল।

—তা অবশ্য। এ কথা বলে নাবিলা মাথা নিচু করল।

অনেক দিন হয়ে গেল। নতুন জীবনের নানারূপ প্রতিকুলতা এবং এ দেশে আসার পর থেকে তার জীবন ও চিন্তায় যে পরিবর্তন ঘটে চলেছে তাতেই সে সম্পূর্ণ নিমগ্ন ছিল। সে অত্যন্ত ব্যথিত হয়, যখন তার পিতার অসুস্থতা ও পরিবারের প্রতি উতওয়ার হুমকি ধমকির খবর তার কাছে পৌঁছে। সে তার হতভাগ্য পিতার কথা চিন্তা করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। তিনি হয়ত তার বিচ্ছেদ বেদনায় বিছানায় পড়ে কাঁদছেন, আর অন্তর্জ্বালায় জ্বলেপুড়ে যাচ্ছেন। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, তিনি কখনও কামনা করতেন না, এমন ভয়াবহ অবস্থার ভেতর দিয়ে তার জীবনের সমাপ্তি ঘটুক। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে নাবিলা বলতে লাগল—আমার প্রিয় বাবা। তোমার অপরাধ কি? তোমার এ অবস্থার জন্য আমিই দায়ী, আমিই দায়ী। আল্লাহ আমি এখন কি করব?

নাবিলা শিক্ষিকা হোষ্টেলে একাকী তার রুমে অশ্রু মুচছে। একটা ক্রোধ ও ও বিপ্লবী ভাব তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে। জুলুম-অত্যাচার এমন একটা আগুন যা সব কিছু জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। শিশু-বৃদ্ধ, অপরাধী-নিরাপরাধী, অত্যাচারী ও অত্যাচারিতের মধ্যে কোন পার্থক্য করেনা। মানুষের দৃষ্টি ভঙ্গী ওলট-পালট হয়ে গেছে, পথচিহ্ন অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে, সত্য-মিথ্যা মিলে-মিশে জগাখিচুরী রূপ ধারণ করেছে এবং তার দৃষ্টিতে পৃথিবীটা যেন জনমানব-হীন জঙ্গলে পরিণত হয়েছে, যেখানে চলেছে শুধু ভয়-ভীতি ও বিপর্যয়ের রাম রাজত্ব। নানা কাজের মধ্যে ডুবে থাকা এবং অতীত স্মৃতিচারণ, সাহিত্য, রাজনীতি

ও ইসলামী বই-পুস্তক পাঠের মাধ্যমে তার অবসর সময় কাটানো সত্ত্বেও নাবিলা তার হতভাগ্য পিতার রোগাক্লিষ্ট মলিন চেহারাটি মানসপট থেকে কিছুতেই দূরে সরিয়ে রাখতে সক্ষম হল না। আর সত্যি কথা বলতে কি, ডাক্তার সালেমের ব্যক্তি সত্বাটিও যেন হৃদয়ের সাথে জড়িত হয়ে তার সফর সঙ্গী হয়েছে। এর শেষ যে কোথায় নাবিলা তা জানেনা। তার মৃদু হাসিটুকু বড়ই চমৎকার ও ঈমানী চেতনায় উদ্দীপ্ত, দু'চোখের জ্যোতিতে দৃঢ় প্রত্যয়ীভাব এবং তার কথা খুবই সংক্ষিপ্ত তবে সুস্পষ্ট। ভাবটি এমন যেন সে সকল কিছুর সূচনা, গতি-প্রকৃতি ও পরিনতি জানে ও বুঝে। যেন সে রাজনীতি ও চিন্তাজগতের অজ্ঞাত লাইনগুলি পাঠ করেছে।

সালামের কথা স্মরণ হতেই নাবিলার অন্তরে এমন একটি আস্থা সৃষ্টি হয় যে, সে এমন একজন শক্তিশালী বিশ্বাসী পুরুষ যে কখনো পরাজিত হবে না। এই একটিমাত্র অনুভূতি তার ওপর বিজয়ী হয়ে রয়েছ। নাবিলা মনে মনে বলল, তাকে নিয়ে আমার কোন ভয় নেই, তাকদীরের ফয়সালাকে সন্তুষ্টি, বিশ্বাস ও দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করতে পারে এমন যাদেরকে আমি জানি সে তাদেরই একজন। এ জাতীয় লোকেরা কখনই উতওয়া আল-মালওয়ানী ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের সাথে গাঁটছড়া বাঁধবে না। নাবিলার ভাবনা হয়, কি জানি সেও কোন বিপদের সম্মুখীন না হয়। নাবিলার অন্তর বলছে, একদিন না একদিন সে মুক্তি পাবেই এবং তার সাথে দেখা হবে। তাহলে এটা একটি অঙ্গীকারের রূপ লাভ করবে—শক্ত অঙ্গীকার—লোক কাহিনীর মত। যেন সন্যাসী, দিনে অশ্বারোহী যোদ্ধা। আর এরাই হল প্রকৃত 'সুপারম্যান'। যাদের সম্পর্কে দর্শনের গ্রন্থসমূহে কত কিছুই না বলা হয়েছে। পরিপূর্ণতা ত একমাত্র আল্লারই। কিন্তু সালেম ত নবুওয়াতের ঝর্ণাধারা স্নিগ্ধ করে থাকে। জ্ঞানী মোমেন ও মুজাহিদই প্রকৃত পক্ষে আমাদের এ বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। সালেম! আল্লাহ তোমাকে হিফাজত করুন।

নতুন পরিবেশের সাথে নাবিলা পরিচিত হয়ে উঠল। তার তেমন একটা খারাপ লাগলনা। সে যেন একটু খুশীই অনুভব করতে থাকে। বিশেষত যখন তার নতুন প্রকাশিত বইখানি হাতে এল। বইখানি হাতে নিয়ে একটু গর্বের সাথে তার ওপর লেখা নিজের নামটির দিকে তাকাতে থাকে। তারপর মুখের কাছে উঠিয়ে আস্তে করে তাতে একটু চুমু খায়। যেন সে তার বাবা, মা, ভাই ও বোনদেরকে চুম্বন করছে। বই ও তাদেরই একটি অংশ। তাদের প্রাণ ও প্রজ্ঞারই অংশবিশেষ। একই সাথে এটা এমন একটি চাবুক যা খোদাদ্রোহীদের মাথা ও দেহে আঘাত করতে থাকে। এ যেন তরবারির চেয়েও ধারাল, চাবুকের চেয়েও বেদনাদায়ক। নাবিলা যেন খুশীতে উড়তে থাকে। আর মনে মনে কামনা করে, এমন একটি মুহূর্ত যেন কায়রোর রাজপথে আসে। সে শুধু চলতে থাকবে...... চলতে থাকবে। আর সর্বত্র লোকদের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করে চলবে। তার আশা, এর একটি কপি প্রেসিডেণ্ট ভবনে পাঠায়।

নাবিলা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে লাগল। সত্যি সত্যিই সে কেন

বইয়ের একটি কপি প্রজাতন্ত্রী প্রাসাদে খোদ প্রেসিডেন্টের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছেনা! আর কয়েকটি কপি সে উতওয়া আল-মালওয়ানীর কাছেই বা পাঠাবে না কেন? উতওয়া বেশী কিছু পড়ে না। কিন্তু অবশ্যই সে এই বই পড়বে। কমপক্ষে, তার সম্পর্কে আমি কি লিখেছি তা সে অবগত হবে। চিন্তাটি নাবিলার ভাল লাগল। নিজের কামরায় সে প্রাণখুলে কিছুক্ষণ হাসল। উতওয়া কী বলবে, যখন সে তার ব্যক্তিত্ব, চিন্তা ও ব্যতিক্রমধর্মী কার্যকলাপ সম্পর্কে নাবিলার বিশ্লেষণ পাঠ করবে?

নাবিলা তার স্বচক্ষে দেখা হৃদয়বিদারক ঘটনার কিছুটা হুবহু বর্ণনা করেছে। ইতিহাস সাক্ষী থাকুক, মানুষ পড়ুক। এই প্রথমবারের মত সে উপলব্ধি করল তার কথাগুলির যথেষ্ট মূল্য আছে। যারা তার বইখানি পড়েছে তাদের মাঝে নাবিলা একট দৃঢ়তা ও পরিতৃপ্তি এবং যে সব অত্যাচার-উৎপীড়ন করা হয়েছে তার প্রতি একটা ঘৃণা লক্ষ্য করেছে। চমৎকার ধৈর্যের সাথে প্রায় একটি সপ্তাহ নাবিলা কাটিয়ে দিল। ঘুমাতে গিয়ে তার ঘুম আসছিল না। বইখানি হাতে নিয়ে পড়তে মনোযোগী হল। আবারো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে ফেললো। যেন সে বইখানি সম্পর্কে কিছুই জানেনা অথবা তা যেন অন্য কারো লেখা। বই ও তার মাঝের প্রেম যে এত গভীর হতে পারে তা ছিল তার কল্পনারও বাইরে। কাগজ ও মানুষের মাঝের সম্পর্ক কি এত গভীর হতে পারে? একজন লেখক বা শিল্পী যে কতটুকু আনন্দ ও সৌভাগ্যের মাঝে বাস করে নাবিলা এখন তা বুঝতে পারল। তারা ত নিজ নিজ প্রজ্ঞা ও প্রাণের ফসল নিজের সামনে অথবা মানুষের হাতে বাস্তবে দেখে থাকে।

নাবিলা তার সাপ্তাহিক দেখা-সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আবদুল আজীজ সীসীর বাসস্থানে গেল। তাঁর স্ত্রী যথারীতি আন্তরিকতার সাথে তাকে স্বাগত জানিয়ে একে অপরকে চুম্বন করলেন। বসার পর নাবিলা তার এক কপি বই বের করে নিজ হাতে 'উপহার' কথাটি লিখে তাঁর হাতে দিল। হেসে ধন্যবাদের সাথে তিনি তা গ্রহণ করলেন। তারপর বললেন—আমি পড়েছি। আমার খুবই ভাল লেগেছে। কিন্তু আমাকে খুবই ব্যথিতও করেছে।

—অবশ্যই আমাদের ব্যথিত হওয়া উচিত।

আব্দুল আজীজ অত্যন্ত হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরে প্রবেশ করলেন। বহুদিন থেকে তিনি হৃদরোগে ভুগছেন। সামান্য একটু আবেগ উত্তেজনাতেই ভীষণ শ্বাসকষ্ট ও ব্যথা অনুভব করেন। দীর্ঘদিন যাবত তিনি যে প্রবাস ও ফেরারী জীবন যাপন করছেন তাতে তার শরীরের ওপর যথেষ্ঠ অত্যাচার করছেন এবং নিয়মমত ঔষধপত্র সেবন করতে পারেননি। আর তার ফলেই এ রোগ দেখা দিয়েছে।

নাবিলা ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করল—আপনার কি হয়েছে?

অত্যন্ত কষ্টের সাথে তিনি বলেন—আলহামদুলিল্লাহ। ঔষুধ খেয়েছি, এখনই সেরে উঠব।

—শাফাকাল্লাহ—আল্লাহ আপনাকে রোগমুক্ত করুন।

তিনি নিজের জায়গায় বসেই চোখ মেলে তাকালেন এবং কিছু বলতে গিয়েও আবার চুপ করে গেলেন। নাবিলা তার নিজের মধ্যে একটা চাপা সন্দেহ নিয়ে প্রশ্ন করল—আপনি কি কিছু বলতে চাচ্ছেন?

নাবিলার দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আব্দুল আজীজ বললেন—অস্থির হয়োনা। সাথে সাথে উঠে দাঁড়িয়ে শংকিতভাবে নাবিলা জিজ্ঞেস করল—আমার আব্বা কি ইন্তেকাল করেছেন? তিনি উঠে দাঁড়িয়ে নাবিলার দিকে পিঠ ফিরিয়ে বললেন—তোমার আব্বা ভাল আছেন।

—তা হলে ব্যাপারটি কি?

—মিসরীয় রাষ্ট্রদূত............।

নাবিলা তাঁর দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করল—তার সাথে আমাদের সম্পর্ক কি? আব্দুল আজীজ বললেন—কুয়েতের পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ে সে একটি অভিযোগ পেশ করেছে।

—কেন?

—বই-এর ব্যাপারে।

—নাবিলা চিৎকার করে উঠল—বই?

—হ্যাঁ।

কিছুক্ষণ নিরবতা বিরাজ করার পর আব্দুল আজীজ বললেন—আমার মত ছিল, বই-এর কভারে তুমি তোমার নাম প্রকাশ করবে না।

—এখানে কি মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা নেই?

—নাবিলা, আন্তর্জাতিক রীতি-নীতি আছে, সুনির্দিষ্ট কিছু সম্পর্ক রয়েছে। তা-ছাড়া আরো আছে পরিবেশ পরিস্থিতি। তোমার আমার সে সব মেনে চলা কর্তব্য।

নাবিলার নার্ভগুলি যেন দুর্বল হয়ে পড়ছে। সে কেঁদে ফেলার উপক্রম করল; কিন্তু মুহূর্তে নিজেকে সংবরণ করে নিল।

আব্দুল আজীজ বললেন—বইটি তোমার লেখা, একথা প্রমাণিত হলে তারা তোমাকে দেশ ত্যাগের নির্দেশ দিতে পারে।

প্রতিবাদের সুরে নাবিলা চেঁচিয়ে বলে উঠল—অসম্ভব।

এবার আব্দুল আজীজ কণ্ঠে কিছুটা নম্রতা মিশিয়ে বলতে লাগলেন—তল্লাশী চালালে বই খানি যে তোমার রচনা এ কথা তুমি অস্বীকার করতে পারবে। আর এটা আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করবে। সৌভাগ্যবশত বইখানি এখানে ছাপা হয়নি, বরং তা লেবাননে ছাপা হয়েছে। লেবাননের প্রকাশকও আমাদের বন্ধু। এ ব্যাপারে সেও আমাদের সাহায্য করতে পারবে। কেউ তার একটি পশমও ছিঁড়তে পারবে না। কেননা, সেখানকার প্রকাশকরা সম্পূর্ণ স্বাধীন।

ঘামে নাবিলার ললাট ভিজে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় সে বলল—কিন্তু আমি ত প্রেসিডেন্ট ও উতওয়া আল-মালওয়ানীর কাছে একটি করে কপি পাঠিয়ে দিয়েছি।

বিস্ময়ের সাথে তার দিকে ফিরে আব্দুল আজীজ বললেন—অসম্ভব।

—না, বরং যা ঘটেছে তাই।

—তুমি বিরাট ভুল করে ফেলেছ। এখানে আমরা স্বতন্ত্রভাবে কেউ কোন কাজ করতে পারি না। ইখওয়ানীরা এখানে সুসংগঠিত এবং তাদের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন। সুনির্দিষ্ট রাজনীতির আওতার বাইরে গিয়ে কারো কোন কাজ করা উচিৎ নয়। যাতে এ ছোট্ট ভূখণ্ডটিও আমরা হারিয়ে না ফেলি যেখানে আমরা বস-বাস করছি। ব্যাপারটি খুবই সূক্ষ্ম ও স্পর্শকাতর। তুমি একটি সমস্যায় ফেলে দিয়েছ আমাদেরকে।

—সৎ উদ্দেশ্য সত্বেও যে অন্যায় আমি করে ফেলেছি তার জন্যে ক্ষমা চাচ্ছি। আর ভবিষ্যতে নিয়ম শৃংখলা পূর্ণভাবে মেনে চলার অঙ্গীকার করছি।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে আবার সে বলতে থাকল—যদি এদেশ ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ দেয় তাহলে আমি কী করব?

—তুমি শান্ত থাক। আমরা সবকিছুই ঠিক করে ফেলেছি। আল্লাহ না করুন, তেমনটি যদি ঘটেই যায় তাহলে তুমি সৌদি আরবে চলে যাবে। সেখানেও তুমি বহু নিষ্ঠাবান ইখওয়ানী ভাই-বোনদের পাবে। অথবা তুমি লেবাননে যাবে। তোমার সব ব্যবস্থাই আমরা করে দেব।

আবেগভরে নাবিলা কেঁদে উঠল। তারপর দু'চোখের অশ্রু মুছতে মুছতে সে বলে চলল—আপনাদের সাথে থাকতে পেরে আমি ধন্য হয়েছিলাম। আপনারাই আমার পরিবার-পরিজন এবং আপনারাই আমার ভবিষ্যৎ। আপনাদের মাঝে এসেই আমি আমার জীবনকে উপলব্ধি করতে পেরেছি। আপনাদের জগৎটি হচ্ছে সেই কল্যাণ নগরী যার স্বপ্ন আমি দেখে থাকি।

আবদুল আজীজ মুখে একটু মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়ে বললেন—ব্যাপারটি এখনো ততখানি খারাপ পর্যায়ে পৌঁছেনি। আমরা একটা সমাধান হয়ত পেয়ে যাব। তারপর হঠাৎ তিনি হাত দিয়ে কাছে একটি বালিশে আঘাত করে প্রশ্ন করলেন—কায়রোয় যে কপিটি পাঠিয়েছ তাতে তোমার হাত দিয়ে কোন কিছু লিখেছ?

নাবিলা কিছুক্ষণ চিন্তা করল। তারপর বলল—না।

—ঠিকানা?

—টাইপের সাহায্যে লিখেছি। প্রেসিডেন্টের কাছে প্রেরিত কোন কিছুর ওপর হাত দিয়ে লেখা সমীচীন নয়।

আবদুল আজীজ মৃদু হেসে বললেন—এটাও আল্লার একটি বিরাট করুণা। ভবিষ্যতেও তিনি এভাবে আমাদেরকে অনেক সাহায্য করবেন।

—আপনি কি তাই মনে করেন?

তিনি কাঁধ একটু দুলিয়ে বললেন—আল্লার ওপর ভরসা রাখা আমাদের উচিত। এখানেও অনেক কল্যাণধর্মী উপাদান আছে, যারা বিভিন্নভাবে আমাদের সাহায্য-সহযোগিতা করে থাকে।

আক্ষেপের সুরে নাবিলা বলে উঠল—তারা আমার খুশিটাকেই মাটি করে দিয়েছে।

আর একটি ট্যাবলেট গিলতে গিলতে আবদুল আজীজ বললেন—পথ বড় দীর্ঘ ও কণ্টকাকীর্ণ, আল্লাহ আমাদেরকে সত্যের উপর অবিচল থাকা ও বিপদে ধৈর্য ধরার ক্ষমতা দান করুন।

নাবিলা তার ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে আল্লার কাছে সমর্পন করল এবং কি ঘটে তাই দেখার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। সে জানতে পেল, ইখওয়ানের সাথে সম্পর্কিত একজন মিসরী খুব শিগগিরই কায়রো যাবে এবং এক সপ্তাহ পরেই আবার ফিরে আসবে। সে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি এবং ইখওয়ানের প্রতি তার ঝোঁক প্রবনতার কথা নিরাপত্তা বিভাগও জানে না। নাবিলাকে জিজ্ঞেস করা হল কায়রোয় তার কোন কাজ আছে কিনা। সাথে সাথেই তার সালওয়া ও সাবেরের কথা মনে পড়ল। আবদুল আজীজের কাছে বিষয়টি খুলে বলল—তাঁকে বুঝাল যে সে তার হতভাগ্য বান্ধবীটির নিকট কিছু জিনিসপত্র পাঠাতে এবং তার অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে চায়। এরপর সে আবদুল আজীজের কাছে জিনিসপত্র ও ঠিকানা দিল। সাথে সাথে সে তার মা-বাবা ও পরিবার-পরিজন সম্পর্কে সঠিক সংবাদ জানতে চাইল। কেননা, তার পিতার পীড়িত হবার কথা শুনে সে বড় দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। তাছাড়া পরিবারের ঘাড়ের ওপর অস্ত্র রেখে ভয়-ভীতি দেখান ও ধমকি প্রদানের সংবাদ শুনেও সে বিচলিত হয়ে পড়েছে।

২৫

'নাবিলা, তোমার জীবন-আকাশে ঘন কালো মেঘ নতুন করে জমা হচ্ছে। ওরে হতভাগিনী, তোমার পায়ের তলার মাটি কেঁপে কেঁপে উঠছে। যেন মাটির নীচের কোন আগ্নেয়গিরি এখনই ফেটে পড়বে। নাবিলা তোমার ঘুমও কমে গেছে। সে ঘুমও নানা দুঃস্বপ্নে পরিপূর্ণ, যা জীবনী ও প্রাণ শক্তিকে নিঃশেষ করে দেয়। জগতটা প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে, কোন প্রকার শান্তি ও আনন্দ নেই। নাবিলা মিলিয়ন মিলিয়ন বই-পুস্তক বাজার-ঘাট তলিয়ে দিয়েছে ; তার অধিকাংশের মধ্যে কোন প্রকার আন্দোলন বা প্রাণচাঞ্চল্য নেই। সেগুলির অক্ষরের ওপর একটা ভীতি যেন দৈত্যের ন্যায় দাঁত বের করে দাঁড়িয়ে আছে। নাবিলা, এ বিশ্বে শক্তিমানেরা হল দুষ্ট লোকের একটি দল। তারা যেন কল্যাণ, ন্যায়বিচার ও নৈতিকতার বিরুদ্ধে পাশবিক যুদ্ধের জন্যে পরস্পর চুক্তিবদ্ধ! আর শয়তান তাতে ইন্ধন যোগাচ্ছে। নতুন করে জন্ম নেয়া ছাড়া এ পৃথিবীর তা থেকে কোন ভাবেই মুক্তি নেই।'

যে কঠিন পরীক্ষাটি নাবিলার জীবনকে শঙ্কিত করে তুলেছিল, তার পরেই সে আপন মনে এ কথাগুলি বলছিল। পরদিন আবার সে আবদুল আজীজ সীসীর কাছে এসে বলল—মনে হচ্ছে, আমি এমন এক বিশ্বে বাস করছি যা আবার জাহেলিয়াতের যুগে ফিরে গেছে। এর জন্য একজন নতুন নবীর প্রয়োজন।

স্বভাবসুলভ মৃদু হেসে আবদুল আজীজ বললেন—সে নবী এসে মানব জাতিকে কি বলবেন ?

—প্রকৃত সত্য যা তাই বলবেন।

—আস্তাগফিরুল্লাহ। প্রকৃত সত্য ত আল্লার কিতাবে রয়েছে। আর তা-ই মানব জাতির জন্যে সর্বশেষ বাণী। মুহাম্মদ(স)এর সুন্নাতই হল তার ব্যাখ্যা। তবে এতটুকু বলা যায়, মানুষ এ ব্যাপারে জাহেল ও উদাসীন। এখন তাদের সেই স্বচ্ছ ঝর্ণাধারার দিকে প্রত্যাবর্তন করা উচিৎ। যা সত্য ও ঈমানের সৌরভে আমোদিত।

নাবিলার শিরা উপশিরাগুলি যেন শক্ত হয়ে উঠল। সে আঙ্গুলের মধ্যে আঙ্গুল ঢুকিয়ে অনুচ্চকণ্ঠে বলল—প্রথম সমস্যাটিই হল স্বাধীনতা।

—না, বরং ইসলাম।

—আমরা তার দিকে মানুষকে কিভাবে ডাকব ? আমরা ত প্রাচীর, অস্ত্র ও রাজনীতির কুটজালে আবদ্ধ! আবদুল আজীজ বললে—তুমি তোমার বান্ধবী, ছাত্রছাত্রী ও পরিবার পরিজনকে ডাকবে। কোন কথা না বলেও তুমি একাজ করতে পার।

—কি ভাবে ?

—বোন নাবিলা, আচার-ব্যবহারের দ্বারা। ইসলামী দাওয়াতের সঠিক আচার-আচরণই হল সর্বোৎকৃষ্ট প্রচার মাধ্যম।

—আর বাক্য ?

—সঠিক সময়ে উপযুক্ত পদ্ধতিতে অবশ্যই তুমি বলবে।

নাবিলা একটু জোরের সাথে বলল—স্বাধীনতা পেলে প্রতিটি মানুষ নিজ নিজ বক্তব্য তুলে ধরতে পারবে। বিশেষত আমাদের সামনে দাওয়াতের পথ খুলে যাবে। নাবিলার ধারণা, প্রাথমিক যুগের মুসলমানরা যে সব যুদ্ধ করেছে তা কেবল মানুষের মুক্তি ও স্বাধীনতার জন্যে, যাতে তারা স্বাধীনভাবে আল্লার বাণী শুনতে পায়। তারপর তাদের ঈমান আনা বা না আনার অধিকার থাকবে। লা ইকরাহা ফিদ্বীন—দ্বীনের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই।

নাবিলার কথায় সন্তুষ্ট হয়ে আবদুল আজীজ বললেন—তোমার কথা খানিকটা সত্য। তবে আমরা যে স্বাধীনতা চাই, অবশ্যই তার একটা সীমা থাকবে। অর্থাৎ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তা হবে ইসলামী চিন্তা ও ধ্যান-ধারণার আলোকে।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে আবদুল আজীজ আবার বললেন—যখন আমরা স্বাধীনতার কথা বলি, মানুষ তখন আমাদেরকে প্রশ্ন করে, কোন স্বাধীনতার কথা তোমরা বলছ ? পুঁজিবাদী বিশ্ব স্বাধীনতার কথা বলে, কম্যুনিষ্ট বিশ্ব স্বাধীনতার বুলি কপচায়, এমন কি ইহুদীরাও স্বাধীনতার জন্য মায়াকান্না কাঁদে। স্বাধীনতা ত প্রতিটি দেশে, প্রতিটি স্থানে। আমার স্নেহের বুদ্ধিমতি বোন, এভাবে তুমি দেখতে পাবে, স্বাধীনতা শুন্যে গজায় না। এ হচ্ছে সমষ্টির একটা অংশ। এ হচ্ছে, একটা চিরন্তন আদর্শ অথবা চিন্তাবিশ্বাসগত একটা পরিপূর্ণ ইমারতের বৈধ ফসল। এ ঘরে প্রবেশের সিংহ দরজাটি হল ঈমান।

নাবিলা উঠে দাঁড়িয়ে বলল—শত্রুরা চাবুক ও বন্দুক নিয়ে আমাদের সামনে প্রতিরোধ সৃষ্টি করছে, এ অবস্থায় আমরা মানুষকে কিভাবে দাওয়াত দেব?

—হিকমাত ও উত্তম উপদেশ দ্বারা।

—নাবিলা বলে উঠল—হিকমাত কার সাথে? খুনী ও রক্ত পিপাসুদের সাথে?

—হ্যাঁ সবার সাথে।

—তাহলে ইসলাম তরবারির কথা বলছে কেন?

—আল্লার নির্দেশে ও বিশেষ অবস্থায়।

নাবিলা বলে উঠল—অপারেশন ছাড়া ক্যানসারের কোন চিকিৎসা নেই।

আবদুল আজীজ হেসে উঠে বললেন—কখনও রেডিয়াম বা শেক দিয়েও তারা ক্যানসারের চিকিৎসা করে থাকে।

—এর আসল চিকিৎসা হল অপারেশন।

—তা সত্য, তবে উদ্দেশ্য হল রোগীকে সুস্থ করে তোলা।

—আমি চাই ক্যান্সারের মূল উপড়ে ফেলতে।

—বুঝি। তবে তা চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কিসাসের এই ধারণার গণ্ডিতে হতে হবে।

নাবিলাকে কুয়েতে রাখার ব্যাপারে আপ্রাণ চেষ্টা চালান হচ্ছে এবং তার দেশ ত্যাগের সমস্যাটি বিভিন্ন মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা চেষ্টা চলছে। ফলাফল জানার জন্যে নাবিলা অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান। কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তার মনে আনন্দের জোয়ার বয়ে এনেছে। তা হল, তার বই। বইখানি এমন বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছে যে তা তার ধারনাতীত। বিস্ময়কর দ্রুততার সাথে তার বিক্রী শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণ ও অধিক সংখ্যক ছাপানোর অনুমতি চেয়ে প্রকাশক পত্র লিখেছেন। যথাযথ গুরুত্বের সাথে পাঠকরা নাবিলার কথাকে গ্রহণ করেছে। মানুষ আসলে প্রকৃত সত্যের জন্য তৃষ্ণার্ত। এ কথাও অবশ্য অনস্বীকার্য যে কিছু লোক তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে এবং বইখানির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের চেষ্টা তদবীর করেছে। তার প্রতি তারা সত্যকে বিকৃত করার অভিযোগ এনেছে। সে নাকি সস্তা বাহবা কুড়ানোর উদ্দেশ্যেই এমন কল্পনা বিলাসী হয়ে উঠেছে। এমন কি বৈরুত, কুয়েত অথবা সিরিয়ার কিছু পত্র-পত্রিকা তার বিরুদ্ধে ভীষণ আক্রমণ চালিয়েছে। কোন কোনটি ত তাকে খিয়ানত ও গোয়েন্দাগিরির অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে। তাদের ধারণা একটা বড় বিদেশী শক্তি তার পেছনে কাজ করছে। মিসরের মহান নেতা ও তার পরিষদের সুনাম নষ্ট করার কাজে তাকে নিয়োগ করা হয়েছে। প্রথম প্রথম নাবিলা একটু মনক্ষুণ্ণ হলেও সে বলত—এই যারা আমার বিরোধিতা করছে, হয় এরা ভাড়াটিয়া না হয় প্রতারণার শিকার। সব চেয়ে অভিনব ব্যাপারটি হল, তাদের কেউ তাকে দেশ থেকে বহিস্কারের দাবী জানিয়েছে। কারণ সে নাকি আতিথ্যের মূলনীতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেনি, এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও কূটনৈতিক রীতি-নীতির প্রতি

বৃদ্ধাংগুষ্ঠ দেখিয়েছে। সমালোচনার তুফান এভাবেই বয়ে চলছিল। নাবিলা তাদের প্রতিবাদ করার চিন্তা করল। সে চাইল তাদের বক্তব্যগুলি এক এক করে পাল্লায় ওজন করে দেখিয়ে দেয়। কিন্তু উস্তাদ আবদুল আজীজ সীসী তাকে পরামর্শ দিলেন ধৈর্য ধারণ করতে। কেননা, আত্মপক্ষ সমর্থনের একমাত্র পথ হল, বইটি তার, একথা অস্বীকার করা। তাহলে তারা তাকে দেশ থেকে বহিস্কারের বিশেষ পদক্ষেপ থেকে বিরত হতে পারে। আবদুল আজীজের চিন্তা হল, যেভাবেই হোক নাবিলাকে দেশ থেকে বহিস্কারের আদেশ থেকে বাঁচান আর এ ব্যাপারে বিশেষ কোন ভুল-ভ্রান্তি আছে বলে তিনি বিশ্বাস করেন না। বিশেষ করে বইখানি যখন প্রকাশ হয়েছে এবং উদ্দেশ্যও পূরণ হয়ে গেছে। আর নাবিলার কথা হল, যত কঠিন মূল্যই দিতে হোক না কেন সব সময় সত্য বলাই উচিত। যত-টুকু ত্যাগ বিপদাপদ ও দায়িত্ব আল্লাহ তার জন্যে নির্ধারণ করে রেখেছেন, সাহসি-কতার সাথে তা গ্রহণ করা তার কর্তব্য। আর এ জন্য সব রকম চাপ, দলন-পীড়ন, ভয়-ভীতি ও আচরণের তাকে মোকাবেলা করতে হবে। কারণ, যারা ভীত বিজয় তাদের জন্যে নয়। তাই নাবিলা একটু তীক্ষ্ম ভাবেই বলল—ওস্তাদ, আবদুল আজীজ, মাফ করবেন, এখানে আমরা খাচ্ছি সেব, চড়ছি মার্সিডিজে, পরছি আমদানীকৃত সর্বোৎকৃষ্ট কাপড়, আর ভয় পাচ্ছি আমাদের পদমর্যাদা, ধন-সম্পদ ও সামাজিক আশা আকাঙ্খার। তারপরও ধারণা করছি, আমরা সংগ্রামে লিপ্ত আছি।

অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে আবদুল আজীজ বললেন—সংগ্রাম ও সংঘাতের কর্তব্য আমরা পালন করব। তারপর পানাহার ঘুম ইত্যাদিতে কোন দোষ নেই। জীবন এখানে চলমান, সংঘাতও বিদ্যমান। যদি এক লোকমা আহার ও সামান্য কিছু পরিধানের প্রয়োজন পরে তাই আমরা করব। এখানে এমন কতগুলি দিক রয়েছে যার প্রতি আমাদের যত্নবান হওয়া উচিত। বিশেষ করে আমাদের রয়েছে একটি সংগঠন, যার আদেশ নিষেধ আমাদের মেনে চলা কর্তব্য

আগুনের উত্তাপে স্বর্ণ যেভাবে নিখাদ হয়ে যায় তেমনি ভাবে নাবিলা তার সকল দ্বিধা দ্বন্দ্ব দুশ্চিন্তা ও ব্যথা-বেদনা থেকে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে এল। সে কাকেও আর ভয় করে না। সে এখন সৌভাগ্যবতী। সংগ্রামে সে আনন্দ পায়। এর বিনিময়ে সে তার সুখ-শান্তি, ভবিষ্যৎ এমন কি জীবনও বিলিয়ে দিতে পারে। আত্মত্যাগ, যদি তা কেবল মাত্র আল্লার জন্য হয় তাহলে তা বড়ই আনন্দদায়ক। আর রেযেক আল্লার হাতে, মৃত্যুও নির্ধারিত। কোন মানুষের মরণ উপস্থিত হলে আল্লাহ কখনো তা পিছিয়ে দেন না।

একদিন পত্রিকা পড়তে গিয়ে আবদুল আজীজ ত বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন একটি পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় নাবিলার ছবি এবং পত্রিকা-প্রতিনিধির কাছে দেয়া তার দীর্ঘ বিবৃতি। ভয়ে তার অসুস্থ শরীর কেঁপে উঠল, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল এবং তিনি একটু শ্বাস কষ্টও অনুভব করলেন। এক নিশ্বাসে

লাইন গুলির ওপর নজর বুলালেন। কিছু পড়লেন, কিছু উপেক্ষা করলেন। আরে আল্লাহ, নাবিলা বলে কি!

'সেই হাজার হাজার হতভাগ্যদের একজন আমি। আমি ইখওয়ানুল মুস-লিমীনেরও কেউ নই। আমি আহ্বান জানাই বিপ্লবকে সমর্থনকারী আরব বিশ্বের বিচারকমণ্ডলী ও আইনজীবীদের প্রতি, তারা মিসর সরকারের কাছে তাদের একটি প্রতিনিধিদল পাঠাবার অনুমতির প্রার্থনা করুন, যারা সেখানকার বিভিন্ন কারাগারে আটক বন্দীদের অবস্থা বিশেষ করে সামরিক কারাগার ও 'কিলয়ার' কারাগারের বন্দীদের অবস্থা সরেজমিনে দেখে আসবেন। আমি চ্যালেঞ্জ করতে পারি, মিসর সরকার এ দাবী মেনে নিতে পারে না। আমি এমনেষ্টি ইণ্টারন্যাশ-নাল ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার কাছেও এব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার ও প্রকৃত সত্যকে মানুষের সামনে তুলে ধরার আবেদন জানাই। বিষয়টি কেবলমাত্র ইসলামী দাওয়ার নয়; এটা মহান মানবতার বিষয়। সরকারী পত্র-পত্রিকা ও প্রচার মাধ্যমগুলিতে যা কিছু বলা হয় তা আপনারা বিশ্বাস করবেন না। আমি কোন কিছুকেই ভয় করিনা। আমার বিশ্বাস, আমার কলম ও আমার কিছু তিক্ত অভিজ্ঞতা ছাড়া আমার আর কিছুই নেই। আল্লার যমিন খুবই প্রশস্ত। আমি আমার জীবনকে আল্লার জন্যে উৎসর্গ করে দিয়েছি। আমার এ বিশ্বাসের সাথে যা কিছুই আসুক না কেন সব কিছুকেই আমি বরণ করে নেব। ব্যাপারটি কেবল মাত্র আমার ব্যক্তি সত্তা ও দেশের সাথে সম্পর্কিত নয়। ইসলাম আমাদের দ্বীন ও ধর্ম। শত্রুদের সাথে আমাদের যে বিবাদ তা খুবই মারাত্মক পর্যায়ের। আমরা আরব তথা ইসলামী বিশ্বের শত্রুদের সাথে চুড়ান্ত যুদ্ধে কখনো লিপ্ত হতে পারব না যতক্ষণ না আমরা একটি ভদ্র, আত্মমর্যাদাশীল, স্বাধীন ও ঈমানদার জাতি হিসেবে গড়ে উঠতে পারব। আর বিশ্বের যে কোন স্থানের সন্ত্রাসবাদীরা কোন আত্মমর্যাদা সম্পন্ন মানুষ সৃষ্টি করতে পারে না। তারা শুধু জন্ম দেয় কাপুরুষ, কপট ও স্বার্থপর লোকদের। আর তারাই আমাদের ইসলামী সমাজে বিপর্যয়, অনৈতিকতা ও মহান মূল্যবোধের অপমৃত্যুর জীবানু ছড়িয়ে থাকে। সুযোগ হাতছাড়া হবার আগেই মানব জাতির কাছে আমার এ আহ্বান। আমিই এ গ্রন্থের রচয়িতা। জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও বিশ্বাস নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের কাছে আমার আবেদন, বিশ্বের প্রতিটি স্থানে মানুষের অধিকার অর্জনের সংগ্রাম করুন এবং তা হরণ করার সকল প্রকার অপচেষ্টা ও সব ধরনের একনায়কত্বের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। আপনারা সত্য ও ন্যায়ের সাহায্যকারী হোন।

তিনি পড়ছিলেন, তাঁর হাত কেঁপে কেঁপে উঠছিল। চোখ পানিতে ভরে যাচ্ছিল। নাবিলা সত্য কথাই বলছে। সে আমাদের সকলের থেকে সাহসী। সত্যি সত্যিই আমরা সেব খাই, মার্সিডিজে চড়ি, মন্ত্রী, ও পদস্থ ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখি, নাম গোপন করে কিছু বই-পুস্তক প্রকাশ করি এবং শহীদ ও কারাগারে আটক ব্যক্তিদের পরিবারবর্গের জন্যে কিছু টাকা-পয়সা পাঠাই। কিন্তু ব্যাপারটির ত এখানেই শেষ নয়। তিনি উপলব্ধি করেন, নাবিলা সত্যের

ওপর আছে ; আর আমরা আমাদের সংগ্রামকে একটা সীমিত গণ্ডিতে আবদ্ধ করে ফেলেছি।

এত কিছু সত্ত্বেও পরের দিন কিছুটা নাখোশ ভাবে তিনি নাবিলাকে স্বাগত জানিয়ে বলেন—তোমার ব্যক্তিগত আচরণ ক্ষতিকর। আর এটা সাংগঠনিক নিয়মনীতি লংঘণের শামিল। নাবিলা বলল—আমার উপর সংগঠনের কিছু অধিকার আছে। কিন্তু এখানে আমার কিছু ব্যক্তিগত ব্যাপারও রয়েছে।

—তুমি কি বোঝাতে চাও?

—আমি আমার জীবনের মালিক। আমি তা আল্লার জন্যে উৎসর্গ করেছি। 'তুমি চলে যাও' তাদের একথা বলার পূর্বেই আমি চলে যাব।

বিমর্ষভাবে আবদুল আজীজ বললেন—তারা তোমাকে অপহরণ করে অন্য কোথাও নিয়ে যাবে। বৈরুত বা ইউরোপের অন্য কোথাও। আর তাদের গোয়েন্দার জাল সর্বত্র ছড়ানো রয়েছে। অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে নাবিলা বলল—তা করুক।

—এটা এত সহজ সিদ্ধান্ত নয়। আমাদের সকলের সমস্যা এক। আর এ সময়ে প্রাণের নিরাপত্তা খুবই প্রয়োজন। প্রতিবাদের সুরে নাবিলা বলল—কিন্তু তারা ত খুব সহজেই কারাগারে বন্দীদের নির্দয় ভাবে হত্যা করেছে।

—কিন্তু আমরা ত এখানে কারাগারে নই। আমাদের কণ্ঠ সেই সব বন্দী ভদ্র সন্তানের পক্ষে সোচ্চার। বিষয়টি এর থেকেও কিছু বেশী দাবী করে। বিশ্বের ইতিহাসে রক্তপাতহীন কোন যুদ্ধের কথা অথবা আত্মত্যাগহীন কোন বিজয়ের কথা কখনো আমি শুনিনি বা পড়িনি। ভীতি ও শঙ্কাই হল সকল আশা- আকাংখার কবর।

আব্দুল আজীজ দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন নাবিলার দিকে। প্রথম তাঁর চেহারায় একটা গাম্ভীর্য ও অবিচল ভাব বিরাজ করছিল। তারপর ধীরে ধীরে তা দূরীভূত হয়ে ঠোঁটে মৃদু হাসি দেখা গেল। এরপর জোরে, আরো জোরে হেসে উঠলেন।

নাবিলা জিজ্ঞেস করল—কি হয়েছে?

চোখ মুছতে মুছতে তিনি জবাব দিলেন—তুমিই সত্যের ওপরে।

কিছুক্ষণ নিরব থেকে একটি ট্যাবলেট বের করলেন। দ্রুত সেটা মুখে পূরে দিয়ে এক মগ পানি পান করলেন। তারপর আল্লার শুকরগুজারী করে বললেন বড় বড় দায়িত্বগুলি আমাদের সক্ষম পুরুষরাই কাঁধে তুলে নিয়েছে।

—মেয়েরা কেন তাদের সাথে অংশ গ্রহণ করবে না?

—প্রত্যেকেরই একটা স্বতন্ত্র ভূমিকা আছে, তোমার কাছে সব কিছু ব্যাখ্যা করার সময় এখনো আসেনি। একথা সত্য, আমরা সেব খাই, মার্সিডিজে চড়ি কিন্তু...।

তাঁর কথা শেষ না হতেই মাঝখানে নাবিলা বলে উঠল—আমি দুঃখিত। সমালোচনার উদ্দেশ্যে কথাগুলি আমি বলিনি। ভাবাবেগে আমি কথাগুলি বলেছি।

—না, না, দুঃখিত হবার কিছু নেই। আমরা চাই সব সময় তুমি তোমার আবেগের ওপর ক্ষমতাবান থাকবে। নানা ঘাত-প্রতিঘাত আমাদের সতর্কতা শিক্ষা

দিয়েছে। আমাদের তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদেরকে বহু জ্ঞানে সমৃদ্ধ করেছে। আজ যদি আমরা সেব খাই ও মার্সিডিজে চড়ি, তাহলে তোমার ভুলে গেলে চলবেনা যে, এক সময় আমরা ত শুকনো গমের দানা, মরুভুমির পোকা মাকড় খেয়ে ফিলিস্তীনে ইহুদীদের সাথে ও সুয়েজ খালের তীরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। খালি পায়ে কাঁটার ভেতর দিয়ে চলে আমাদের পা কে রক্তাক্ত করেছি, প্রচণ্ড শীতের রাতে নদীতে সাঁতার কেঁটেছি। তখন প্রতি মুহূর্তেই মৃত্যু আমাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে ছিল।

নাবিলার চোখ দু'টি পানিতে ভরে গেল। মৃদু হেসে আব্দুল আজীজ বললেন, তুমি কি আল্লার এ বাণী পাঠ করনি? বল, কে তোমাদের জন্য হারাম, করল আল্লার এ সৌন্দর্য উপকরণ এবং হালাল রিযিকসমুহ, যা তিনি সৃষ্টি করেছেন তার বান্দাদের জন্য?

তাঁর চেহারা মলিন হয়ে গেল। একটু সংযত হয়ে তিনি আবার বললেন—তুমি আমার সহধর্মিনী উম্মে উসামাকে জিজ্ঞেস করে দেখ। একদিন রাতে আমি আমার বিছানাটি বড় কোমল ও আরামদায়ক বলে অনুভব করলাম। আমার স্মরণ হল, সেই সব ভাইদের কথা যায়া এখন কারাগারের মেঝেতে গড়াগড়ি করছে, মুসুরের ডাল ও শুকনো রুটি চিবুচ্ছে। সংগে সংগে আমি বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠলাম এবং আমার অসুস্থ শরীরটিকে কামরার মাটিতে এলিয়ে দিলাম। কেন আমরা তাদের মত হতে পারিনা? কিন্তু হায়! আমি কী বলব! এমন অনেক কিছুই আছে যা প্রকাশ করা যায় না। মেঝেতে আমার ঘুমের মোটেই ব্যাঘাত হল না। তাদের মতই আমি সকালে জেগে উঠলাম। এ ছাড়া এমন অনেক কিছুই আছে যা কেবলমাত্র কারাগারে বন্দীরাই অনুভব করতে পারে, যারা প্রতিটি মুহূর্ত মৃত্যুর কালো পাখার নীচে ভয়-ভীতি ও অসহ্য ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মধ্যে অতিবাহিত করে থাকে। এ ব্যথা বেদনার অংশীদার আমরা কি ভাবে হতে পারি? যখন আমরা পরিবার-পরিজনদের মাঝে বাস করি। আমাদের পকেটে থাকে টাকা-পয়সা, পরিপূর্ণ স্বাধীনভাবে ঘুমাতে ও জেগে থাকতে পারি আর আমরা আমাদের সন্তানদের চুমা দিতে এবং আমাদের বন্ধুদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করতে পারি?

দুঃখের সাথে নাবিলা মাথা নীচু করেবলল—আবারো আমি দুঃখ প্রকাশ করছি।

—তোমার কোন দোষ নেই। স্পষ্টভাবেই আমাদের কথা বলা উচিত। বই-পুস্তক পড়ে এবং বহু অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অনেক কিছুই আমি আমার জীবনে শিখেছি। কিন্তু তুমি নিজেই এমন একটি নতুন ও জীবন্ত অভিজ্ঞতা যা যে কোন পুঁথিগত বিদ্যা থেকে অধিকতর শক্তিশালী। তোমার কাছ থেকে আমি অনেক কিছুই শিখলাম!

লজ্জিত হয়ে নাবিলা বলল—ক্ষমা করবেন।

—এটাই সত্য কথা।

এ সময় পত্র-পত্রিকায় নাবিলার ব্যাপারটি আকর্ষনীয় বিষয় হয়ে দাঁড়াল। অনেকে তার মতামতকে সমর্থন করল, আবার অনেকে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় এর

প্রতিবাদ জানাল। কেউ কেউ তাকে দেশ থেকে বহিস্কারের দাবীও তুলল। প্রকৃত পক্ষে উস্তাদ আব্দুল আজীজ সীসী তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা ও কিছু উচ্চ পদস্থ সৎ লোকের সাথে তার গভীর সম্পর্কের দ্বারা একটি মধ্যবর্তী সমাধানে উপনীত হতে সক্ষম হলেন। তাঁরা ঐক্যমতে পোঁছলেন, এক মাসের জন্য নাবিলা অন্য কোথাও চলে যাবে এবং সরকারীভাবে সে সম্পর্কে ঘোষণা দেওয়া হবে। তারপর কোন প্রকার হৈ চৈ বা ঘোষণা ছাড়াই গোপনে সে নতুন করে প্রবেশ করবে। সত্যি সত্যিই ইখওয়ানের পরামর্শ অনুযায়ী নাবিলা তুরস্কের ইস্তাম্বলে চলে গেল।

২৬

'মানিয়াতুল বান্দারাহ্' গ্রামটি একটি ছোট্ট শহরের মত। সবুজ মাটিতে যেন শুয়ে আছে গ্রামটি। একটি রেল লাইন গ্রামটির বুক চিরে এদিক থেকে ওদিকে বেরিয়ে গেছে। এর অধিবাসীরা খুবই শান্তশিষ্ট ভালো মানুষ। মিসর উপত্যকার হাজারো গ্রামের মত তারা কৃষিকাজ ও পশুপালন করে জীবিকা নির্বাহ করে। এখানে অধিকাংশ মানুষ একই পরিবারের মত বসবাস করে। সুখে দুঃখে তারা একে অপরের অংশীদার। খুশীর দিনে তারা একত্রে সমবেত হয়, আর শোকের অনুষ্ঠানে পরস্পর পরস্পরের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে।

কৃষির মওসুমে তারা একে অপরের সাহায্য করে। কঠিন দারিদ্রের মধ্যেও দরিদ্র ব্যক্তিরা দয়া ও সহানুভূতি প্রদর্শন করে থাকে। গ্রামের যুবক শ্রেণী যারা বিভিন্ন বিদ্যাপিঠে বিদ্যার্জন করছে তারা সব সময় সুখী ও স্বাচ্ছন্দ জীবন যাপন করে থাকে। প্রাচুর্য ও ন্যায়নীতির মাঝে তারা প্রতিপালিত হয়। এর নিকটেই হচ্ছে পাশা ও আমীর-ওমরাহদের জমিদারী ও বসতি এলাকা। কিন্তু এ দু'টি স্থানের মাঝে ব্যাপক ব্যবধান।

যেদিন মাহমুদ সাকারকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হল সে দিন গ্রামটির সকল মানুষই ব্যথা অনুভব করেছিল। মহিলাদের অধিকাংশই চোখের পানি সংবরণ করতে পারেনি। বেশ কিছু মহিলা ত মাহমুদের বাড়ীতে গিয়ে তার মাকে শান্ত্বনা দিয়েছিল এবং শিগগিরই তার মুক্তির জন্যে দোয়াও করেছিল। বস্তুত মাহমুদ হল পুরা গ্রামটিরই সন্তান। সে তাদের সকল প্রকার চুক্তিপত্র, চিঠিপত্র, ব্যবসা-বাণিজ্য, কর্জ, লিজ ইত্যাদির দলিলপত্র লিখে দিত। সে তার পিতার ন্যায় মানুষের দ্বীনি ব্যাপারে ফতোয়া-ফারায়েজের কাজটি আন্জাম দিত, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্বটি পালন করতো, যাতে তারা অন্যান্য স্কুল ও দ্বীনি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারে। সে মানুষের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য সংগ্রহ করে ভাঙ্গাচুরা মসজিদের সংস্কার সাধন অথবা অভাবী লোকদের হাতে তুলে দিত এমনকি বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জনে

সরকারী কর্মকর্তাদের কাছে যেত। এ কারণে তার গ্রেফতারের বিষয়টি তাদের অন্তরে ভীষণ প্রভাব ফেলে। সে বিশ্বাস করে শুধুমাত্র বক্তৃতা-বিবৃতি অবস্থার সংশোধনের জন্যে যথেষ্ট নয়। বাস্তব কর্মক্ষেত্রে অবতরণ, গভীর অনুধাবন ও সরাসরি সমস্যার মুকাবিলা এবং সততা, নিষ্ঠা ও হামদরদীর মনোভাব নিয়ে কাজ করলে পরিশেষে সত্যিকার সমাধান পাওয়া যেতে পারে। যদিও তাদের সামর্থ খুবই নগণ্য এবং দারিদ্র, হতাশা ও অত্যাচারে নিস্পেষিত জনগণের সমস্যা সম্পর্কে সরকার উদাসীন।

সৈনিকদের একটি বিরাট দল হঠাৎ একদিন গ্রামে এসে উপস্থিত। আবার কী হল? আগেই ত তারা মাহমুদ সাকারকে নিয়ে গেছে। এবার তারা কাকে চাচ্ছে? এটা এক অভিনব যামানা। লোকেরা রাস্তার দু'ধারে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে সামরিক অফিসার ও সৈনিকদের তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। তারা তাদের ভারী বুট দ্বারা মাটিতে আঘাত করে করে ধুলো উড়িয়ে চলছে। গ্রামের ওজনদার বলে উঠল—কী হল? আমাদের গ্রামে কি কোন গুপ্তচর বা মাদক দ্রব্য-ব্যবসায়ী আত্মগোপন করে আছে? একজন বৃদ্ধা বলে উঠল—এটা কী যুগ এল?

একজন সুফী ফকীর আবেগে বলে যেতে লাগল—এক আল্লার দিকে ফিরে এস। তিনিই চিরস্থায়ী। ধরাপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সবই ধ্বংস হয়ে যাবে, একমাত্র তোমার মহাপরাক্রমশালী ও মহাসম্মানিত প্রভূর জাতই চিরন্তন। হে চিরঞ্জীব তুমি প্রতিটি প্রাণীর প্রতি করুণা কর!

গ্রামে উত্তেজনা ও হৈ চৈ পড়ে গেল। নগর কর্তা তার লম্বা কোর্তা ও সাদা পাগড়ী পরিধান করে দ্রুতগতিতে চলছে। আর তার পাশে পাশে অন্যান্য কর্মকর্তারা মানুষের ভীড় পরিষ্কার করতে করতে মাহমুদ সাকারের বাড়ীর দিকে যাচ্ছে। জনগণ অবাক হয়ে যাচ্ছে, কিছুই বুঝতে পারছে না। তারা ত সকলেই জানে এর আগে তারা মাহমুদকে ধরে নিয়ে গেছে। তাহলে আজ তাদের উদ্দেশ্য কী? তাহলে তারা কি তার আব্বা, আম্মা অথবা ভাইদের কাউকে গ্রেফতার করতে চায়?

সৈনিকরা মাহমুদের বাড়ীতে ঢুকলো। গোটা বাড়ীটা ওলট-পালট করে ফেলল। একদল মানুষ নগর পরিচালককে জিজ্ঞেস করল—জনাব, কী ব্যাপার?

একজন শঙ্কিত বয়স্ক লোক জবাব দিল—ওরে জানোয়ারের দল, মাহমুদ জেল থেকে পালিয়েছে।

মুহূর্তে ক্ষুদ্র গ্রামটির আনাচে-কানাচে খবরটি ছড়িয়ে পড়ল। মানুষের মনে একটা আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল। কোন কোন মেয়ে উরুতে চাপড় মেরে আনন্দ প্রকাশ করল—এক ব্যক্তি ত হো হো করে হেসে উঠে বলল—মাটি করে দিয়েছ, আল্লার কসম, মাহমুদ, তুমি ওদেরকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছ। তুমি তোমার মাতৃগর্ভের ন্যায় নিরাপদে থাক। সম্মান মর্যাদার প্রভূর শপথ, তুমি বাপকা বেটা। এক ব্যক্তি সে তার প্রাচীন দলীয় মনোভাবের জন্য প্রসিদ্ধ এবং

নাহাস পাশার নেতৃত্বাধীন মিসরীয় 'ওয়াফদ' পার্টি'র অন্ধ ভক্ত সে বিড় বিড় করে বলল—এমন কালো দিন আমরা আর কখনো দেখিনি। এর চেয়ে ইংরেজদের সময়টি ছিল ঢের ভালো।

আর মাহমুদের বৃদ্ধ পিতা আহমদ সাকারের দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছিল। তিনি বললেন—আমার ছেলে আল্লার তাকদীর থেকে ভাগতে পারে না, আমি তা জানি।

সশস্ত্র দলটির কমাণ্ডার তার প্রতিবাদ করে বলল—সরকার মিথ্যা বলতে পারে না। তোমার কথা একটি ধোকাবাজী ও মিথ্যা।

—বেটা, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন! তোমরা তোমাদের খুশীমত তালাশ কর। তবে আমার অন্তর বলছে সে পালায়নি। সেনা অফিসারটি শক্তভাবে তাঁর হাতটি মুঠ করে ধরে জিজ্ঞেস করল—বল, মাহমুদ কোথায়?

—আল্লার কসম করে বলছি, তোমরা তাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে তার সম্পর্কে আমি কিছুই জানিনে। তার দায়-দায়িত্ব তোমাদেরই।

—অফিসারটি ব্যঙ্গভরে হেসে উঠে বলল—আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ?

—এ ধরনের দুঃসাহস করে এমন কেউ কি আমাদের মাঝে আছে?

—বেশ, তাহলে এখানে অথবা অন্য কোন শহরে তার যে সব বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজন আছে তাদের নাম ঠিকানা আমাদের দাও।

—কেন?

—তাদের কাছে তাকে খুঁজব।

—বৃদ্ধ একটু তিক্ত হাসি হেসে বললেন—গোটা গ্রামটিই আমাদের আত্মীয়।

—আমাদের সাথে মস্করা করা হচ্ছে?

—আর আমার ছেলের বন্ধু-বান্ধব অনেক। তারপর বৃদ্ধ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন—জেলখানায় তার সাথে দেখা করার জন্যে আমি বহুবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু তারা আমাকে অনুমতি দেয়নি, এটা কোন আইনে আছে?

—তোমরা দয়া ও অনুগ্রহের উপযুক্ত নও। তোমার ছেলে যা করেছে তা কি ভুলে গেছ?

—কসম করে বলছি, আমি কিছুই জানি না।

অফিসারটি ঘৃণাভরে বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে বলল—প্রেসিডেন্টকে হত্যা করতে চেয়েছিল!

—আমার ছেলে হত্যা করবে? অসম্ভব। সে তার জন্মের পর থেকেই শিখে আসছে, একজন মুসলমানের রক্ত, সম্মান ও সম্পদ আরেকজন মুসলমানের নিকট অতি সম্মানীয়।

অফিসারটি বলল—আমি তোমার কথা শুনে বিশ্বাস করব, আর কাজ দেখে অবাক হব! তারপর সৈনিকদেরকে লক্ষ্য করে বলল—এ লোকটিকে গাড়ীতে উঠাও। শেখ আহমদ বললেন—আমি?—আমি কেন?

—তোমার ছেলে পালিয়ে যাওয়া সম্পর্কে তোমাকে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করব। আল্লাহ ভরসা।

বৃদ্ধ তার লাঠিতে ভর দিয়ে সশস্ত্র ব্যক্তিদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে হাঁটছে, আর তার দু'গণ্ড বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে তার শ্বেত-শুভ্র দাঁড়ি সিক্ত করে দিচ্ছে। গ্রামের এক ব্যাক্তি সামনে এগিয়ে এসে সাহসিকতার সাথে বলল—তার পরিবর্তে আমাকে নিন, লোকটির এক পা ত কবরে।

অফিসারের একটি প্রচণ্ড থাপ্পড় গিয়ে পড়ল লোকটির গালে। তারপর মুহূর্তে অন্যান্য সৈনিকদের লাথি-চড়ের ঠেলায় লোকটি ধরাশয়ী হয়ে গেল। যা ঘটে গেল তা দেখে মানুষ হতভম্ব হয়ে গেল। সেনাবাহিনীর লোকেরা চলে গেল। তাদের গাড়ীর চাকার শব্দ তখনো কানে ভেসে আসছে। লোকেরা উত্তেজিত হয়ে একে অপরের সাথে তর্ক-বিতর্ক জুড়ে দিল। একজন মহিলা, নিকটবর্তী একটি জানালা দিয়ে যে সব কিছু দেখেছিল, বলল—আমরা আখেরী যামানায় বাস করছি।

সামনের বাড়ী থেকে আরেকজন মহিলা বলল—শেখ আহমদ একজন আল্লাহ ওয়ালা লোক। তিনি গ্রামের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সৎব্যক্তি এবং গ্রামের জন্যে বরকত স্বরূপ। হায় কপাল! তার অনুপস্থিতিতে আর এমন কে আছে?

একটা গভীর দুঃখ-বেদনায় গ্রামটি ভরে গেল। ছেলেমেয়েরা নীরবে পানি তুলে কলস ভরছে। এর আগে তাদের অভ্যাস ছিল নানা ধরণের লোক সংগীত গাওয়া ও হৈ হট্টগোল করা। গভীর শোকে-দুঃখে মুহ্যমান অবস্থায় কৃষকরা আপন আপন ক্ষেতে যাচ্ছে। নগরকর্তা এক ফরমান জারী করেছে, রাজনীতি সম্পর্কে কোন ব্যক্তি একেবারেই কোন কথা বলবে না, ভুলেও কেউ মাহমুদ সাকারের বিষয়টি জিহ্বার আগায় আনবে না। তাদেরকে সকল প্রকার ক্রোধ বা শত্রুতামূলক আচরণ প্রকাশ করা সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হল। কেননা, বর্তমান বা ভবিষ্যতে এ সম্পর্কে কোন আলোচনায় যারা অংশ গ্রহণ করবে তাদের গ্রেফতারের ব্যাপারে প্রকাশ্য নির্দেশ রয়েছে। আর যে কোন প্রকার গোলযোগ সৃষ্টির প্রচেষ্টাকারীকে মাহমুদ ও তার বাবার পরিণতি ভোগ করতে হবে।

দু'দিন পর বৃদ্ধ ব্যথিত, বিমর্ষ ও দাঁড়ি মুণ্ডিত অবস্থায় ফিরে এলেন। লোকেরা ফিস্ ফিস্ করে বলাবলি করতে লাগল। 'দাঁড়ি চাঁছা'! হায় আল্লা। তাদের চোখে মুখে জিজ্ঞাসার চিহ্ন ফুটে উঠতে লাগল তবুও একমাত্র তাঁর সহধর্মি'নী ছাড়া আর কেউই তাকে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে সাহসী হলনা। তাঁর স্ত্রী বিস্ময়ের সাথে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বলল—হায় আফসোস! মাহমুদের আব্বা তুমি এমনটি করলে কেন?

বৃদ্ধের দু'গণ্ড বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। বিড় বিড় করে তিনি বললেন—'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ…তারা আমার সামনেই একজন গোয়েন্দাকে চেঁছে দিতে বলল। আমি তাকে বললাম, এমনটি করা হারাম। এ ত রাসুলের সুন্নত। আমি একজন বৃদ্ধ লোক। আমার এ সব কথায় সে একটুও কর্ণপাত করল না। আমাকে সে বলল—এগুলি ত আবর্জনা। তখনই আমি বুঝলাম, এরা

আল্লাহকে ভয় করেনা, মানুষের মর্যাদা এদের কাছে নেই, আর ঈমানদার লোকদের এরা ঘৃণা করে। মাহমুদের মা, আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে, তারা আমাকে ফেরার মাহমুদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের কাছে নিয়ে গেল। আমি উপলব্ধি করলাম, অনুসন্ধান তেমন কিছু নয়, কেবলমাত্র আমার অবয়বকে পাল্টে দিয়েছে। আমার অন্তর বলছে, তারা যা কিছু করছে তা একটি নিম্নমানের সস্তা অভিনয় ছাড়া আর কিছু নয়। তার স্ত্রী জিজ্ঞেস করলেন—এর অর্থ? আমি মনে মনে বললাম, ব্যাপারটির পেছনে এমন কোন রহস্য আছে যা আমি জানিনা। মাহমুদ সেই সামরিক কারাগার থেকে কিভাবে পালাবে, যার চারদিকে রয়েছে সুউচ্চ প্রাচীর কাঁটাতার ও দিন রাত চব্বিশ ঘণ্টা সশস্ত্র সেনা প্রহরী? ব্যাপারটি মোটেই বোধগম্য নয়। একমাত্র আল্লাই ভালো জানেন। আমার দাঁড়ি সম্পর্কে এখন আমি আর তেমন চিন্তা করছিনা। কারণ, আগামী কালই তা নতুন করে গজাতে শুরু করবে। কিন্তু যে বিষয়ে আমি চিন্তা করছি তা হল মাহমুদ।

হতভাগিনী মা তার সিক্ত গণ্ডে হাত রাখলেন এবং সীমাহীন মহাশূন্যের দিকে এক পালকে তাকিয়ে থাকলেন। তিনি যেন তার সামনে তার প্রিয়তম ও আদরের ধন মাহমুদের অবয়ব দেখতে পাচ্ছেন। যে ছিল সর্বদা অনুগত, সত্য-নিষ্ঠ ও সকল মানুষের প্রিয়। ব্যথাভারাক্রান্ত হৃদয়ে অনুচ্চকণ্ঠে তিনি বলতে লাগলেন—আমি অনুভব করছি, সে আমার অতি নিকটে। কখনো কখনো তাকে আমার সামনেই দেখতে পাই। আমি জানি, এগুলি সবই অমূলক ধারণা ও কল্পনা। কিন্তু তা থেকে আমি নিস্কৃতি পাইনা। কেন জানিনা, তবে আমার বিশ্বাস হচ্ছে, মাহমুদ সামরিক কারাগার পরিত্যাগ করেছে। হতে পারে কোন জঙ্গলে আত্মগোপন করে আছে, কোন মসজিদে আশ্রয় নিয়েছে, অথবা সে এ বাড়ীতেই আছে বা এমন কোন গোপন স্থানে সে আছে যা 'আমাল' জানে। আমরা 'আমালকে' কেন জিজ্ঞেস করি না? তোমার মত কি?

চোখের পানি মুছতে মুছতে বৃদ্ধ বললেন—সারাটি জীবন তুমি স্বপ্নই দেখে গেলে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর মা বললেন - শেখ আহমদ, আমার কথা শোন। আমরা স্বয়ং প্রেসিডেন্টের কাছে যাইনা কেন? তার কাছেই সব কিছু খুলে বলি। আমাদের অবস্থা শুনে তার অন্তরে দয়াও হতে পারে? মাহমুদের প্রকৃত পরিচয় পেলে তিনি তাকে মাথার ওপর রাখবেন। সে ত যুবকদের গৌরব।

বৃদ্ধের মুখে একটুকরো দুঃখের হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন—আমি গায়রুল্লার স্মরনাপন্ন হবনা।

—তা আমি জানি। কিন্তু আল্লাহ ত তাকে কারাগারে ঢোকাননি। যে তাকে কারারুদ্ধ করেছে, সে হচ্ছে সরকার। বৃদ্ধ বললেন—আল্লার কাছে ইসতিগফার কর। সব কিছুই আল্লার হুকুমে হয়।

—মাহমুদের ওপর জুলুমে কি আল্লাহ রাজী হবেন?

—আল্লার এক নাম আদল। তাঁর বান্দাদের ওপর জুলুমের ব্যাপারে তিনি কিভাবে রাজী হতে পারেন?

—আমি বুঝতে অক্ষম। অসৎ লোকেরা শাসন করছে, স্বাধীনভাবে চড়ে বেড়াচ্ছে আর সৎ লোকদেরকে কারাগারের ঘন অন্ধকারের দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিভাবে তুমি এর ব্যাখ্যা করবে? বৃদ্ধ উঠে দাঁড়াবার জন্যে তার বাঁকা লাঠিটি টেনে নিলেন এবং মাটিতে ঠক করে একটা আঘাত করে বলে উঠলেন —আল্লাহ কোন বান্দাকে ভালোবাসলে তাকে পরীক্ষা করেন।

স্ত্রী বললেন—কেন? বৃদ্ধ বললেন—পরীক্ষার জন্য।

—পরীক্ষা?

—হ্যাঁ। যে কামিয়াব হবে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে। দুনিয়া সাময়িক মুসাফিরখানা। ঘুমন্ত ব্যক্তির স্বপ্নের মত। এরপরই আসছে পরকালীন প্রকৃত জীবন। সে জীবন হবে চিরন্তন, সেখানে মু'মিন বান্দাদের জন্যে থাকবে অফুরন্ত নিয়ামত। তাহলে আমরা কেন ভয় পাব এবং অযথা আমাদের হৃদয়কে বাঁকা করে তুলব? এ দুনিয়া ও এর মধ্যে যা কিছু আছে তার সবই আল্লার কাছে একটি মাছির ডানার সমতুল্য নয়। ওহে নারী, আসরের নামাজের জন্যে ওঠো। আনুগত্যের মাধ্যমে আল্লার নৈকট্য হাসিল ছাড়া আমাদের আর কোন পাথেয় বা অস্ত্র নেই। যে মহান সত্তা আমানতে খিয়ানত করেন না তার কাছেই মাহমুদকে আমানত রাখলাম। এরপর তিনি হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন।

মাহমুদের মা অবাক দৃষ্টিতে স্বামীকে দেখছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন—কাঁদছ কেন?

—আমি জানিনা। তবে যতটুকু বলা আমার পক্ষে সম্ভব তা হচ্ছে, আমি আমার মহাপ্রভুর সাথে মিলিত হবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়েছি। যে আল্লাকে সত্যিকার ভাবে চিনেছে, সে তার সাথে মিলবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে পড়ে। এরপর বৃদ্ধ তার মাথাটি উঁচু করে ডানে-বায়ে ঝুঁকালেন এবং অশ্রুভেজা চোখ দু'টি বন্ধ করে কয়েকটি কবিতার পংতি আওড়াতে লাগলেন—

যদি হতে তুমি মধুর ও জীবন হত তীক্ত,
যদি হতে তুমি খুশি ও সৃষ্টি জগত হত ক্রুদ্ধ!
হায়! যদি হত তোমার আমার মাঝের সম্পর্ক সজীব,
এবং যদি হত আমার ও বিশ্বচরাচরের মাঝের সম্পর্ক অস্তিত্বহীন!
তোমার প্রেমের বিনিময়ে সবই তুচ্ছ,
এবং মাটির ওপরে যা কিছু আছে, সবই মাটি।

মা জোরে একটি চিৎকার দিয়ে উঠলেন—আমার ছেলে মারা গেছে!

বৃদ্ধ তার কথায় মনোযোগ দিলেন না। দু'চোখ বন্ধ করে তিনি কবিতা আবৃত্তি করে চলেছেন। অশ্রু তার দু'গণ্ড প্লাবিত করে দিচ্ছে। মার চিৎকার কানে যেতেই চার দিক থেকে মানুষ ছুটে আসল। মুহূর্তে বাড়ীর প্রশস্ত আঙ্গিনা লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। আর পশু-পক্ষীদের কণ্ঠে সে চিৎকার যেন ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে থাকল। মানুষের চোখে একটা বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠল।

গ্রামের 'কয়েলদার' যে তার তীক্ষ্ণ মেধা, বুদ্ধিমত্তা ও দৈনিক পত্রিকার খবরাদি সম্পর্কে অভিজ্ঞ বলে মশহুর, বলে উঠল—নতুন কোন সংবাদ এসেছে কি? কিন্তু শেখ আহমদ কোন জবাব দিলেন না। তিনি তার মাথা ডানে বায়ে হেলিয়ে দুলিয়ে সুফীতত্ত্বের কিছু কবিতা আবৃত্তি করে যেতে লাগলেন।

আশ্চর্য ধরনের ব্যথা-বেদনার পরিবেশের মধ্যে একটা পবিত্র নিরবতা বিরাজ করতে লাগল। একজন নেককার ব্যক্তি বিড়বিড় করে বলে উঠলেন—শেখের মিলন ঘটেছে। তিনি যে একথা দ্বারা আল্লার গভীর নৈকট্য, আত্মার স্বচ্ছতা এবং দুনিয়ার ফেতনা ও তার চাকচিক্য থেকে মুক্তির কথা বলতে চাচ্ছে, উপস্থিত সকলেই তা বুঝতে পারল। 'আর কয়েলদার' চাপা স্বরে বলল—আমার মনে হচ্ছে শেখের ভিতর যেন একটু পাগলামী ভাব এসে গেছে। তিনি এ বিপদ সহ্য করতে পারছেন না। আমার মনে হয় তাকে সামরিক কারাগারে হত্যা করে ধারণা দেয়া হচ্ছে, সে পালিয়েছে। আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে এ যুগের মুসিবতের অকল্যাণ থেকে রক্ষা কর। এ ফেতনার সীমা কতদূর বিস্তৃত তা একমাত্র আল্লাই জানেন।

মানুষ হতভম্বের ন্যায় দাঁড়িয়ে রইল। তারা ভেবে পেলনা কী করবে। তারা কি শোক প্রকাশ করবে? কিন্তু কীভাবে? সঠিক কোন সংবাদ তারা পায়নি। না তারা ফিরে যাবে? কিন্তু যে হতভাগ্য ব্যক্তিটি সুদীর্ঘ ষাটটি বছর ধরে তাদের শিক্ষা দিয়েছে, সৎ পথে পরিচালিত করছে এবং তাদের দ্বীনি ব্যাপারে ফতোয়া দিয়ে আসছে, তার এ বিপর্যয়ের সময় কেমন করে তারা তাকে ছেড়ে যেতে পারে?

তারা সকলেই তাদের এ অবচেতন অবস্থা কাটিয়ে সম্বিত ফিরে পেল যখন নগর পালের একজন প্রতিনিধির কণ্ঠস্বর কানে গেল। সে দ্রুত উপস্থিত হয়ে কঠিন সুরে সকলকে নির্দেশ দিল—তোমরা সবাই নিজ নিজ বাড়ীতে ফিরে যাও। খোদার কসম! এখন যা হচ্ছে, তা যদি সরকার জানতে পারে তাহলে সম্পূর্ণ গ্রাম জ্বালিয়ে একেবারে বিরান করে দেবে। হে 'মানিয়াতুল বান্দারার' অধিবাসীরা। সতর্ক হও। তোমরা বুদ্ধিমান হও। যখন দেখল কেউ নড়লনা, তখন সে আবারো বলল—তোমরা যদি সত্যি সত্যিই শেখ আহমদকে ভালোবাস এবং মাহমুদের মুক্তি চাও, তাহলে তোমরা আমার আদেশ পালন কর। শেষ পর্যন্ত বিপদ আর কারোরই আসবে না।

উপস্থিত সকলেই তার দিকে তাকাল। সে ত তাদেরই একজন। তারা দেখতে পেল, তারও মুখমণ্ডলে বেদনার ছাপ এবং তারা উপলব্ধি করল সে তাদেরই দুঃখের অংশীদার। যদিও সে সরকারী অস্ত্রের বাহক ও নিপীড়নমূলক নির্দেশের বাস্তবায়নকারী। লোকগুলি একের পর এক চলে গেল এবং বাড়ীটি প্রায় খালি হয়ে গেল। একটা দুর্বোধ্য নিরবতা বাড়িটিকে ঘিরে ধরল এবং একটা ভীতি ও যন্ত্রণা সারা বাড়ীতে ছড়িয়ে পড়ল।

শেখ আহমদ আবৃত্তি বন্ধ করে চোখের পানি মুছলেন। তারপর—'লা হাউলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লা' ও 'আস্তাগফিরুল্লাহ' পাঠ করলেন। স্ত্রীর দিকে ঝাপসা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন সে মারা গেছে।

শঙ্কিত হয়ে স্ত্রী চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলেন– আমার ছেলে ?

দ্রুত তিনি জবাব দিলেন—'না তোমার ছেলে মরেনি। যে মারা গেছে সে হচ্ছে শাসক।' ঢোক গিলে আবারো বলতে লাগলেন—যারা নির্দোষ ব্যক্তিদের রক্তকে বৈধ মনে করে, প্রভুর ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারণ করে মৃতদের তালিকায় তাদেরই নাম ওঠে। যদিও তারা যমিনের ওপর চলেফেরে, খায়দায়, উঁচু মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করে এবং জনতা তাদেরকে হাত তালি দেয়।

রাগের সাথে স্ত্রী বললেন—তারা সবাই জাহান্নামে যাক। আমি আমার ছেলের কথা জিজ্ঞেস করছি।

– সে জীবিত, তাকে রেযেক দেয়া হচ্ছে।

—শেখ, আল্লাহ তোমার অন্তরকে প্রশান্তি দান করুন।

শেখ আহমদ কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করতে শুরু করলেন—'ওয়ালা তাহসাবান্নাল্লাজীনা কুন্তিলু ফী সাবিলিল্লাহি আমওয়াতা, বাল আহইয়ায়ুন ইনদা রাব্বিহিম য়ুরযাকুন। 'যারা আল্লার রাস্তায় শহীদ হয়েছে তাদেরকে মৃত মনে করো না; বরং তারা জীবিত। তারা তাদের প্রভুর কাছ থেকে রেযেক লাভ করে থাকে।'

বৃদ্ধ যা বলছে স্ত্রী বুঝতে চেষ্টা করল, কিন্তু সক্ষম হল না। পুরো বিষয়টির দুর্বোধ্যতা তার কাছে বেড়ে চলল এবং তিনি তাঁর দু'চোখের সামনে অন্ধকার দেখতে লাগলেন। মাহমুদের মা কিছুটা অস্বস্তি ও দুর্বলতা অনুভব করলেন। তিনি মেঝেতে চাটাইয়ের ওপর শুয়ে পড়লেন। কিন্তু তার স্মরণ হলো এ পর্যন্ত তাঁর স্বামী কিছুই খাইনি। নীচু গলায় বললেন—কিছু খাবে না ?

– এক মগ পানি হলেই আমার চলবে।

—তারা তোমাকে সেখানে সরকারী অফিসে কিছু খেতে দেয়নি ?

—আমাকে খেতে দিয়েছে ? হ্যাঁ। এক পেয়ালা পান করেছি, তাদের কথিত তলানী পর্যন্ত। ওহে নারী, সর্বোৎকৃষ্ট পথেয় হল তাকওয়া।

স্নিগ্ধ চাঁদের আলোয় ছোট্ট গ্রামটি ঘুমিয়ে পড়েছে। কালো একখণ্ড দ্বীপের মত সবুজের বুকে ঘুমিয়ে আছে। রাতের স্তব্ধতা ভেঙ্গে মাঝে মাঝে পেঁচার ডাক, চামচিকের কিচির মিচির শব্দ শোনা যায়। ঘন জঙ্গলের মাঝখানে ক্ষুধার্ত নেকড়ের ডাক এবং নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষত ফজরের পূর্বে ট্রেনের বাঁশীর প্রচণ্ড আওয়াজ দিকদিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে। দুর থেকে কখনো কখনো সুফী ফকীরের মর্মস্পর্শী সুর ভেসে আসে—'ওহে নিদ্রিত, নিদ্রা তোমাকে কেমন করে আরাম দেয়, যখন মরণই সত্য এবং বিচ্ছেদ পীড়াদায়ক ?'

অভ্যাস অনুযায়ী শেখ ফজরের পূর্বেই বের হয়ে গেলেন নামাজের জামায়াতে ইমামতি করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু যে আশ্চর্য বিষয়টি ঘটে গেল তা শত শত বছর ধরে এ গ্রামের মানুষের মুখে মুখে ধ্বনিত হতে থাকবে। শেখ নামাজের নিয়েত করে আল্লাহু আকবর বলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ফাতিহা পাঠ করলেন। তারপর শাহাদাতের একটি আয়াত পাঠ করে চুপ করলেন। দীর্ঘক্ষণ চুপ করেই থাকলেন।

প্রথম সারিতে দাঁড়ান লোকেরা লক্ষ্য করল, রুকু না করেই হঠাৎ শেখ বসে পড়লেন……তারপর ডান দিকে একটু কাত হয়ে কলেমা শাহাদাত পড়তে লাগলেন। কয়েকজন লোক তার দিকে এগিয়ে গেল। তারা তার চেহারার দিকে তাকাল। একজন বলে উঠলো—লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লাবিল্লাহ…শেখ নামাজ আদায় করতে করতে তাঁর প্রভুর সান্নিধ্যে চলে গেছেন।

একটি মিটমিটে বাতির আলোতে ছোট্ট মসজিদটি আলোকিত ছিল। মুহূর্তে তার মধ্যে হৈ চৈ পড়ে গেল। 'কয়েলদার' লোকটি বলল—শেখ আমাদের এ হতভাগা দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নিলেন। তিনি এখন সর্বোত্তম স্থানে। পরম করুণাময়ের অতিথি। মানিয়াতুল বান্দারার বাসিন্দাগণ! তোমরা এখন এ পুণ্যবান ব্যক্তিটির কবর খোঁড়ার জন্যে উঠে পড়। আর তার কবরের গায়ে এ বাক্যটি লিখে দাও—'এ হল পূর্ববর্তী পুণ্যবানদের অবশিষ্ট ব্যক্তির অন্তিম শয্যা।'

গ্রামের প্রতিটি লোকই ঘুম থেকে জেগে সমবেত হল। মানুষে মসজিদ ভরে গেল। প্রত্যেকেই চাচ্ছে, একটি বার শেখকে চুম্বন করতে, তাঁকে স্পর্শ করে বরকত হাসিল করতে এবং এক নজর শেষ দেখা দেখতে। পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে এ খবর ছড়িয়ে পড়ল। চারিদিক থেকে মানুষের ঢল নামা শুরু হল। যেন হজ্ব যাত্রীদের দল একের পর এক আসছে। সবুজ ব্যানার ও পতাকা হাতে তবলা বাজিয়ে সুফী তত্বের গান গাইতে গাইতে সূফী ফকীরের দল আসতে শুরু করল। গ্রামটিতে যে বিশাল সমাবেশ ঘটল তা তার দীর্ঘ ইতিহাসে আর কখনো ঘটেনি। লোকেরা জঙ্গলের মধ্যখানে সর্বোত্তম স্থানটির দিকে গেল। সেখানে তারা কোদাল দিয়ে মাটি খুঁড়ে কবরের পাকা ভিত গড়ে তুলল। তাদের কেউ একথা চিন্তা করল না, কবর পাকা করা সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা যা কিছু করছিল তা ছিল একজন মানুষের প্রতি তাদের গভীর ভালবাসার স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি। যে লোকটির উল্লেখযোগ্য কোন সম্পদ ছিল না, তিনি কোন ক্ষমতাবান ব্যক্তিও ছিলে না। সারা জীবনে তিনি কোন উচ্চ সরকারী পদেও অধিষ্ঠিত হননি। বরং একজন কৃষিজীবি ধর্মীয় বক্তা হিসেবে জীবন কাটিয়েছেন এবং সেভাবেই মৃত্যু বরণ করেছেন। কিন্তু তার প্রতি তাদের ভালবাসা দুনিয়ার সব কিছু থেকেই অধিকতর শক্তিশালী।

হঠাৎ গ্রামের আকাশে বাতাসে গোলাগুলির আওয়াজ শোনা গেল। উঁকি মেরে লোকেরা দেখতে পেল, সৈনিকদের বিরাট একটি দল আসছে। তারা যাকে সামনে পাচ্ছে এক ধারছে চাবুক দিয়ে সমানে পিটিয়ে যাচ্ছে। কিছু লোককে গ্রেফতার করে সরকারী গাড়ীতে উঠিয়ে নেয়া হল। সমবেত জনতা যে যেভাবে পারল পালিয়ে প্রশস্ত সবুজ জঙ্গলের মধ্যে আশ্রয় নিল। পুনরায় একটা ভীতি, নিরবতা ও চাপা ক্ষোভ নেমে এল। চারজন গ্রাম্য চৌকিদার শেখের লাশটি সৈনিকদের প্রহরায় কাঁধে তুলে নিল এবং সামরিক জানাযার পর তারা তাকে তাঁর পারিবারিক গোরস্তানে দাফন করল।

শেখের কেরামতি সম্পর্কে নানা কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। লোকেরা অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে তা বলাবলি করতে লাগল। একজন সূফী ফকীর তাদেরকে জোর দিয়ে বলল, সে নিজ চোখে মাহমুদ সাকারকে তাঁর পিতার লাশ বহণ করতে দেখেছে। কেউ কেউ তাগিদ দিয়ে বলল, একদল অপরিচিত লোক মৃতের লাশটি চারিদিক থেকে ঘিরেছিল। তারা তার ব্যাখ্যা করল তারা ছিল আকাশের ফেরেশতা। কেননা কেউ তাদেরকে চিনতে পারেনি। দূর-দূরান্ত থেকে লোকেরা কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে প্রতি সন্ধ্যায় আসতে শুরু করল। তারা কবরের মাটিতে চুমা দেয়, কবরের ওপর চোখের পানি ঝরায়। এ দেখে সরকার দু'সপ্তাহের জন্যে কবরটি পাহারা দানের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হল। তারা যিয়ারতকারীদের ধরে ধরে একটি তাবুতে নিয়ে গিয়ে নানা ধরণের দৈহিক অত্যা-চারের পর ছেড়ে দিত।

তারপর মানুষ যখনই শেখ আহমদ সাকারের নামটি স্মরণ করে তখনই তাঁর নামের পূর্বে 'আল্লার ওলী' লকবটি জুড়ে দেয়।

২৭

সামরিক কারাগারে বহু দিন ও রাত অতিবাহিত হয়েছে। শাস্তি ও যন্ত্রণা ভোগ করে করে বন্দীরা অতীষ্ট হয়ে উঠেছে। একের পর এক শহীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। অত্যাচারীরা চরম নিষ্ঠুরতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তারা চাবুকের প্রয়োগে নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করে নিত্য নতুন শাস্তির কসরত দেখিয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি কয়েদীকে শাস্তি দেবার সময় তারা একে অপরের প্রতি-যোগী হয়ে ওঠে। উতওয়া আল-মালওয়ানীর অহমিকা ও ক্ষমতার দাপট দিন দিন বেড়েই চলেছে। প্রতি দিনই কারাগারে নতুন মানুষের আমদানী হচ্ছে। তাদের বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনও সেই অনুপাতে বাড়ছে। সৈনিকদের সন্ত্রাস-বাদী কার্যকলাপের কথা সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। প্রতিটি শহর ও গ্রামের মানুষের কাজও আচরণের মধ্যে তার একটা প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠছে। তাদের অধিকাংশই কোন কথা না বলে চুপ করে থাকে। পরিবারের কোন লোকজন বা বন্ধু-বান্ধদের সাথে এই বিপর্যয়ের ও বিকৃতি সম্পর্কে কোন প্রকার আলোচনা করতে তারা ভয় পায়।

মসজিদের খতীবদের কাছে সরকারী খুতবা বিলি করা শুরু হল। যাতে তাদের কেউ নিষিদ্ধ কোন বিষয় নিয়ে কোন কথা বলতে না পারে। আর তার বিষয়বস্তু ত অনেক। স্কুল-কলেজের পাঠ্য-পুস্তক শাসকগোষ্ঠী ও তাদের চেলাচামুণ্ডাদের নাম ও গৌরব গাথায় ভরে গেল। ছোটদেরকে এমন সব বীরত্ব-মূলক সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া হতে লাগল যাতে শুধু শাসকগোষ্ঠীর গুণগান গাওয়া

হয়েছে এবং তাদেরকে খোদার আসনে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। সরকারের সমর্থক নতুন রাজনৈতিক দল সৃষ্টি করা হলো। তাতে যোগ দিল যত সব মোনাফিক, রাজনৈতিক সুযোগ সন্ধানী ও ধোকাবাজ লোকেরা। বিপুল সংখ্যক লোক চাকুরীর খাতিরে, নেতিবাচক কার্যকলাপের দোষারোপ, অথবা পাণ্টা বিপ্লবের অভিযোগের ভয়ে এ দলে সমবেত হলো। আর অনেকেই খুব তাড়াহুড়া করে এসে ভিড়ল নিজ নিজ আয়-উপার্জনের উপায় উপকরণগুলো বাঁচাবার অথবা সামাজিক, রাজনৈতিক বা চাকুরীগত মান-মর্যাদা ও স্থান রক্ষার জন্যে।

যাদের সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহ দেখা দিল অথবা যারা কিছুটা নিরপেক্ষ মতামত প্রকাশের দুঃসাহস করলো তারা রাজনৈতিক ময়দান থেকে আত্মগোপন করলো। তাদের নিজস্ব কোন চিন্তা ও মতামত নেই অথবা ইহুদী ও উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে যাদের উল্লেখযোগ্য অতীত কোন সংগ্রামের ইতিহাস নেই, এমন সব নতুন ব্যক্তিদের নামে দৈনিক পত্রিকাগুলি ভরে গেলো। মিসরীয় জনজীবনে একটা ওলট-পালট হয়ে গেল। চিরাচরিত মুল্যবোধ ও ন্যায়-নীতির মানদণ্ডে পরিবর্তন দেখা গেলো। মহান আদর্শ ও উন্নত নৈতিকতা অাঁকড়ে ধরাকে একটা বোকামী, কুপমণ্ডুকতা ও নির্বুদ্ধিতা বলে গণ্য করা হতে লাগলো। জনগণ গ্রাম্য কল্পকথা ও কৌতুকের আশ্রয় নিতে বাধ্য হলো। এর মাধ্যমে তারা তাদের অন্তরের ঘৃণা ও অস্বীকৃতি প্রকাশ করতো। গোপনে এসব কৌতুক এক মুখ থেকে অন্য মুখে ছড়িয়ে পড়তো। যেন এটা কোন মাদকদ্রব্য বা নিষিদ্ধ কোন বস্তুর চোরাকারবার। এসব কল্পকথা ও কৌতুক শুনে শুনে লোকেরা অন্তর খুলে হাসতো। এই একটি মাত্র জিনিস প্রতিরোধ করতে সরকার অক্ষম হয়ে গেলো।

এ ফেতনার অকল্যাণ থেকে বাঁচার জন্যে অনেক মানুষ একাকীত্ব ও নির্জনতা বেছে নিল। তারা তাদের অভিযোগ, দাবী-দাওয়া ও অত্যাচারের কথা একমাত্র আল্লার কাছেই ব্যক্ত করতে পারতো। অনেকে নিজ আকীদা-বিশ্বাস অন্তরে ধারণ করে বিদেশে পাড়ি জমাবার চেষ্টা করলো—তা সে ইউরোপ, আমেরিকা বা অন্য কোন আরব দেশই হোক না কেন। কেউ কেউ ত সরকারী প্রতিনিধি দলের সাথে বিদেশে গিয়ে আর ফিরে এলো না, অথবা হজ্জ আদায়ের উদ্দেশ্যে গিয়ে আল্লার এ প্রশস্ত বিশ্বের কোন এক প্রান্তে পালিয়ে গেলো। এভাবে মানুষের অসহায়ত্ব দিন দিন বেড়েই চললো। সব সময় তাদের মুখে শোনা যেতে লাগলো—'আল্লার কাছ থেকে পালিয়ে আর কোথাও আশ্রয়স্থল নেই।'

এদিকে নাবিলার আব্বা যিনি প্রথমবারের মত হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে ফিরে এলেন তাঁর জীবন ধারাকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে পরিচালিত করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে। তাঁকে এখন বিশেষ বিশেষ খাবার খেতে হবে, সকাল সকাল ঘুমাতে হবে, কষ্টকর কোন কাজ এবং সকল প্রকার মানসিক আবেগ-উচ্ছাস থেকে দুরে থাকতে হবে। তা না হলে তাঁর জীবনাশংকা দেখা দেবে। আর নাবিলার পরিবার-পরিজন তার বইটি প্রকাশের পর থেকে

মিসরবাসীর কাঁধে সিন্দাবাদের দৈত্যের ন্যায় চেপে বসে থাকা সন্ত্রাসবাদী চক্রের ভয়ে সর্বক্ষণ ভীত। তার পুরো পরিবারটিই নজরবন্দী অবস্থায় দিন অতিবাহিত করছে। সময়ে অসময়ে তাদেরকে জেনারেল গোয়েন্দা ভবনে তলব করা একটি সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। তাছাড়া তাদের ওপর সব ধরনের রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মতৎপরতায় অংশ গ্রহণের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। জাতির বহু সন্তানদের ন্যায় তাদেরকেও রাজনৈতিক ময়দান থেকে নির্বাসন দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে যারা তাদের সারাটি জীবন জাতির মহান সেবায় কাটিয়েছে, অথবা চিন্তা ও অর্থনীতির জগতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। নাবিলার কিছু নির্দোষ আত্মীয়-স্বজনকেও সামরিক কলেজ থেকে বহিস্কার করা হয়েছে। তাদের অপরাধ হলো নাবিলার সাথে তাদের আত্মীয়তা। অথচ এসব ব্যাপারে পারিবারিক তাদের কোন ক্ষমতা নেই? এখন লোকেরা তাদের সাক্ষাত এড়িয়ে দূরে দূরে থাকছে। যেন তাদের বাসস্থানগুলিতে কোন সংক্রামক মহামারী দেখা দিয়েছে।

নাবিলা ও আবদুল আজীজ সীসীর পাঠানো লোকটি মিসরে এসে তন্ন তন্ন করে সালওয়া ও তার ছেলে সাবেরকে খুঁজতে শুরু করলো। কিন্তু তার বাড়ী থেকে তাদের কোন সন্ধান বের করতে পারলো না। সে এখান সেখান থেকে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে একটা মর্মান্তিক সত্যের মুখোমুখি হলো। তারা সালওয়ার স্বামীকে তালাক দিতে এবং তার বিরুদ্ধে নানা রকম বানোয়াট ও মিথ্যা অপবাদ খাড়া করতে বাধ্য করেছে। তাকে তার ছেলে সাবেরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে এবং তার প্রতি জঘণ্য ধরনের মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছে। তারা তার বিরুদ্ধে খিয়ানাত, পাপাচার ও অশ্লীলতার কথা প্রচার করছে। এমন একটি দিনও তারা বাদ দেয়নি যে দিন তার বাড়ীতে তল্লাশী চালিয়ে তাকে শাস্তি দেয়া হয়নি। এরপর সে হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে, ঘুমাতে পারে না এবং পানাহার ত্যাগ করে। ধীরে ধীরে সে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে সম্পূর্ণ পাগল হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে থাকে। আপন মনে কথা বলে, হাসে ও কাঁদে। ময়লা ছেঁড়া কাপড় পড়ে, খালি পায়ে মাথা আলগা রেখে চুল ছেড়ে দিয়ে জনাকীর্ণ রাজপথে ঘুরে বেড়ায়। এ সম্পর্কে তার কোন অনুভূতি নেই। একদিন সকাল বেলায় একটি সরকারী গাড়ী এসে থামলো। গাড়ী থেকে দু'জন লোক নেমে এসে সালওয়াকে বোতাম বিহীন 'পাগলদের কামীস' পরিয়ে দিল। তারপর তারা তাকে এক নতুন বিশ্বের দিকে টেনে নিয়ে গেলো। আর তখন সে একবার হাসে একবার কাঁদে, আবার কখনো বা সাবেরের নাম ধরে মাতম করতে থাকে। লোকেরা নিরবে অশ্রু মুছতে মুছতে তাকে বিদায় দিল।

নাবিলার প্রেরিত লোকটি মানসিক হাসপাতালে তাকে দেখতে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তার কোন কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু তাকে বোঝালো যে, এতে মারাত্মক বিপদের সম্ভবনা রয়েছে। কেননা সেখানে সে কঠোর প্রহরার মধ্যে। কেউ তার সাথে দেখা করতে চাইলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে পূর্বেই অনুমতি সংগ্রহ করতে

হবে। আর এটা হবে একটা মারাত্মক পদক্ষেপ। আর এর পরিণতি হবে তার কারাগারে অবস্থান।

মাঝ রাতে বাড়ীর সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন নাবিলার মা তাঁর স্বামীকে বললেন—এদেশ ছেড়ে অন্য কোথাও আমরা চলে যাইনা কেন?

আব্দুল্লাহ তার চোখ দু'টি বড় বড় করে বললেন—নাবিলার মা, জন্মভূমি বড় মূল্যবান জিনিস।

—জন্মভূমি কাকে বলে? আমরা বাস করছি, লাঞ্ছনা ও ভীতির মধ্যে। তার পরেও আপনি বলেছেন জন্মভূমির কথা?

– নাবিলার মা তুমি শান্ত হও। আজ যা ঘটেছে, তা একটা সাময়িক বিপর্যয় মাত্র। এক আল্লাহ ছাড়া কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। শাসকরা ক্ষমতার দাপট দেখায়, বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং তাদের শাসন কাজ সম্পূর্ণ সঠিক মনে করে অন্যের ওপর তা চাপিয়ে দেয়। তারা ভুলে যায়, জীবনের চাকা তাদের বেলায়ও ঘুরছে। তারাও একদিন বৃদ্ধ হবে মৃত্যুবরণ করবে। তারা ভুলে যায়, সত্য কারো একচেটিয়া সম্পদ নয়। আল্লাই হলেন একক সত্য। এ বিশ্বে তাদের থেকেও গভীর জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির সংখ্যা অসংখ্য। তাদের জন্যে দুঃখ হয়, যারা অহঙ্কার ও অহমিকার পঙ্কিল নর্দমার অতল গহবরে তলিয়ে আছে।

একটু দুঃখের সাথে নাবিলার মা বললেন—আমি বড় অধৈর্য হয়ে পড়েছি।

—ধৈর্যই হল মজলুমদের রক্ষাকবচ।

—মানুষ ত আমাদের পরিত্যাগ করেছে।

বহু দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে একটু মৃদু হেসে নাবিলার আব্বা বললেন—আমি কসম করে বলছি, মানুষ অত্যন্ত ভক্ত ও সাহসিকতার সাথে আমার হাত মুঠ করে ধরে বলে, আপনার মেয়ে নাবিলাকে আল্লাহ হিফাজত করুন। আপনি তাকে আমাদের সালাম পৌঁছে দেবেন। সত্যিই, তারা চুপে চুপে একথাগুলি বলে, আর শঙ্কিতভাবে এদিক ওদিক তাকায় পাছে কেউ শুনে ফেলছে কিনা তা দেখার জন্যে। চিন্তা করে দেখ, এই নীচু স্বরের কথাগুলি কতই না চমৎকার। এগুলি আমাদের অন্তরে গেঁথে রাখা উচিত।

রাগে ক্ষোভে নাবিলার মা হাত দিয়ে বুকে আঘাত করে বললেন—এসব ফিস্‌ফিসানীর কি দাম? তারাও কেন নাবিলার মত করে না?

দুঃখের সাথে নাবিলার আববা মাথা নিচু করে বললেন—মানুষ নানা রকম বিপদ-আপদে জড়িয়ে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে। তাই অতিরিক্ত কোন মুসিবত টেনে আনতে তারা মানসিক দিক দিয়ে প্রস্তুত নয়।

নাবিলার মা কামরার চারদিকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে বললেন—আমি আমার নিজের মনে অনেকবার প্রশ্ন করেছি—যা ঘটে গেলো তার কারণ কি?

—নাবিলার মা দ্বন্দ্ব ও সংঘাত চিরন্তন।

—না, আমি বলি, উতওয়া আল-মাওয়ানীর সাথে পরিচিতিই আমাদের এ বিপর্যয়ের সূচনা।

—সব মজলুমরাই কি উতওয়ার সাথে পরিচিত?

—তা আমি জানিনা।

বয়স ও অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ মহাজ্ঞানী ব্যক্তির ন্যায় একটু মাথা দুলিয়ে নাবিলার আব্বা বললেন—কে জানবে? সম্ভবত এটাই কল্যাণের সূচনা।

হাত দিয়ে অস্বীকারের ইঙ্গিত করে মা বললেন—আল্লার ওয়াস্তে আপনি একটু চুপ করুন ত। কল্যাণ! শুনি, কল্যাণ কোথা থেকে আসে?

আকাশ এখনো বৃষ্টি বর্ষণ করছে, জমিন ফসল ফলাচ্ছে। আর রাসূলুল্লাহ (স) ত বলেছেন—'আল-খাইরু ফিয়্যা ওয়া ফীউম্মতি ইলা ইয়াওমীল কিয়ামাহ্।' কল্যাণ ত আমার মধ্যে ও আমার উম্মতের মধ্যে এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর মা বললেন—ভালোবাসা, নিরাপত্তা, আশা ও ন্যায়বিচারের অপর নামই ত জন্মভূমি। আর এগুলি না থাকলে 'জন্মভূমি' নামই ত বৃথা।

একটু কেশে নিয়ে নাবিলার আব্বা বললেন—নিজের অন্তরকে মিছেমিছি কষ্ট দিও না। তারা আমাদের অন্য কোন দেশে যাবার অনুমতি দেবে না। আমাদের পুরো খান্দানটিরই নাম 'কালো খাতায়' উঠে গেছে।

মা একটু ঘাবড়ে গিয়ে প্রশ্ন করেন—'কালো খাতা' মানে কি?

—মান হলো, সন্দেহভাজন ব্যক্তিরা, দেশের বাইরে যাবার যাদের অনুমতি নেই, আমরা তাদের মধ্যে।

—কোন আইনের বলে? কোন অধিকারে?

—অধিকার ও আইনের কথা বলো না। আমি হজ্জে যাবার অনুমতি চেয়ে দরখাস্ত করেছিলাম। তারা জবাব দিল, মিছেমিছি নিজেকে কষ্ট দিও না…নিষেধ

নিজের বুকে আঘাত করে মা বললেন—এমন কি বায়তুল্লাহ শরীফেও? ফরয আদায়েও মানা? এটা খুবই বাড়াবাড়ি।

—সব কিছুর ওপর হলো রাষ্ট্রের নিরাপত্তা।

ঘৃণার সাথে থু থু ফেলে মা বললেন—এসব বাক্য আমার সামনে উচ্চারণ করবেন না। আমাকে ভীষণ পীড়া দেয়।

নাবিলার আব্বা দরদের সাথে স্ত্রীর হাতটি মুঠ করে ধরে বললেন—নাবিলার চিঠির জবাবে আমি একটি চিঠি তাকে পাঠিয়েছি।

—কার হাতে?

—কুয়েত থেকে আসা এক ব্যক্তির কাছে। সে তার নাম প্রকাশ করেনি। গত সপ্তাহে তার একটি চিঠি আমার হাতে পৌঁছায়।

পানিতে মার চোখ ভরে গেল। তিনি বললেন—আমার প্রিয়তমা, আমার মেয়ে। তোর মিষ্টি চেহারাটি দেখার পরিবর্তে শুধু চিঠিতে কি মন ভরে?

—দুঃখ করো না। শিগগিরই আমরা তার সাথে মিলিত হব।

—কবে?

—এর উত্তর আল্লার কাছে। তারপর অকস্মাৎ তিনি স্ত্রীর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কি তার চিঠিটি ছিঁড়ে ফেলেছ ?

—আমি ? কেমন করে ? তা ত আমার মেয়েরই একটা অংশ। আমি কিভাবে তা ছিঁড়তে পারি ?

—নাবিলার মা, শোন। গোয়েন্দা বিভাগ যদি এ চিঠির সন্ধান পায় তা হলে আমাদের ওপর সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশা নেমে আসবে।

—নিশ্চিত থাকুন, কেউ তার সন্ধান পাবে না।

—এ কাগজটুকুর কি দাম ? আমাদের ওপর মুসিবত ডেকে আনতে পারে এমন কিছু কাছে রেখনা। যদি তাদের হাতে পড়ে, তাহলে তারা বলবে, কে পৌঁচিয়েছে ? কি ভাবে ? আর তা থেকে তারা নতুন কেস দাঁড় করাবে। তারা এর নাম দেবে জাতীয় খেয়ানত, গোয়েন্দাগিরি ও ষড়যন্ত্র ইত্যাদি বলে।

এ নিয়ে চিন্তা করে নিজেকে কষ্ট দেবেন না। জ্বীনও তার খোঁজ পাবে না।

নাবিলার আব্বা খাটের ওপর একটু এলিয়ে পড়লেন। তারপর হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে গেলেন। নাবিলার মা বসে বসে চিন্তা করছেন, আর থেকে থেকে হাত উঠিয়ে আল্লার দরবারে দোয়া করছেন। তাঁর দরবারে তিনি অভিযোগ জানাচ্ছেন, তাঁর বান্দাদের জুলুম, দেশের বিপর্যয় ও নির্দয় বাড়াবাড়ির জন্য। হঠাৎ নাবিলার আব্বা ঘুম থেকে জেগে এদিক ওদিক তাকালেন। তারপর বিড় বিড় করে বললেন—সব কিছুই ভাল ইনশাআল্লাহ্, সব কিছুই মঙ্গল ইনশাআল্লাহ। তিনি তার মুখ ও দাঁড়িতে হাত বুলাতে লাগলেন। নাবিলার মা স্বামীর দিকে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞেস করলেন—কি ?

তিনি হাত দিয়ে ইশারা করে জোর দিয়ে বললেন—যেন এটা এক বাস্তব সত্য। আল্লার কসম, নাবিলার মা ! ঘুমের মধ্যে তাকে আমি দেখলাম, অত্যন্ত আগ্রহ-সহকারে সে আমার সাথে গলাগলি করছে, আমার মাথা, মুখে ও হাতে চুমু দিচ্ছে। আর আমরা খুশির আতিশয্যে কেঁদে ফেললাম। নাবিলার মা, স্বপ্নে খুশী হওয়ার তাবীর হল প্রশস্ততা লাভ করা। আমরা অনেক কথা বলাবলি করলাম।

মা লাফিয়ে উঠে বললেন—দেশের সীমান্তও চৌকিতে দাঁড়িয়ে থাকা শয়তান-দের আপনি কিভাবে অতিক্রম করলেন ?

—ওহে নারী, আমাকে ঠাট্টা করো না।

—চিরকালই আমরা স্বপ্ন দেখে যাব। আমাদের সারাটি জীবনই একটা স্বপ্ন হয়ে গেলো।

—নাবিলার মা, এটা আল্লার একটা রহমত। কসম করে আমি তোমাকে বলছি, আমি ঘুম থেকে জেগে পূর্ণ পরিতৃপ্তি ও আনন্দ অনুভব করছি। তাকে এক নজর দেখার জন্য আমি তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠেছিলাম।

নাবিলার মা উঠে দাঁড়িয়ে তার লাঠিতে ভর দিয়ে বললেন—উতওয়া আল-

মালওয়ানী সর্বক্ষণ আমাদের ধমক দিচ্ছে এবং সে বলছে, আমাদের নাকি কঠিন মূল্যই দিতে হবে।

—এই পাপীকে নিয়ে তুমি এত চিন্তা কর কেন?

—আমার ভয় হয়, সে তাকে হত্যা করে ফেলে কি না।

—সে পারে কেবল কারাগারে আটক ব্যক্তিদের হত্যা করতে।

—আর আপনার মেয়েকে? সে এমন কি অস্ত্রের অধিকারী?

—সে এখন মুক্তি, স্বাধীনতা ও সাহসিকতাপূর্ণ কথাবার্তার মালিক। আর এর দ্বারাই সে তাকে হত্যা করতে পারে।

ধীর পদক্ষেপে বাইরের দিকে যেতে যেতে মা বললেন—আমি আপনার স্বপ্নের ব্যাপারে কেবল সন্দেহ পোষণই করে গেলাম।

নাবিলার কুয়েত ছেড়ে তুরস্কে চলে যাবার খবর শুনে তার পরিবারবর্গ ভীষণ ভাবে দুঃখ পেলো। কুয়েতে নাবিলার সাথে কর্মরতা তার এক বান্ধবীর মাধ্যমে একটি চিঠি দিয়ে সে তাদেরকে এ খবর জানিয়ে দিয়েছে। হতভাগ্য পিতা ভীষণ ভাবে মানসিক অশান্তি ভোগ করতে লাগলেন, আর মা প্রাণ খুলে কাঁদা শুরু করলেন। তারা বুঝতে পারলেন, অত্যাচারীর হাত দেশের সীমান্ত পেরিয়ে বহু দূরেও সম্প্রসারিত হতে এবং শাসকদের শত্রুতা ও কুট-কৌশল সেখানেও পৌঁছাতে পারে। প্রথম প্রথম তারা ধারণা করেছিল, নির্মম পুলিশী চক্রের হাত থেকে তাদের মেয়ের মুক্তি তার জীবনে শান্তিও নিরাপত্তা বয়ে নিয়ে আসবে। আর আজ কিনা তার এ পরিণতি? বিপর্যয়ের সাথে দ্বন্দ্ব ও সংঘাত কি সম্ভব? সত্য কথা দ্বারা অত্যাচারীর মোকাবিলা করা একটা বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়।

মা আবার কান্নাও বিলাপ শুরু করলেন, আর পিতা নিরবতা অবলম্বন করলেন। কিন্তু কতক্ষণ নিরব থাকতে পারেন? কিছু বলা ত উচিত। কমপক্ষে মা বেচারীকে শান্তনা দেয়া এবং যত কমই হোক তার অন্তরে স্থিরতা ফিরিয়ে আনা তার কর্তব্য। খুক খুক করে কেশে গলাটা পরিস্কার করে নিয়ে কিছু গাম্ভীর্যের ভান করে তিনি বললেন—নাবিলার মা, এত ভেঙ্গে পড়োনা। তোমার মেয়ের একারই এ দশা নয়।

—বিদেশ-বিভূঁয়ে কে তার দেখা শুনা করবে?

—তার মহান সৃষ্টিকর্তা। আমরা সবাই ত তার বান্দা।

নাবিলার মা কোন উত্তর দিচ্ছে না দেখে তিনি আবারো বলতে থাকলেন—তোমার মেয়ের সাথে আছে অসংখ্য সম্ভ্রান্ত ও আদর্শবাদী ব্যক্তিবর্গ। তারা বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

—তুরস্কেও?

—হ্যাঁ তুর্কীতেও। তুমি কি ভুলে গেছ, সেটা ছিল ফলে-ফুলে সুশোভিত ইসলামী খিলাফতের দেশ?

—এ সম্পর্কে আমি কিছুই জানিনা। কিন্তু আমার ধারণা, তারা আমাদের

ভাষায় নয় বরং অন্য কোন ভাষায় কথা বলে। সেখানে আমাদের কোন আত্মীয়-স্বজন ও পরিচিত কেউ নেই।

তিনি তার কথা থামিয়ে দিলেন এই বলে—তোমার মেয়ে শিক্ষিতা ও বয়স্কা। কিভাবে কি করতে হবে সে তা জানে।

দূরে বহু দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে মা বললেন—আব্দুল্লা! আল্লার এ দুনিয়া প্রশস্ত। প্রবাস জীবন এক প্রকার বিশ্বাসহীনতা। আর নিসঙ্গ জীবনও বড় তিক্ত। আপনার ভুলে গেলে চলবে না, সে পুরুষ নয়, সে মেয়ে, তার মায়ের কলিজার টুকরা।

আব্দুল্লাহ উচ্চস্বরে হেসে উঠে বলতে লাগলেন—ওহে নারী, ঘুম থেকে জাগো। মেয়েরা এখন হাতিয়ার কাঁধে নিয়ে যুদ্ধে যাচ্ছে, মন্ত্রীত্বের পদও অলংকৃত করছে। আমার কথা তুমি বিশ্বাস করো, কখনো কখনো হাজার হাজার পুরুষের মধ্যে একজন মাত্র মেয়েই কাজ করে। আজকের দিনের মেয়েরা আগের দিনের মেয়েদের থেকে স্বতন্ত্র।

ফিস্ ফিস্ করে নাবিলার মা বললেন—আগের যুগের দিনগুলির উপর আল্লাহ রহম করুন। নারী ঘরের জন্যে। রাজনীতি ও নানা রকম পরিশ্রমের কাজ তাদের জন্যে নয়। হায়, তারা সবাই যদি আমার মত হতো!

নাবিলার মা, এ এমন একটি ব্যাপার যে ক্ষেত্রে আমাদের কোন কল্পনা চলে না। এ বিশ্ব সর্বদাই পরিবর্তনের পথে। আর জ্ঞান হলো আলো। নাবিলার জ্ঞান আমাদের জন্য দুঃখ ও বেদনা ছাড়া আর কিছুই বয়ে নিয়ে এলনা।

নিকটবর্তী মসজিদ থেকে ফজরের আযানের আওয়ায ভেসে এলো। তাঁরা দু'জনই অজু করার জন্যে বাথরুমের দিকে চলে গেলেন। সম্পূর্ণ নিরবতা নেমে এল। তাঁদের অন্তর দু'টি আল্লার স্মরণে বিনয়ে গলে গেলো। কিছুক্ষণ পর আবদুল্লাহ ও তাঁর স্ত্রী দু'জনে এক সাথে নামাজ আদায় করলেন। কুনুত পাঠের সময় তাঁদের অন্তরের একনিষ্ঠ দোয়া যেন আকাশের দরজায় গিয়ে আঘাত করতে লাগলো। পেছন থেকে নাবিলার মা অশ্রুভেজা চোখে কেবলই 'আমীন' শব্দটি আওড়িয়ে যেতে থাকলেন।

২৮

রেযেক ইবরাহীমের উজ্জল বাদামী রং এর চেহারায় একটা গভীর ব্যথার ছাপ সুস্পষ্ট। সে বলল—পাল্লা ত পুরেই গেছে। ব্যাপারটি এভাবে আর দীর্ঘকাল চলতে দেয়া সম্ভব নয়।

আবদুল হামীদ নাজ্জারের শরীরের বহু ক্ষত শুকিয়ে কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছে। সে একটু উৎফুল্লভাবে বলল—এখন সময়ের কথা আর উঠিও না।

—কেন?

—কেননা, এ সংঘাত দীর্ঘকাল ধরে চলবে।

রেযেক সোজা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সেলের অভ্যন্তরে ছোট্ট খিড়কিটির দিকে

ঘাড় বাড়িয়ে দিয়ে আস্তে করে বলল—আমার বিশ্বাস, ইনশাআল্লাহ খুব শিগ-গিরই সেদিন আসছে, যেদিন উতওয়া আল-মাওয়ানী ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের এই সেলে টেনে আনা হবে। কিন্তু কখনই তাদের অবস্থা আমাদের মত মনে হবে না।

আবদুল হামীদ প্রশ্ন করল—কেমন হবে?

—আমরা তাদের প্রতিহত করব ন্যায়ের ভিত্তিতে। গ্রীষ্মের দুপুরে প্রচণ্ড গরমের সময় আমাদের মহান আদর্শের স্নেহময়ী ছায়া তাদেরকে সূর্যের তাপ থেকে রক্ষা করবে। আর তারা……

আবদুল হামীদ তার কথা কেটে দিয়ে বলল—তাদেরও বিশ্বাস, তারা আদর্শবাদী।

—অসম্ভব, তারা একদল ভাড়াটিয়া লোক। যখন তাদের পতন হবে এবং প্রকৃত জাতীয় বিচারক মণ্ডলী তাদের কৃতকর্মের বিচার করবেন তখন খুব তাড়াতাড়িই তারা উপলব্ধি করবে, তারা এক শূণ্যের দিকে ধাবিত হয়েছে। একটা সব হারানোর অনুভূতি তখন তাদেরকে ভীষণ কষ্ট দেবে এবং তারা অনুশোচনায় জর্জরিত হতে থাকবে। আর এটা মৃত্যু থেকেও জঘণ্যতর শাস্তি। তুমি যদি তখন তাদের কোন ব্যক্তিকে আত্মহত্যাও করতে দেখ, তাহলে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

যে মা'রুফ হাদারীকে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নিরবতা অবলম্বন করে সংযমের পরিচয় দিতে দেখা গেছে, সে অনুচ্চকণ্ঠে বলল - মাহমুদ সাকার ও তার সঙ্গী সাথীদের রক্ত কখনই বৃথা যেতে পারে না।

কবি ইউসুফ তার জবাবে বলল—তারা আল্লার প্রশস্ত আঙ্গিনায়। তারা শ্রেষ্ঠ প্রতিদানই লাভ করেছে। এখন তারা এ বিশ্ব ও এর অধিবাসীদের প্রতি করুণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে।

সামরিক কারাগারের প্রশস্ত আঙ্গিনায় অসংখ্য মানুষ সারি সারি দাঁড়িয়ে। তারা সুশৃংখলভাবে তিন তিনটি সারিতে ভাগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাবলিক প্রসি-কিউটর, উতওয়া আল-মালওয়ানী, অন্যান্য সামরিক অফিসারবৃন্দ, সাধারণ সৈনিক ও কুকুরগুলি, সকলেই উপস্থিত। উতওয়া বক্তৃতা দিতে উঠেছে। আগামীকাল কিভাবে বিচার কাজ শুরু হবে তা ব্যাখ্যা করছে। প্রত্যেকেই তার বিরুদ্ধে উত্থা-পিত অভিযোগের একটি কপি গ্রহণ করবে এবং প্রত্যেকেই নতুন করে অনুসন্ধানের ফাইলে স্বাক্ষর করবে। স্বাক্ষর করা থেকে বিরত থাকা অথবা ফাইলে লিপিবদ্ধ কোন কথা অস্বীকারের ব্যাপারে সকলকে সতর্ক করে দিল। যদি কেউ বিচারকের সামনে একথা বলে ফেলার চেষ্টার করে যে এ স্বীকৃতি তার কাছ থেকে জোর-জবরদস্তি করে আদায় করা হয়েছে অথবা কেউ তাকে এ ধারণা দেবার চেষ্টা করে যে, তাকে শাস্তি দেয়া হয়েছে, তাহলে সে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ভোগ করবে। তাছাড়া তার ফলাফল ও পরিণতিতে কোনই পরিবর্তন হবে না। বিচারের রায় ত পূর্বেই তৈরী হয়ে গেছে। এমনকি বিচারক নিজেও তাতে কোন পরিবর্তনের ক্ষমতা রাখে না।

তাদেরকে সে একথাও বুঝাল যে, এ বিচারে তাদের পক্ষে কোন উকিল নিয়োগেরও কোন সুযোগ নেই। বিচার কাজ সমাধা হবে গোপনে ও খুবই তাড়াতাড়ি। অকারণে সময় ও অর্থ নষ্ট করার কোন মানে হয় না। যাহোক সে তাদেরকে এ আশ্বাসের বাণীও শোনাল যে, সরকার কারো ওপর জুলুম করবে না। আর প্রত্যেকের অধিকার পুরোপুরি দিয়ে দেবার জন্যে প্রেসিডেন্টও সব সময় নির্দেশ দিচ্ছেন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী বিচার কাজ দ্রুত সম্পন্ন হবার গুরুত্বের কথা জোর দিয়ে বললো। এক একজন ব্যক্তির বিচার কাজ কয়েক মিনিটের বেশী দীর্ঘ হবে না। কেননা, সব জিনিসই ত জানা ও নির্ধারিত এবং স্বীকৃতিও প্রস্তুত। বাকী শুধুমাত্র কিছু গাৎবাঁধা সওয়াল-জওয়াব। রায় ঘোষণার পর অভিযুক্তদের কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হবে। নির্দোষ ব্যক্তিরা এক স্থানে, শাস্তি মুলতবী ব্যক্তিদের অন্য আর এক স্থানে, কারাদণ্ড প্রাপ্তদের ভিন্ন এক এলাকায়, সশ্রম কারাদণ্ড প্রাপ্তদের পৃথক এক স্থানে এবং মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্তদের স্বতন্ত্র সেলে রাখা হবে। প্রত্যেক আসামীই নিজ নিজ কান খুব সতর্ক রাখবে, যাতে তার সম্পর্কে ঘোষিত রায় সে শুনতে পারে। তারপর কারাদণ্ড প্রাপ্ত ও সশ্রম কারাদণ্ড প্রাপ্ত আসামীরা পৌরকারাগারে চলে যাবে। যাদের বিচার কাজ সমাধা হয়নি এমন কয়েদীরা ছাড়া আর কেউই সামরিক কারাগারে থাকবেনা। তেমনিভাবে নির্দোষ ও শাস্তি মুলতবী ব্যক্তিরাও তাদের সাথে মিলিত হবে। কোনভাবেই কাউকে এ মুহূর্তে মুক্তি দেয়া হবে না।

একজন অফিসার আসামীদের একজন একজন করে নাম ধরে ডাকতে শুরু করল। প্রত্যেকের হাতে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র প্রদান করে প্রথমে ফাইলে, তারপর অভিযোগ পত্র গ্রহণের ইকরারমূলক স্বাক্ষর গ্রহণ করতে লাগল। সেখানে আসামী এই মর্মে অন্য একটি স্বীকৃতিমূলক স্বাক্ষরও দিল যে, কোন প্রকার মানসিক বা দৈহিক জোর-জবরদস্তি ছাড়াই স্বেচ্ছায় সে এই জবানবন্দী দিয়েছে। কোন কোন আসামী হাতে যখম থাকার কারনে স্বাক্ষর করতে অক্ষম ছিল। তাদের দু'আঙ্গুলের মাঝে কলম ভরে দিয়ে একজন ওয়ারেন্ট অফিসার পঙ্গু হাতটি ধরে ধরে তাদের নামটি লিখে দিল।

প্রতিটি কয়েদীই আপন আপন সেলে ফিরে এল। আর তার সাথে করে নিয়ে এল তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের একটি তালিকা। প্রতিটি অভিযোগই ছিল প্রায় এক রকম। প্রায় সবগুলিতেই বলা হলো—অমুক বছরের অমুক মাসের এত তারিখে সে বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে কতগুলি কাজ করেছে। একটি গোপন সশস্ত্র সংগঠনের যোগসাজশে বর্তমান শাসন ব্যবস্থাকে জোর করে পাল্টে ফেলার চেষ্টাও করেছে। আর অন্য কতগুলি অভিযোগ পত্রে লেখা ছিল—দেশের স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর ও জোরপূর্বক শাসন ক্ষমতা পাল্টে দেবার উদ্দেশ্যে একটি গোপন আর্থিক যোগনদার চক্রের সাথে সে অংশগ্রহণ করে।

অথচ সে সব কয়েদী বা দণ্ডপ্রাপ্ত আসামীর আয়-উপার্জনের উৎস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বিশেষত, ছোটখাট ব্যবসায়ী ও অন্যান্য পেশার লোক, তাদের পরিবারবর্গের জন্যে কিছু চাঁদা ও সাহায্য সংগ্রহ করা ছাড়া ব্যাপারটি তেমন কিছু ছিল না। তাছাড়া আরো অনেক মজার মজার অভিযোগও তাতে ছিল। যেমন কোন ব্যক্তির কৌতুকের জন্যে, অথবা কোন রাজনৈতিক অবস্থার জন্যে সমালোচনা, প্রেসিডেন্টের মৃত্যু কামনা, কোন ইখওয়ানী পরিবারের সাথে সাক্ষাত করা অথবা তাদের প্রতি ভ্রাতৃসুলভ আচরনের জন্যে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করান হয়েছে।

বন্ধুদের সকলেই একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে। রেযেক ইবরাহীমের বিরুদ্ধে দশ বছরের কারাদণ্ডের রায় ঘোষিত হয়েছে। মারুফ হাজারীর শাস্তি মুলতবী করা হয়েছে। আবদুল হামীদ নাজ্জারের দশ বছর, কবি ইউসুফ নির্দোষ। গভীর আবেগের সাথে ইখওয়ানীরা পরস্পর কোলাকুলি করল। এখন বিদায়ের মুহূর্ত। সকলের দু'চোখ বেয়ে পুতঃপবিত্র অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছে। মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে কবি ইউসুফ বললো—মোটের ওপর পৌরকারাগার সামরিক কারাগার থেকে হাজার গুণ উত্তম! সেখানে তোমরা কিছুটা শান্তি পাবে। দণ্ডপ্রাপ্ত ও নির্দোষ ব্যক্তি সকলেই জেলখানায় আবদ্ধ থাকবে। তাদের স্থানের হেরফের হবে এই যা। আর যেদিন আল্লার ইচ্ছা হবে, আমরা সকলেই মুক্তিলাভ করবো ইনশাআল্লাহ।

অস্ফুট স্বরে মা'রুফ হাজারী বলে উঠল—সমগ্র দেশটিই একটি বৃহদাকৃতির জেলখানা।

একটি অর্থপূর্ণ মৃদু হাসি হেসে রেযেক বলল—আমার পক্ষে কথা বলার জন্যে উকিল নিয়োগ এবং আমার ব্যাপারটি সুদানী দূতাবাসকে অবগত করার আবেদন জানালাম। 'একটা অর্থহীন দর্শন' এই বলে বিচারক প্রত্যাখ্যান করল। তাছাড়া আমাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপও করল। সে বলল—মিসর ও সুদান একই দেশ।

তার কথার সূত্র ধরে আবদুল নাজ্জার বলল—আমি তাদেরকে বললাম, আমাকে ফিলিস্তিনে ফিরিয়ে দাও। এখানে জেলে বন্দী থাকার পরিবর্তে সেখানে আমি মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে পারব। সেখানে আমি মারা যাব এবং তোমরাও শান্তি পাবে।

তার কথার জবাবে রেযেক প্রশ্ন করল—তারা কি উত্তর দিল?

আদালতের মঞ্চে উপবিষ্ট ব্যক্তিরা একে অপরের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসি বিনিময় করল। তারপর একজন সৈনিক আমার কাপড় ধরে পেছনের দিক টেনে নিয়ে গেল।

গজ গজ করতে করতে আবদুল হামীদ বলল—আদালতটি ছিল একটা ধোঁকাবাজী। বিচারক, প্রসিকিউটর কেরানী ও রক্ষী সবই ছিল একটা প্রহসন। দেশের কোন লোকই আমাদের দেখল না অথবা আমাদের কথা শুনতে পেল না।

মা'রুফ তার কথার প্রতিবাদ করে বলল—আল্লাহ আমাদের সাথী। আর তিনিই সর্বশক্তিমান।

বাঁশি বাজান হল। প্রত্যেকেই নিজ নিজ সামান্য আসবাবপত্র কাঁধে নিয়ে রুটিন অনুযায়ী আপন আপন নতুন স্থানে চলে গেল। পরদিন প্রত্যুষে তারা কতকগুলি দ্বার রুদ্ধ সরকারী বাসে সম্মিলিত হল। এ বাসগুলিই তাদেরকে 'তুরাহ্, কুরাহ্ ময়দান, সিজনু মিসর, কিলয়া, ওয়াহাত, আসিয়ুত, আল-মুনিয়া ও বনি সুয়াইফের বেসামরিক কারাগার গুলিতে নিয়ে যাবে! হাত-পায়ে বেড়ী বাঁধা বাসের বাধ্য যাত্রীরা স্বয়ংক্রিয় ষ্টেইনগান ধারী প্রহরীদের নিয়ন্ত্রনে 'মাকাবি-রুল খফীর' নামক স্থান থেকে যাত্রা শুরু করল।

তখন বেলা ওঠেনি। একজন ইখওয়ানী অকস্মাৎ চিৎকার করে উঠল—আল্লাহু আকবর ওয়া লিল্লাহিল হামদ। আল্লাহ মহান। সকল প্রশংসা তারই।

সংগে সংগে পেছন থেকে অসংখ্য কণ্ঠস্বরে একই আওয়ায ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হাতে থাকে। ফলে সামরিক কারাগারের বাইরের প্রহরীরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। এ তকবীর ধ্বনি প্রভাতের নিরবতার বক্ষ বিদীর্ণ করে নির্মল আকাশে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে থাকলো।

'আল্লাহ আমাদের লক্ষ্য
রাসূল আমাদের নেতা
কুরআন আমাদের জীবন বিধান
জিহাদ আমাদের পথ
আল্লার রাস্তায় মৃত্যু আমাদের মহান আকাংখা
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ—আল্লাহ ছাড়া নেই অন্য কোন ইলাহ
আমরা কেবল তাঁরই ইবাদাত করি
তাঁর প্রতি নিষ্ঠাবান হয়ে, যদিও অবিশ্বাসীরা অসন্তুষ্ট হয়
জুলুমের অবসান হোক
স্বাধীনতা... .....স্বাধীনতা.........ওরে মানবতার দুশমনরা
স্বাধীনতা.........স্বাধীনতা.........ওরে আধ্যাত্মিকতার শত্রুরা।

কিছুক্ষণ পর আবার নিরবতা নেমে এলো। কোন কোন সৈনিকের চোখে অশ্রু দেখা গেলো। সত্যিই এটা ছিল এক আশ্চর্য ব্যাপার। পেছন দিক থেকে একজন অফিসার বিমর্ষভাবে তাকালো। হাতে তার মেশিনগান। মৃদু কাঁপতে কাঁপতে সে বলল—তোমরা ভালো করে শুনে রাখো! এসব হৈ হট্টগোলের কোন অর্থ নেই। এতে তোমাদের ক্ষতি ছাড়া কোন ফায়দা হবে না। তোমরা এক কারাগার থেকে অন্য কারাগারে ঘুরে বেড়াবে। তোমরা সব সময়ই সরকারের হাতের মুঠোয়। তোমাদের জীবনের কোন দাম নেই। আমার এ মেশিন গান দিয়ে ব্রাশ ফায়ার করে তোমাদের শেষ করে ফেলার স্পষ্ট নির্দেশ আমার কাছে আছে। কিন্তু আমাদের ওপর দয়া করো। আমি আল্লাহকে ভয় করি।

সবাই শান্ত হয়ে গেলো। তারা গাড়ীর ছোট ছোট ছিদ্র পথে বাইরের মানুষ, কবরস্থান, বাড়ী-ঘর ও গাছ-গাছালির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

এমন চমৎকার দৃশ্য তারা দীর্ঘদিন দেখেনি। প্র ভাতের আবছা অন্ধকারে কায়রোর মসজিদের মিনার ও প্রশান্ত নগরীতে জীবনের স্পন্দন শুরু হয়েছে এবং পাখীদের কল-কাকলীতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠেছে। আর দয়া-মমতায় পরিপূর্ণ একটি প্রশস্ত বক্ষের ন্যায় 'মাকতাম' পর্বত যেন শহরটিকে ঘিরে রেখেছে।

'কিলয়া' কারাগারেব নিকটবর্তী 'কুরাহ ময়দান' কারাগারে তাদের একটি দল পৌঁছলো। দরজা খুলে দেয়া হল এবং সশস্ত্র সৈনিকদের প্রহরায় তারা একের পর এক ভিতরে প্রবেশ করলো। তারপর কারাগারের দরজা বন্ধ করে দেয়া হলো। তাদের সকলেই যখন কারাগারের নিজ নিজ স্থানে পৌঁছে গেলো তখন সৈনিক কমাণ্ডার একটা শান্তির নিশ্বাস ছেড়ে বলল—আলহামদুলিল্লাহ্। সকল প্রশংসাই আল্লার। বৎসগণ! তোমরা শোন। তোমাদের প্রত্যেকেই মুখ খোলার ব্যাপারে সতর্ক হয়ে যাও। আমাদের দায়িত্ব শেষ হয়েছে। কোন ব্যাপারে আমাদের কোন কর্তৃত্ব নেই।

নিরাপত্তা বিভাগের একজন সৈনিক বললো—মহান আল্লার কসম। বেগ সাহেব এরা বড় হতভাগ্য। আমার অন্তরটি ছিঁড়ে যাচ্ছে। গোলাপের মত সুন্দর সুন্দর যুবক এরা সব। হায় পোড়া কপাল।

বড় অফিসার চিৎকার করে বলে উঠলো—সিপাই, তুমি সতর্ক হয়ে যাও।

ইলেক্ট্রিকে শট খাওয়া ব্যক্তির ন্যায় সৈনিকটি যেন ছিটকে পড়লো। মুহূর্তেই নিজেকে সম্বরণ করে নিয়ে স্যালুট ঠুকতে ঠুকতে বলে উঠলো—তামাম ইয়া আফিন্দাম।

—তোমাকে আমি হাজার বার বলেছি, আমি একজন আদিষ্ট গোলাম মাত্র। রাজনীতির ব্যাপারে আমাদের কোন হাত নেই। সরকার যা বুঝে তাই সঠিক। আমাদের পিছনে অনেক দায়িত্ব রয়েছে, আমাদের পরিবার-পরিজনও আছে। ওরে জন্তু-জানোয়ারের দল, হারাম তোদের জন্যে। একথা বলে অফিসারটি সিগারেটে আগুন ধরালো। তারপর হাত দিয়ে ইশারা করে বলল—যাই। পুনরায় ফিরে এসে বললো—তোমরা এখানে অপেক্ষা কর। কারারক্ষীরা তাদেরকে সেলের ভিতরে প্রবেশ করিয়ে নিক এবং কারাগারের পরিচালকের প্রাপ্তি স্বীকারের স্বাক্ষর হয়ে যাক। আল্লাহ যেন এমন দায়িত্ব আমার উপর দ্বিতীয় বার না চাপান। আল্লার কাছে পানাহ চাই।

কয়েদীরা সবাই কারাগারের হলুদ বর্ণের পোষাক পরিধান করলো, তারা নিজ নিজ নাম, অতীত পেশা ও ঠিকানা রেজিষ্ট্রি করে, দু'চারটা পয়সা ও কয়েক টুকরা কাপড় যা তাদের কাছে ছিল, তা জমা দিল। তারপর তারা দীর্ঘ লাইন সহকারে তাদের জন্যে নির্ধারিত সেলের দিকে চলতে শুরু করলো। তাদের মাধ থেকে এক ব্যক্তি আস্তে আস্তে বললো—তকদীরে যা আছে তা হবেই। তকদীরের লিখন থেকে বাঁচা সম্ভব নয়। আমাদের কারাগার একান্ত ও নিরিবিলি। হে

আল্লাহ, তোমার দ্বীনের রাস্তায় আমাদের এ কারাবাসকে কবুল করে নাও, তোমার নৈকট্য দান কর, হে আসমান ও যমীনের মালিক!

আবদুল হামীদ নাজ্জার ও রেযেক ইবরাহীমের ভাগ্যে লেখা হলো আসিউতের কেন্দ্রীয় কারাগারে যাওয়া। ট্রেনে আসিউতে যাবার রাস্তা খুবই দীর্ঘ। প্রতিটি ষ্টেশনে ট্রেন থামছিল। সব জায়গায়ই ছিল কড়া পাহারার ব্যবস্থা। তাদের কথিত 'রাজনৈতিক বন্দীদের' শ্লোগানে আকাশ-বাতাস ছিল মুখরিত। তাদের দাবী ছিল জনগণের স্বাধীনতা, সরকারের শাসন পদ্ধতির প্রতি তীব্র ঘৃণা এবং আল্লার কিতাব ও রসুলের সুন্নতের দিকে প্রত্যাবর্তনের আহ্বান। সেনাবাহিনীর কর্ডনের পেছনেই জনগণ দাঁড়িয়ে তাদের জন্যে আহাজারি ও বিলাপ করছিল! অনেকের চোখেই অশ্রুবিন্দু ঝিকমিক করে উঠছিল। তারা কারাগারে পৌঁছার পরেই একজন ইখওয়ানী গেয়ে উঠল—'আসিউত কারাগারে আমরা সবাইকে ভালোবাসবো, আমরা পরেছি প্যাণ্ট ও নেকটাই, তুলে ধরে রেখেছি শুধু এই মাপাটাই, সার্জেণ্ট আমাদের তুলোধুনা করেছে, আমাদের পোশাক তারা কেড়ে নিয়েছে, আমাদের রব আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন, আমরা সকলে জান্নাতে প্রবেশ করবো।'

অন্য একজন গীতিকার তার জবাবে বললো—'কিলয়া' কারাগারে আমরা সবাইকে ভালোবাসবো, ধৈর্য আমাদের পথ চলার সম্বল, দাওয়াতের প্রতি আমাদের আকর্ষণকে তারা বাড়িয়ে দিয়েছে। আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন, আমরা সকলে জান্নাতে প্রবেশ করবো!'

প্রথম গীতিকার আবার গেয়ে উঠলো—'আমরা সবাই প্রবেশ করলাম 'কুরাহ ময়দান, কারাগারে খোদার কসম! জুলুম সবখানে সার্জেণ্ট, আমাদের চিৎকার করে বলল, শোন! আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন, আমরা সকলে জান্নাতে প্রবেশ করবো।'

কারারক্ষীরা এসব সংগীত শুনছিল, আর তারা তাদের মৃদু হাসিও ভীতি লুকাবার চেষ্টা করছিল। একজন তার ঠোঁট দু'টি একটু চেটে নিয়ে বললো—লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ.........। আমার জীবনে তোমরাই হলে প্রথম কয়েদী যাদেরকে আমি হাসতে হাসতে ও গান গাইতে গাইতে কারাগারে প্রবেশ করতে দেখলাম। মনে হচ্ছে, তোমাদের ওপর যে মুসিবত নেমেছে সে সম্পর্কে তোমাদের কোন উপলব্ধি নেই। এসব যুবকদের জন্যে আফসোস হয়।

প্রতিটি বড় সেলে বিশজন করে ঢোকান হল। দীর্ঘ ভ্রমণে সকলেই বড্ড ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত ছিল। প্রত্যেকেই একটা মোটা কম্বল গায়ে দিয়ে একটা কাঠের শক্ত খাটিয়ার ওপর গা এলিয়ে দিল। রেযেক ঘুমালো আবদুল হামীদের পাশে। সে ফিস্‌ফিস্‌ করে প্রশ্ন করলো—কি চিন্তা করছ?

আবদুল হামীদ বললো—চিন্তা করছি, 'গাজা' থেকে আমার পরিবারের লোকেরা আমার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে এখানে কিভাবে আসবে? খুবই দীর্ঘ

রাস্তা। রেযেক তুমি বিশ্বাস কর, আমাদের জন্যে আমাদের পরিবার-পরিজনেরা ভীষন কষ্ট পাচ্ছে।

রেযেক বললো—তারা এর বিরাট প্রতিদান পাবে। তারাও আমাদের দুঃখ-বেদনায় অংশ নিচ্ছে।

আবদুল হামীদ লাফ দিয়ে উঠে বসে বললো—এখানে আমরা কত বছর থাকবো বলে তুমি মনে কর?

—সবই তাঁর অনুগ্রহ।

—রেযেক, কোন কোন সময় আমার এমন মনে হয় যে, আমি উঠে দাঁড়িয়ে কারাগারের প্রাচীর ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলি এবং উন্মুক্ত বিশ্বে বেরিয়ে পড়ে মুক্তি ও স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করি। রেযেক, কারাগার ভীষণ পীড়াদায়ক। এ দিনগুলি আমাদের বড্ড কষ্ট দিয়ে যাবে, আমাদের নিঃশেষ করে ফেলবে।

একজন অরাজনৈতিক কয়েদী তাদের দু'জনের কথাবার্তা শুনছিল। সে তাদের সামনেই বসেছিল। সে নিরবে মুচকি হাসতে হাসতে তাদের কথার মাঝখানে বলে উঠলো—প্রথম প্রথম তোমাদের একটু কষ্ট হবে। কিন্তু যতই দিন যাবে তোমরা অভ্যস্থ হয়ে উঠবে। যখন তোমরা সকালে উঠেই কাপড়ের কারখানায় কাজ করতে যাবে এবং সেখান থেকে সন্ধ্যায় ফিরবে তখন দিনগুলি কিভাবে যাবে তা তোমরা টেরই পাবে না। আমি দশ বছর যাবত কারাগারে। খুব তাড়াতাড়িই যেন বছরগুলো চলে গেলো। আমি ত একজন হত্যাকারী।

রেযেক প্রায় চেঁচিয়ে বলে উঠলো—হত্যাকারী?

—হ্যাঁ, আমার ভায়ের রক্তের বদলা নিয়েছি।

সাধারণ কয়েদী ও রাজনৈতিক কয়েদীদের মধ্যে কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনার ভিতর দিয়েই তারা একে অপরের সাথে পরিচিত হচ্ছিল। এক ঘণ্টার মধ্যেই তারা সকলে ঘুমিয়ে পড়লো।

২৮

তুরস্কের ইস্তাম্বুলে নামার পর নাবিলা এক ভীষণ কষ্টদায়ক একাকীত্ব অনুভব করতে লাগলো। কাউকে সে চেনে না, জানেনা। মধ্যম শ্রেণীর একটি হোটেলে থাকার সিদ্ধান্ত নিল সে। এভাবেই তাকে উপদেশ দিয়েছিল টেক্সি চালক, যে অতি কষ্টে ইংরেজীতে দু'চারটে কথাবার্তা বলতে পারে। বেশ কয়েক দিন নাবিলা হোটেলে কাটালো। এ দিনগুলিতে সে হোটেলের কর্মচারী ও হোটেলে অবস্থানকারীদের সাথে ভাব বিনিময়ের ব্যাপারে ভীষণ সংকট অনুভব করলো। ঘটনাক্রমে সেই একই হোটেলে অবস্থান রত ছোট্ট একটি ইরাকী পরিবার সেখুঁজে পেলো। তাদের সাথে পরিচিত হয়ে সে যে কতটুকু আনন্দিত হয়েছিল তা

ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। আসল ঘটনা হলো, এ পরিবারটি হোটেলে প্রায় এক সপ্তাহ কাটিয়েছে এবং তারা নাবিলাকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ দান করে। তাদেরই কথামত সে 'কিভাবে তুমি তুর্কী ভাষা শিখবে' বইখানি খরিদ করেছে। এ কারণেই সে মানুষের সাথে কথাবার্তা বলার জন্যে অপরিহার্য কতকগুলি বাক্য ও শব্দ মুখস্ত করতে সক্ষম হয়েছে। আর এর কল্যাণেই কিছু প্রাচীন যাদুঘর ঘুরে দেখা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। সেখানে সংরক্ষিত আছে উসমানী খলিফাদের প্রাচীন নিদর্শন, তাদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র এবং তাদের মহান ইতিহাসের অত্যাশ্চর্য কর্মকাণ্ডের কিছু স্বাক্ষর। সে বিখ্যাত মসজিদ 'আয়া সোফিয়া' ও অন্যান্য ঐতিহাসিক মসজিদগুলি পরিদর্শন করেছে। সে অত্যন্ত বিস্মিত হলো যখন সে সেই সব মসজিদ ও কায়রোর 'মসজিদুল কিলয়া' ও অন্যান্য মসজিদের মধ্যে বড় একটা মিল দেখতে পেলো। এমন কি ইস্তাম্বুলের রাস্তা-ঘাটের হোটেল-রেষ্টুরেণ্টে যে সব খাদ্য-খাবার ও মিষ্টি পরিবেশন করে তা অবিকল মিসরের হোটেল-রেস্তোরার অনুরূপ। শুধু কি তাই? বরং তুরস্কের কিছু মশহুর গানের সুরেও মিসরের মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহহাব, ফরীদ আল-আতরাশ ও আবদুল হালীমের সুরের অনুকরণ। আর তাতে প্রাচ্যের বৈশিষ্ট্যও বিদ্যমান।

প্রাচীন ইতিহাসের সুগন্ধি অনুভব করতে করতে নাবিলা একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলো। এখানেই প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামী সাম্রাজ্য, যা ছিল বিশ্ব ইতিহাসে পরিচিত সাম্রাজ্যগুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ। পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ও অষ্ট্রিয়ার পতন ঘটে এ সাম্রাজ্যের কাছে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, আজ আরবী ভাষা জানে এমন কোন লোক তুর্কী জাতির মধ্যে পাওয়া প্রায় দুঃসাধ্য। এমন কি খাঁটি আরবী শব্দগুলিও আজ তারা ল্যাটিন হরফে লিখে থাকে। এভাবেই তারা মহান ইসলামী উত্তরাধিকার ও বর্তমানের মাঝের দৃঢ় বন্ধন ছিন্ন করে ফেলেছে। ক্ষোভের সাথে গজগজ করে নাবিলা বলে উঠলো—'কামাল আতাতুর্ক! কেন তুমি এমনটি করলে? এটা একটা বড় ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা।'

নাবিলা তার এ সুযোগকে কাজে লাগাবার জন্যে উঠে পড়ে লেগে গেলো হঠাৎ করে সে কিবরিস, এথেন্স, রোম ও পার্শ্ববর্তী অন্যান্য দেশে বড় বড় শহর-গুলোয় সংক্ষিপ্ত ভ্রমণ শুরু করে। প্রত্যেক ভ্রমণে কোন একটি শহরে গিয়েই 'উতওয়া আল-মালওয়ানীকে' আঘাত করে একটি করে চিঠি সে লিখত। এমনি একটি চিঠিতে সে লিখলো……'ওরে নির্বোধ, শহীদদের রক্তে রঞ্জিত তোমার অপবিত্র হাত আর কখনো আমার নাগাল পাবেনা। আমি এখানে সভ্য দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরছি, আর দেখছি মানুষ এখানে কিভাবে জীবন যাপন করে। তার এখানে স্বাধীনতা, প্রেম ও পরিচ্ছন্ন জীবনের স্বাদ উপভোগ করে থাকে। আর তুমি, ওহে বিকারগ্রস্থ! শয়তানী মেহরাবে নির্দোষ ব্যক্তিদের মাথার ওপর আজাবের বোঝা চাপিয়ে দেবার আরাধনায় রাত্রি-দিনের প্রতিটি প্রহর অতিবাহিত করে থাক। তুমি কোন ধরনের পশু!

তুমি তোমার ক্রোধের অনলে জ্বলে পুড়ে মর। সামনে এমন একদিন আসবে যেদিন তোমাকে কঠিন হিসাব দিতে হবে। তুমি একজন অধঃপতিত ভবঘুরে মানুষ। তোমার জীবনের কোন মূল্য নেই। তুমি জাননা আদর্শের দীপ্তি এবং আল্লার কুদরতকে যারা জেনেছে তাদের মধুরতা।
ওহে বৃদ্ধ শিশু! আমার এ চিঠি গোয়েন্দা বিভাগের লেখকের কাছে নিয়ে যেতে যেন ভুলো না, তাহলে তারা তোমার দুরাশা ও শিশুসুলভ বিদ্বেষকে নিয়ে হাসি-তামসা করে একটু আনন্দ উপভোগ করতে পারবে।'

এসব চিঠি-পত্র পড়ে উতওয়ার প্রায় মাথা খারাপ হওয়ার উপক্রম হত। সত্যি সত্যিই সে এগুলি নিরাপত্তা বিভাগে নিয়ে গিয়ে নাবিলার ফাইলে জমা দিত। এভাবে সে তার বিরুদ্ধে একটির পর একটি দলিল প্রমাণ সংগ্রহ করতে থাকে। সে আশা করে তারা তার কথায় প্রভাবিত হয়ে নাবিলার আব্বাকে গ্রেফতার করে নানা রকম শাস্তির স্বাদ চাখিয়ে ছাড়বে।

তুর্কীতে একমাস অতিবাহিত হবার পর আবদুল আজীজ সীসীর একটি চিঠি নাবিলার কাছে পৌঁছলো। তাতে তিনি লিখেছেন, এক সপ্তাহ পর নাবিলা যেন বৈরুতে তাঁর সাথে দেখা করে। বৈরুত যেতে এবং সেখানে বড় একটি প্রকাশনা সংস্থার বাড়ীতে আবদুল আজীজের সাথে দেখা করতে নাবিলার তেমন একটা অসুবিধা হলো না। সেই প্রকাশনা সংস্থাটি কেবলমাত্র ইসলামী বই-পুস্তক প্রকাশ করে থাকে। বৈরুতে নাবিলার প্রথম দিকের দিনগুলি অতিবাহিত হলো সেখানে অবস্থানরত বহু সংখ্যক ইখওয়ানী মোহাজের নারী-পুরুষ ও পরিবারের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করে। তাছাড়া বিভিন্ন দল ও সংগঠনের বিপুল সংখ্যক রাজনৈতিক শরনার্থীদের সাথেও সে দেখা করলো। বৈরুতে লেখা, আলাপ আলোচনা ও সভা সমিতির ক্ষেত্রে স্বাধীনতার পরিবেশ দেখে নাবিলা বিমুগ্ধ হয়ে গেলো। কিন্তু সাথে সাথে তার অন্তরে একটা প্রচ্ছন্ন ভীতিও বিরাজ করতে লাগলো। এ স্বাধীনতা যে খুবই চমৎকার তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু হাইজ্যাক, অপহরণ ও প্রতারণা যে কোন মুহূর্তেই ঘটতে পারে। তা সত্বেও নাবিলা বুঝতে পারলো তার শিক্ষা ও জ্ঞানের পরিধি দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক পত্র পত্রিকাগুলিতে স্ববিরোধীতা থাকলেও তাতে সবকিছু সম্পর্কে লেখা থাকে এবং চলতি ঘটনাবলীর বিবরণ পাওয়া যায়। সেখানে এমন কোন বিষয় নেই যে সম্পর্কে লেখা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সেখানে আছে ইবাদতের স্বাধীনতা, নারী পুরুষের অবাধ মেলা মেশার স্বাধীনতা, ব্যবসা, কঠোরতা ইত্যাদির স্বাধীনতা। অধঃপতিত ও উঁচুদের শিল্পও সেখানে আছে। সেখানে প্রকৃত আল্লার বান্দা ও শয়তানের অনুসারীরা পাশাপাশি বসবাস করছে। কিন্তু বস্তুর প্রাধান্য বড় মারাত্মক ধরণের। মানুষ ভেসে গিয়ে এমন সব ময়লা নর্দমায় পড়ছে যেখান থেকে পচন, বিপর্যয় ও পাপাচারের দুর্গন্ধ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

এ ধরণের স্বাধীনতাকে সে ভয় করছে। আর এ কারণেই সে একটা প্রচ্ছন্ন ভীতি ও অশান্তি অনুভব করছে।

সে স্বপ্ন দেখে একটা পরিচ্ছন্ন, নিরাপদ ও স্বাধীন বিশ্বের। যেখানে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক হবে প্রতারণা ও ধোকাবাজী থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। নাবিলা বড্ড ব্যথা পায়, যখন সে শোনে, কোন কোন পত্রিকা অধিক অর্থের বিনিময়ে নিজেকে বিক্রি করে দেয় এবং আজ যার বিরুদ্ধে লিখছে, আগামীকালই আবার তার পক্ষে সাফাই গায়। সে দেখছে, কিছু বই পুস্তকে অত্যাচারী শাসকদের জয়গান গাওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে কোন কোন বইতে আবার তাদের ওপর অভিসম্পাৎ করা হয়েছে। এটা কেমন চমৎকার স্ববিরোধিতা!

নাবিলা আব্দুল আজীজ সীসীকে প্রশ্ন করলো—আমরা এ কোন যুগে বাস করছি?

—বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে।

নাবিলা তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলো তিনি মৃদু মৃদু হাসছেন। সে বিস্ময়ের সুরেই আবার প্রশ্ন করলো—ধ্বংস ও বিপর্যয়ের এমন ভয়াবহ স্তূপ পরিষ্কার করা কি সম্ভব?

তিনি তাঁর স্বভাব সুলভ স্থিরতার সাথে বললেন—কেন সম্ভব নয়? নাবিলা, তুমি সেই দিনটির কথা স্মরণ কর, যেদিন রসূলুল্লাহ (স) তাঁর বাণী নিয়ে আত্মপ্রকাশ করলেন এবং দেখতে পেলেন, গোটা বিশ্বই পাপাচার, নির্লজ্জতা ও শিরকে পরিপূর্ণ।

নাবিলা বললো—অতীতের সেই জাহিলিয়াত আজকের মত এত জটিল ও এত খারাপ ছিল না।

আবার তিনি একটু একটু হাসতে লাগলেন। তারপর দৃঢ় স্বরে বললেন—উট আজ উড়োজাহাজে পরিণত হয়েছে। তরবারী আনবিক বোমাতে, প্রাচীনকালের শিরক আজ মার্কসবাদ ও অস্তিত্ববাদের রূপ নিয়েছে। গোত্রীয় কবিদের রূপান্তর ঘটেছে রেডিও, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা সিনেমা ও নাটকে। এ আকাশের নিচে নতুন কিছুই নেই। সে যুগে মেয়েদেরকে জীবিত কবর দেয়া হত। আর আজ তারা ল্যাংটা হয়ে রাস্তা-ঘাটে ঘুরে বেড়ায়, পুরুষের কামনার চিতায় ঘৃতাহুতি দেয়। তাদের কোন প্রকার নৈতিকতা ও মূল্যবোধের পরোয়া নেই। তারা আজ একটি মৃত দেহে পরিণত হয়েছে। যদিও তারা হাসে, কাঁদে, ভালোবাসে ও কাপে কাপ ঠোকাঠুকি করে।

আব্দুল আজীজ কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন। তিনি শুনতে পেলেন নাবিলা প্রশ্ন করছে—তারপর কি?

—কোন যুগই আপদ থেকে খালি থাকেনি।

নাবিলা মাথাটা একটু দুলিয়ে বললো—আর উতওয়া আল-মালওয়ানী আজকের একজন খোজা অথবা অতীতের একজন জল্লাদ।

—অবশ্যই।

নাবিলা প্রশ্ন করলো—তাহলে পথ কোথায়?

এর জবাবে আবদুল আজীজ কুরআনের একটি আয়াত পাঠ করলেন— 'তুমি বলে দাও, এটাই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীরা জেনে-বুঝেই আল্লার দিকে আহ্বান জানাই। সুবহানাল্লাহ। আমি মুশরিকদের কেউ নই।

অনুচ্চকণ্ঠে নাবিলা বললো—'সাদাকাল্লাহুল আজীম।' মহান আল্লাহ সত্য কথাই বলেছেন।

পুনরায় সে বলতে লাগলো—ঘন অন্ধকার।

—কারান্তরালে স্বাধীনতার সন্তানদের অবস্থানও দীর্ঘ হয়ে গেছে।

—আত্মত্যাগ ছাড়া বিজয় আসে না।

—আর আমরা এখনো সারা বিশ্ব জুড়ে তসবিহ তিলওয়াত করছি, আর তারা বাস করছে সংকীর্ণ সেলে।

—তারা আমাদের চেয়ে ভালো।

—অবশ্যই।

—তাহলে দুঃখ কিসের?

—তারা আমার ভাই। সর্বত্রই.........তারা আমার ভাই..... ।

—অতি চমৎকার অনুভূতি।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে নাবিলা বললো—ডাক্তার সালেমও দেশ ত্যাগ করতে পারতেন.........হিজরাত করে তাদের জুলুমের হাত থেকে আমাদের মত মুক্তি পেতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রে থেকে গিয়ে এসব জন্তু-জানোয়ারের সাথে প্রত্যক্ষ সংগ্রামকেই প্রাধান্য দিলেন তিনি এবং সন্তুষ্ট চিত্তে কারাগারে প্রবেশ করলেন। তারপর আবদুল আজীজের দিকে তাকিয়ে নাবিলা প্রশ্ন করল—আমরা কেন তাঁর মত করি না?

আবদুল আজীজ বললেন—যুদ্ধের ময়দান অতি প্রশস্ত।

—আপনি কি বোঝাতে চাচ্ছেন?

ভেতরে শত্রু, বাইরে শত্রু। সামনে সারিবদ্ধ, পেছনেও সারিবদ্ধ। এক দলের হাতে বন্দুক, অন্যদের হাতে কলম। গোটা বিশ্বই একটা যুদ্ধক্ষেত্র। তুমি মনে করো না, একমাত্র মিসরেই যুদ্ধ চলছে। ইউরোপ, রাশিয়া, আমেরিকা, আরব বিশ্ব তথা বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলে শয়তানের গোপন হাতের কারসাজী সম্প্রসারিত। সালেম সেখানে জিহাদ করছে তার বিশেষ পদ্ধতিতে, আর নাবিলা এখানে পালন করছে তার অন্য দায়িত্ব। এটাও এক প্রকার পরিপূর্ণতা এবং এর প্রয়োজনও রয়েছে। তাহলে দুঃখ কিসের?

আবদুল আজীজ যখন দেখলেন নাবিলা কোন উত্তর দিচ্ছে না, তখন তিনি তার একটু কাছে গিয়ে বললেন—আমরা মানুষ। আমাদের ক্ষমতাও সীমিত। গোটা বিশ্বকে আমরা একদিন ও এক রাতের মধ্যে পাল্টে দিতে পারব না।

নাবিলা বললো—আপনি ঠিকই বলেছেন। আপনার কথাটি আমার ভালো লেগেছে। কিন্তু এ কৌতুক ত আমার আর সহ্য হচ্ছে না।

এ কৌতুকের সাথে যদি দু'একজন লোক জড়িত থাকত তাহলে মানুষ তাদের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে শান্ত হত। কিন্তু ব্যাপারটি ত তুমি নিজেই দেখছ।

নাবিলার কুয়েতে থাকার সমস্যাটি আবদুল আজীজ সমাধান করতে সক্ষম হলেন। তার কুয়েতে ফিরে আসার ব্যাপারে সরকারী কর্তৃপক্ষ রাজী হলো। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের যে কোন ধরণের চাকুরী নিয়ে তার ফিরে আসার ব্যাপারে সরকার একমত হলো না। চুপে চুপেই সব কিছু শেষ হলো। আবদুল আজীজের সাথে কুয়েতে ফিরে এল নাবিলা। ফিরে আসার সাথে সাথে সে একটি 'বিজ্ঞান ভিত্তিক গবেষণা সংস্থায়' যোগদান করলো। সংস্থাটি ছিল বেসরকারী। এর কাজ হলো, বই-পুস্তকের প্রকাশনা, প্রচার ও কিছু দ্বীনি ও বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তু সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনা। গবেষণার বিষয়বস্তু সম্পর্কিত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নামের তালিকা প্রস্তুত করে নাবিলা গবেষকদের গবেষণা কাজে সাহায্য করতে লাগল।

আবদুল আজীজ হঠাৎ একদিন নাবিলার অফিসে গিয়ে হাজির হলেন। তখন তাঁর সব কথা ও চালচলনে কিছুটা ইতস্তত ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল। নাবিলা বুঝতে পারলো এর পিছনে কিছু একটা আছে। সে একটি বইয়ের পাতা ওলটাতে লাগলো। আর তিনিও একটি পত্রিকা ধরেন, তারপর সেটা ছেড়ে অন্যটি ধরেন। এভাবে কিছুক্ষণ কাটার পর তিনি গলাটি পরিস্কার করে মৃদু হেসে বললেন—আমি স্পষ্টভাবে কথা বলতে ভালোবাসি।

—ভূমিকার কোন প্রয়োজন নেই।

—একটা সামাজিক মর্যাদার প্রয়োজন।

নাবিলা মাথা দুলিয়ে তার দিকে এমনভাবে তাকাল যে, তিনি যা বলতে চাচ্ছেন তা শোনার আগ্রহ তাতে প্রকাশ পেলো। তিনি বললেন—তুমি আমার মেয়ের মত। বিদেশে আমরা যে শরনার্থীর জীবন যাপন করছি, তাতে রয়েছে অনেক দুঃখ, ব্যথা দুশ্চিন্তা। ব্যাপার যাই হোক না কেন, এমন পরিস্থিতিতে প্রত্যেক মানুষেরই একজন জীবন সঙ্গীর প্রয়োজন। একথা সত্যি নয় কি?

নাবিলা তার দু'চোখের পাতা নীচু করলো। সে সঙ্গে সঙ্গেই বুঝে ফেললো তিনি কি বলতে চাচ্ছেন। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, তিনি তাঁর পরিচিত কোন ইখওয়ানী মুহাজিরের সাথে তার বিয়ের প্রস্তাব দিতে চাচ্ছেন। তার ধারণাই সত্য হলো, যখন সে তাঁকে বলতে শুনলো—তুমি তাকে চেন। আর বিয়ে হলো দ্বীনের অর্ধেক।

লজ্জায় নাবিলার মুখমণ্ডল লাল হয়ে গেল। সে বললো—এটা কি নির্দেশ?

তিনি জোর দিয়ে বললেন—কেমন করে? এ ধরণের বিষয়ের কোন নির্দেশই থাকতে পারে না। বিয়ে হলো একটা স্বাধীন নির্বাচন এবং উভয় পক্ষের সম্মতি।

নাবিল, জানেনা, ঠিক এ সময়ে কেন সালেমের কথা মনে হলো। তার মানস-পটে ভেসে উঠলো সালেমের দীর্ঘ দেহ, বকের মত সাদা ওভারকোট এবং পরিচ্ছন্ন ও মিষ্টি-মধুর হাসি হাসি মুখটা। তার দু'চোখ পানিতে ভরে গেলো। সে সাথে সাথে বলে উঠলো—কারা প্রাচীরের অন্তরালে মানুষ শাস্তি ভোগ করছে এ সময় আমরা কেমন করে আনন্দ করব?

তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। উত্তরে তিনি বললেন—এ দু'টির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। জীবনটাই এমনি। একদিকে মানুষ মরছে, অন্যদিকে একই সময় নতুন শিশুর জন্ম হচ্ছে। জীবনের গতি এভাবেই চলছে।

নাবিলাকে নিরব থাকতে এবং তার চেহারা ও হাতের নড়াচড়ায় একটা ইতস্তত ভাব ফুটে উঠতে দেখে তিনি বললেন—এখানে কি অন্য কোন লোক আছে?
কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে সে বললো—হ্যাঁ।

—দুঃখিত, এসো আমরা অন্য প্রসঙ্গে কথা বলি।

দুঃখে ভরা দিনগুলি অতিবাহিত হতে লাগলো। ঘটনা একটার পর একটা ঘটেই চলেছে। তার প্রচণ্ড প্রবাহ নির্দয়ভাবে সজোরে আঘাত করে চলেছে। ঘূর্ণায়মান সংঘাতে আগুন জলছে এবং তার কালো ধোঁয়ায় আকাশ ভরে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও একটি সিদ্ধান্ত ঘোষিত হলো। যা ছিল মিসরবাসীর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৬৬ সালের জন্যে অস্থায়ী শাসনতন্ত্র ঘোষিত হলো। যাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি তাদেরকে মুক্তি দেয়া হলো। আর রেযেক ইবরাহীম ও আবদুল হামীদের মত বন্দীরা কারাগারের অভ্যন্তরে নিরস জীবনের রুঢ়তা ও তিক্ততা ভোগ করতে লাগলো। যাই হোক কিছু কিছু বাড়ীতে একটু আনন্দ প্রবেশ করল। বন্দীদের জীবনের দিকে নতুন করে যাত্রা করার ব্যাপারটি ছিল একটি শুভ সংবাদ। যদিও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কঠিন শর্তের ভিত্তিতে তাদের মুক্তি দিয়েছে। অনুষ্ঠানিকভাবে স্বররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে না জানিয়ে তারা এ শহর থেকে অন্য শহরে যেতে পারবে না, ইখওয়ানুল মুসলিমীন সংগঠনের সদস্যদের একে অপরের সাথে দেখা-সাক্ষাতের কোন অধিকার থাকবে না।

বহু সংখ্যক কর্মচারীকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল বদলী করার একটি নির্দেশ জারি হলো এবং সংগে সংগে সতর্ক করে দেয়া হলো, তাদেরকে যেন কোন গুরুত্ব পূর্ণ পদ না দেয়া হয়। ভোট ও সাধারণ নির্বাচনে অংশ গ্রহণের অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে তাদেরকে রাজনৈতিক দিক দিয়ে পঙ্গু করে দেয়া হল। তাদের ছেলে-মেয়ে দের সামরিক কলেজে অথবা কোন কুটনৈতিক চ্যানেল বা এ জাতীয় অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ চাকুরীতে নিয়োগ নিষিদ্ধ করে আইন পাশ হল। তাছাড়া তাদের প্রতি সর্বক্ষণ কড়া নজর রাখতে হবে এবং প্রকাশের পূর্বেই তাদের সব ধরনে রচনাবলী খুটিয়ে খুটিয়ে দেখতে হবে।

এ নতুন অস্থায়ী শাসনতন্ত্র মিসরীয় পত্র-পত্রিকায় ব্যাপকভাবে প্রচারিত হলো। শাসনতন্ত্র ঘোষণার সময় বিভিন্ন স্তরের বড় বড় প্রতিনিধি, শিল্পী, ও নর্তকীদের

অনুভূতি ও প্রেসিডেন্টকে প্রথম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসাবে গ্রহণ সম্পর্কে পত্রিকায় সচিত্র সাক্ষাতকার ছাপাতে শুরু করে দিল। সম্পাদকরা স্বাধীনতা,-মর্যাদা ও সংহতি সম্পর্কে খুব জোরে শোরেই লিখলো।

নাবিলা যা কখনো চিন্তা করেনি, বাস্তবে তাই ঘটে গেলো। এশার নামাযের কিছু আগে অফিস থেকে ফেরার সময় আবছা অন্ধকারে নাবিলা রাস্তা ধরে চলছিল। অভ্যাস অনুযায়ী সে তাড়াতাড়িই হাঁটছিল। তার মাথায় তখন নানা-রকম চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল। নানা ধরণের বই-পুস্তক পড়ে তার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল আপন মনে কথা বলা। তখন সে তার নিজের এক বিশেষ দফতরে তার নিজস্ব চিন্তা চেতনা ও ধ্যান-ধারণা দ্রুত রেকর্ড করে চলছিল। কোন বিষয় সম্পর্কে সে যত গভীরভাবে পড়াশুনা করছিল ততই তার জানার আগ্রহ বেড়ে যাচ্ছিল। চিন্তা ও জ্ঞানের জগত অতি প্রশস্ত, তার কোন সীমা-পরিসীমা নেই। সে তার বাড়ীর পাশ দিয়ে যাওয়া রাস্তাটি দিয়ে হাঁটছিল। মাঝ পথে আসতেই একের পর এক কয়েকটি গুলির শব্দে সে সম্বিত ফিরে পেলো।

ক্ষণিকের জন্যে দাঁড়িয়ে চতুর্দিকে ভয়ে ভয়ে তাকালো। সে একটি ছায়ামূর্তিকে দৌড়ে পালাতে দেখলো। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে প্যারলো, মারাত্মক কিছু ঘটতে যাচ্ছে। সর্ব শক্তিতে দৌড়ে হাফাতে হাফাতে সে বাড়ীতে গিয়ে ঢুকলো। সে যে বেঁচে গেছে তা যেন সে বিশ্বাসই করতে পারছিল না, গুলি তার শরীরকে কিভাবে ভেদ করল না? তার কপাল থেকে ঘাম ঝরতে লাগলো। অত্যন্ত বিমর্ষ-ভাবে দোতলায় সে তার কামরায় গিয়ে ঢুকলো। সে জোরে জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছিল। তার সাথে যে বিধবাটি তার তিনটি সন্তান সহ থাকত; সে বললো—মিস নাবিলা তোমার কি হয়েছে?

কাঠের টেবিলটির ওপর নাবিলা তার হাত ব্যাগটি ও কাগজ পত্র ছুড়ে ফেলতে ফেলতে বললো—কিছু না।

তারপর বেঞ্চের ওপর সে গা এলিয়ে দিল। খুব শিগগিরই সে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। বিধবা ও তার সন্তানগুলি তার কাছে দৌঁড়ে এসে সন্দেহের সুরে বলে উঠলো—আমার মেয়েটি, তুমি কথা বল। কোন বদমাশ যুবক কি তোমাকে অপ-হরণের চেষ্টা করেছিল? নাবিলা চোখের পানি মুছলো। নিজের আবেগ দমন করলো। তারপর বললো—আপনাকে ধন্যবাদ। আমাকে শান্ত হতে দিন। আপনাদের চিন্তা করার মত তেমন কিছু ঘটেনি।

কয়েক মিনিট পর নাবিলা টেলিফোন উঠিয়ে আবদুল আজীজ সীসীর সাথে কথা বললো। তিনি তাঁর স্ত্রীকে সঙ্গে করে খুব তাড়াড়িই চলে এলেন এবং নাবিলাকে সাথে করে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর বাড়ীতে গিয়ে নাবিলা পুরা ঘটনা খুলে বললো। ব্যাপারটি ছিল খুবই মারাত্মক। স্পষ্টতই এটা হচ্ছে নতুন শাসনতন্ত্রের ছত্রছায়ায় রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের উৎখাতের নতুন কার্যক্রম। অনেক

দেশেই বিভিন্ন সময়ে এমনটি ঘটে থাকে। কিন্তু সমস্যা হলো, যে নাবিলাকে হত্যার চেষ্টা করে ছিল তার সম্পর্কে কোন বর্ণনা সে দিতে পারলো না।

এক ঘণ্টা পরেই আবদুল অজীজের বাড়ীতে জরুরী মিটিং ডাকা হলো। ইখওয়ানের কয়েকজন বাছা বাছা সদস্য তাতে অংশ গ্রহণ করলেন। তারা বিষয়টি গভীরভাবে পর্যালোচনা করে কয়েকটি প্রস্তাব পাশ করলেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবটি হলো, ঘটনা সম্পর্কে আভ্যন্তরীন নিরাপত্তা বিভাগকে জানান হবে না। কারণ তা সাধারণভাবে রাজনৈতিক মুহাজিরদের প্রতি সরকারের রাজনৈতিক ভূমিকা পরিবর্তনে প্রভাব ফেলতে পারে। কুয়েতীরা চাইবে না তাদের দেশে এ ধরনের ঘটনা ঘটুক। আরেকটি প্রস্তাব হলো, নাবিলাকে অন্য একটি বাড়ীতে সরিয়ে নেয়া হবে। অফিসে ও চলাফেরার সময় তার নিরাপত্তার জন্যে একজন ইখওয়ানকে নিয়োগ করা হবে। তাকে একাকী চলাফেরার অনুমতি দেয়া হবে না। তাছাড়া প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হবে। আর সেই 'অজ্ঞাত পরিচয় লোকটি' সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাতে হবে।

হজ্জের মওসুমে বেশ কিছু সংখ্যক মিসরীয় হাজী কুয়েতে এলো। তাদের মধ্যে অতীতে কারাগারে কাটিয়েছে এমন কিছু ইখওয়ানীও ছিল। তারা তাদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও বিভিন্ন মাধ্যমে চেষ্টা-তদবীর করে হজ্জের অনুমতি আদায় করতে সক্ষম হয়। তারা সুযোগ হাত ছাড়া করলো না। তারা বিভিন্ন আরব দেশে ছড়িয়ে পড়ল এবং মিসরে ফিরে যেতে অস্বীকৃতি জানালো। এ সকল ইখওয়ানীর কাছে ছিল বহু তথ্য ও বক্তব্য-বিবৃতি। আবদুল আজীজ সীসীর ও তাঁর সঙ্গীরা তাদেরকে স্বাগত জানালেন এবং সবকিছু ধৈর্যের সাথে শুনলেন। ব্যাপারটি নবিলাও জানল। এসব ইখওয়ানীর সাথে সাক্ষাতের ও তার দেশ ত্যাগের পরের ঘটনাবলী জানার জন্যে সে অধীর হয়ে পড়লো।

নাবিলা তার সান্ধ্যকালীন কাজের মাঝখানে প্রখ্যাত মিসরীয় লেখক আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদের 'আল-ইসলাম ফিল করনিল ইশরীন' (বিংশ শতাব্দীতে ইসলাম) বইখানি পড়ছিল। ছোট্ট একটি কার্ডে সে কিছু কিছু কথা নোট করে নিচ্ছিল। লেখক তার গ্রন্থের কয়েকটি পৃষ্ঠায় ইসলাম সম্পর্কে বলেছেন, তা একটি বিজয়ী শক্তি, অটল ও অনড় শক্তি। পরিশেষে তিনি ভয়াবহ ঐতিহাসিক ও আন্তর্জাতিক শত্রুতার মুকাবিলায় ইসলামের অটল থাকা এবং সব কিছু সত্বেও দিন দিন তার সাহায্যকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার একটি চিত্র এঁকেছেন। নাবিলা গভীর মনোনিবেশ সহকারে সেই পৃষ্ঠাগুলি পড়ছিল। এমন সময় তার কানে আওয়ায ভেসে এলো—আসসালামু আলাইকুম।

নাবিলা মাথা উঁচু করলো। দেখতে পেলো সে তার সামনেই সুদীর্ঘ অবয়ব ও পরিচ্ছন্ন হাসিটি নিয়ে দাঁড়িয়ে। নাবিলা মাথা নেড়ে দু'চোখ ডলে পরিস্কার করে নিল। সে প্রায় পড়েই যাচ্ছিল। আস্তে করে প্রশ্ন করলো—কে? ডাক্তার সালেম? অসম্ভব......।

নাবিলার দু'গণ্ড বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। সে কোন কথা বলতে পারছে না। ডাঃ সালেম বুঝতে পারলো বর্তমান অবস্থা নাবিলাকে প্রচণ্ড আবেগের বন্যায় তলিয়ে দিচ্ছে। সে ঘটনার আকস্মিকতা কিছুটা হালকা করার উদ্দেশ্যে বলতে লাগলো—তোমার জন্যে আমি দোয়া করেছি মসজিদুল হারামে ও আরাফাতের স্নেহময় পর্বতের বুকে বসে। মুযদালাফায় আমি মাগরিব ও এশার নামাজ এক সাথে আদায় করেছি এবং প্রতিটি পবিত্র স্থানেও নামাজ পড়েছি। তারপর তোমার জন্যে দোয়া করেছি।

মনে হলো, তার এ কথাগুলিতে উল্টা ফল হয়েছে। নাবিলা প্রবল আবেগে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো। ডাঃ সালেম কিছুটা রসিকতার সুরে বললো—আমি কঙ্কর নিক্ষেপ করছিলাম, তখন আমার মানসপটে ভেসে উঠছিল উতওয়া আল-মালওয়ানী ও তার অত্যাচারী নেতাদের ছবি। আমার মনে হলো, একটি পাথর তার একটি চোখে গিয়ে লাগলো। এই বলে সে হাসতে লাগলো। তার সাথে নাবিলাও হেসে উঠলো। তখনো তার দু'চোখে অশ্রু।

কিছুক্ষণ নিরবতায় কাটলো। তারপর নাবিলা বেল বাজালো। একজন অফিস বিয়ারার কফির ট্রে হাতে নিয়ে কামরায় প্রবেশ করলো। তারপর নাবিলা প্রশ্ন করলো—আমার আব্বার অবস্থা কেমন?

ডাঃ সালেমের চেহারায় একটা বেদনার ছাপ ফুটে উঠলো। সে নাবিলার দৃষ্টি থেকে পালাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না। দ্বিতীয়বারের মত সে প্রকৃত সত্য গোপন করে অন্য কিছু বলার চেষ্টা করলো, কিন্তু তার জবান তাতে সায় দিল না। ডাঃ সালেমের চেহারা দেখে মুহূর্তের মধ্যে নাবিলা সবকিছু বুঝে ফেললো। সে তার চেয়ার থেকে উঠে ডাঃ সালেমের দিকে এগিয়ে গেলো এবং তার একটি কাঁধ খামচে ধরে বললো—প্রকৃত ঘটনা আমি জানতে চাই।

ডাঃ সালেম বললো—আমরা সবাই একই পথের যাত্রী। একমাত্র আল্লাহ্ই চিরন্তন।

এরপর কি ঘটেছে নাবিলা তা জানেনা। যখন জ্ঞান ফিরে পেয়ে চোখ মেলে তাকালো, তখন সে তার চার পাশে অফিসের মহিলা অফিসার ও অন্যান্য কর্মচারীদের দেখতে পেলো। নাবিলার বান্ধবীরা তার মুখ ও মাথা ডলে দিচ্ছে এবং তারা তার চোখের পানিও মুছে দিচ্ছে। ডাঃ সালেম তখন দাঁড়িয়ে।

এক সপ্তাহ পরে নাবিলা দেখা করলো ডাঃ সালেমের সাথে। তখন সে কুয়েতের 'হাওলী' হাসপাতালে ডাক্তার হিসেবে কর্মরত। তখন প্রায় দুপুর দু'টা বাজে। তারা দুজনেই একটি নতুন টেক্সিতে গিয়ে উঠলো। দ্রুত গতিতে যেতে যেতে ডাঃ সালেম সরাসরি বললো—উস্তাদ সীসীকে ধন্যবাদ। তিনি আমাকে এ টেক্সি কেনার টাকা ধার দিয়েছেন। তারপর সে নাবিলার দিকে তাকালো এই কথাগুলি বলতে বলতে—আমার মাথায় একটি চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। তিনি

আমাকে আজ দুপুরে খাবার দাওয়াত দিয়েছেন। তোমাকেও সাথে করে নিয়ে যেতে বলেছেন। এ কারণে টেলিফোনে তোমাকে ডেকেছি।

কিছুক্ষণ নিরবতায় কাটলো। প্রচণ্ড গরম সত্বেও নাবিলার শরীরের লোমগুলি খাড়া হয়ে গেলো। ডাঃ সালেম তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে পুনরায় বললো—আল্লাহ তোমার আববাকে উঠিয়ে নেবার আগে তাঁর সাথে আমি কথা বলেছি।

—কোন বিষয়ে?

ডাঃ সালেম মৃদু হাসলো। তারপর বললো—তিনি আমাকে বললেন—আমার কোন আপত্তি নেই। তবে শর্ত হলো নাবিলার সম্মতি থাকতে হবে।

—তুমি কি বলছ, আমি বুঝতে পারছি না।

হঠাৎ ডাঃ সালেম জোরে হেসে উঠলো। নাবিলাও সে হাসিতে অংশ নিল। নাবিলার দিকে একটু ঝুঁকে পড়ে ডাক্তার বললো—তুমি কি আমার সাথে বিয়েতে রাজী হবে না?

সে বললো—রাজনীতি থেকে 'অবসর প্রাপ্ত' ব্যক্তিকে আমি কিভাবে বিয়ে করতে পারি?

ডাক্তার বললো—তাহলে রাজনৈতিক অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তি কি করবে?

নাবিলা বললো—তা আমি জানি না।

— তারই মত 'রাজনৈতিক অবসর প্রাপ্তাকে' বিয়ে করবে।

এরপর দু'জনেই জোরে হেসে উঠল। সালেম বললো—আর আবদুল আজীজ সীসী তোমার ও আমার পিতৃতুল্য। মাথা নীচু করে নাবিলা বলল—অবশ্যই। সালেম পুনরায় বললো—শিগগিরই আমরা আবার নতুন করে দ্বিতীয় যাত্রা শুরু করবো। জবাবে নাবিলা বললো—প্রথম যেদিন আমাদের দেখা হয়েছিল, সেদিন থেকেই আমরা সে যাত্রা শুরু করেছি।

—আর আমি ভবিষ্যৎকে পরোয়া করি না। ভবিষ্যতের ভয় মৃত্যু ও শাস্তিতুল্য। একটি অধ্যায়ের যবনিকা টানবো এবং আজ থেকে আমরা নতুন কাহিনী শুরু করবো।

নাবিলা মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললো—হ্যাঁ। প্রাচীর ও কাঁটাতার সেখানেও আছে। ক্ষিপ্ত কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাক সেখানেও থাকবে। শহীদদের আর্তচিৎকার আমার কানে প্রবেশ করতে থাকবে।

সালেম বললো—যে হাত প্রাচীর বানিয়েছে তা তুমি ভেংগে ফেলতে সক্ষম। কুকুরগুলির জীবনকালও অতি অল্প। এ কোন সমস্যাই নয়। কেননা, তারা হলো অনুগত পশু। আর শহীদরা… …..তারা হচ্ছে জীবিত। তারা তাদের প্রভুর কাছ থেকে রেযেক লাভ করে থাকে। আল্লার প্রতি আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে। কেননা মহান আল্লাই ত আমাদের কাছে সেই ওয়াদা করেছেন।

নাবিলা লাফিয়ে উঠে ফিস্ ফিস্ করে বললো—আমার ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছে।

মৃদু হেসে সালেম বললো—আমারও।

প্রকাশক

এ, কে, এম, নাজির আহমদ
পরিচালক, বাংলা সাহিত্য পরিষদ, ঢাকা
৭১ নিউ এলিফ্যাণ্ট রোড, ঢাকা-৫

বা সা-প-প্র-৭

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ১৯৮৫
রবিউল আওয়াল ১৪০৬

দ্বিতীয় মুদ্রণ
জানুয়ারী ১৯৮৭
পৌষ ১৩৯৩
রবিউস সানী ১৪০৭

প্রচ্ছদ

হামিদুল ইসলাম

মুদ্রণ

মনোরম মুদ্রায়ণ
২৪ শিরিশ দাস লেন, ঢাকা-১

মূল্য : শোভন ৬৫.০০
সুলভ ৪৭.০০

ALLAR PATHER SHAINIK. Novel by NaJib Kilani. Translated by Muhammad Abdul Ma'bood. Published by A. K. M. Nazir Ahmad, Director, Bangla Sahitya Parishad. 71 New Elephant Road, Dhaka. First Edition : December, 1985 . Second Edition January 1987 Price. White : 65·00 News : 48·00

তাশখন্দে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে প্রথম পুরস্পকারপ্রাপ্ত ছবি 'লাইল ও কাদবান'-এর খ্যতিমান কাহিনীকার মিশরীয় কথাশিল্পী ডাঃ নাজিব কিলানীর খ্যাতি আজ বিশ্বজোড়া। সিনেমা, মঞ্চ এবং টেলিভিশনের জনপ্রিয় কাহিনী নির্মাণেই তাঁর খ্যাতি সীমাবদ্ধ নয়— উপন্যাস, ছোটগল্প কবিতা এবং মননশীল প্রবন্ধ রচনায় তিনি সমান সিদ্ধহস্ত। এ পর্যন্ত তাঁর অর্ধ শতাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। ইটালী, ইংরেজী, রুশ, তুর্কী, উর্দু, ফারসীসহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় তাঁর গ্রন্থ অনুদিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

তাঁর এ খ্যাতি তাঁকে বিরল সম্মানের অধিকারী করেছে। মিশরের শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক উচ্চ পরিষদ, আরবী ভাষা একাডেমী, নাদিল কিস্সা, মাজাল্লাতুশ শাববান আল মুসলেমীনসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষামন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তিনি পুরস্কৃত হয়েছেন বিপুলভাবে। এমনকি ডঃ তাপ স্বর্ণ পদক লাভের গৌরবও তিনি অর্জন করেছেন। পশ্চিম মিশরের শারশাবাহ নামক পল্লীতে ১৯৩১ সালে এই খ্যাতিমান লেখকের জন্ম। তিনি কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের আল কাসরুল আরনী মেডিক্যাল কলেজের মেডিসিন ও সার্জারীর ব্যাচেলর। বর্তমানে তিনি নাদিল কিসসা ও আরবী লেখক সংঘের সদস্য এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পদে সমাসীন।

আল্লার পথের সৈনিক উপন্যাসটির আরবী নাম 'রিহ্লাতুল ইলাল্লাহ'। ইখওয়ানুল মুসলিমীন কর্মীদের বন্দী জীবনের অকথ্য নির্যাতনের বেদনাঘন করুণ কাহিনী এ উপন্যাসের পটভূমি। আধুনিক আরবী সাহিত্যের নন্দিত কথাশিলপী নাজিব কিলানীর দক্ষ হাতের ছোঁয়ায় এ কাহিনী হয়ে উঠেছে অনবদ্য মর্মস্পর্শী ও জীবন্ত। আধুনিক আরবী সাহিত্যের ক্লাসিক্যাল উপন্যাস 'রিহ্লাতুল ইলাল্লাহ্'র বাংলা অনুবাদ 'আল্লার পথের সৈনিক' বাংলা ভাষায় প্রকাশিত এই নন্দিত শিল্পীর প্রথম উপন্যাস— যার পাতায় বিধৃত আছে ত্যাগ, কোরবানী আর প্রেমের বিচিত্র প্রকাশ।